কাব্য
কিশোর

কাব্যবিতান



॥ সম্পাদক ॥

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্র-অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

অমর সাহিত্য প্রকাশন : কলিকাতা ১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক—মণীশ চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
পি ১৯ বেণী ব্যানার্জী এভিনিউ
কলিকাতা ৩১

মুদ্রাকর—সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

কবীনাং মানসাম্ভোধৌ
লসৎপদ্মালয়াশ্রয়া।
দীপ্যমানা শ্রিয়া শশ্বদ্
গৌড়বাণী মহীয়তাম্

সূচীপত্র

সংযোজন

কাব্যসঙ্কলন রচনা করিয়া কাহাকেও খুশী করা যায় না। সঙ্কলন যতই নিপুণ হোক, যতই ব্যাপক হোক, সকল পাঠকের রুচিরোচন কবিতাসংগ্রহ অসাধ্যপ্রায় ব্যাপার; তার উপর আবার মনের আবহাওয়া পরিবর্তনশীল, মনের এক মেজাজে যে কবিতাটি ভালো লাগে, মেজাজ-বদলে সেটি ভালো না লাগিতেও পারে। এ সব সমস্যা জানিয়া-শুনিয়াই সঙ্কলন-কর্তাকে অগ্রসর হইতে হয়, আমরাও সেইভাবে অগ্রসর হইয়াছি।

বাংলা সাহিত্যে কাব্যসঙ্কলনের অভাব নাই। তৎসত্ত্বেও আবার একখানি কেন? গ্রন্থবাহুল্যের এই যুগে সঙ্কলনগ্রন্থ অপরিহার্য। যে-হারে পৃথিবীময় নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, প্রকাশের হার কালক্রমে আরও অনেক বাড়িবে, তাহাতে এমন এক সময় আসিবে যখন ভূপৃষ্ঠে স্থানাধিকার লইয়া মানুষে ও পুস্তকে বিষম রেষারেষি পড়িয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা। এ সঙ্কট সমাধানের একটি প্রধান উপায় সঙ্কলনগ্রন্থ। ভবিষ্যতে সমস্ত গ্রন্থাগারই সঙ্কলনগ্রন্থের গ্রন্থাগার হইবে। এ তো গেল সাধারণ সমস্যা। বাংলা সাহিত্যে কাব্যসঙ্কলনের অভাব না থাকিলেও, একখানি গ্রন্থে অতি প্রাচীন কাল হইতে অতি নবীন কাল পর্যন্ত কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই ভাবে একখানি কাব্যসঙ্কলন রচনা করিলে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিবার কৌতূহলই বর্তমান গ্রন্থ রচনার অন্যতম প্রধান কারণ মনে করিলে অন্যায় হইবে না।

বড়ু চণ্ডীদাসের কবিতায় গ্রন্থের সূচনা। আর যে নবীন কবির কবিতায় গ্রন্থের সমাপ্তি তাঁহার জন্ম ১৯২৯ সালে। বলা বাহুল্য এখানেই বাংলা কাব্যধারার সমাপ্তি এমন মনে করিবার কোন হেতু নাই। বস্তুত প্রতিদিন এমন সব নবীনতর কবির

রচনার সাক্ষাৎ পাইতেছি যাঁহাদের কবিতা সঙ্কলিত হইলে এই গ্রন্থের সৌন্দর্য বাড়িত। কিন্তু সেই সঙ্গে আয়তনবৃদ্ধিও অনিবার্য হইত। আয়তনের ক্রমবর্ধমান স্ফীতিই তাঁহাদের কাব্য সঙ্কলনে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে। নবীনতর কবিদের একটি স্বতন্ত্র সঙ্কলন করিবার ইচ্ছা মনে আছে এই পর্যন্ত বলিতে পারি।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমাদের কাব্যনির্বাচনের মাপকাঠি কি। সরল প্রশ্নের সরল উত্তর দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের কোন মাপকাঠি নাই। যে কবিতাটি আমাদের ভালো লাগিয়াছে সেটি সংগ্রহ করিয়াছি; দুটি ভালোর মধ্যে যেটি অধিকতর ভালো লাগিয়াছে সেটি সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা মাপ-কাঠি নয়, রুচি। সকলে যে আমাদের রুচিকে স্বীকার করিবেন এমন অদ্ভুত প্রত্যাশা করি না। কাল্পনিক পাঠকের কথা তুলিয়া লাভ নাই, আমরাই এক সময়ে যেটি নির্বাচন করিয়াছি, পরে সেটি পরিত্যাগ করিয়াছি, এখন আবার সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পরে দেখিতেছি যে, কোন কোন কবিতার বদলে অন্য কবিতা লইলে ভালো হইত। এটাও রুচির ব্যাপার। পাঠকের রুচি যদি পরিবর্তনশীল হয়, সঙ্কলকের রুচিই বা সদা স্থির হইবে কেন?

কাব্যনির্বাচনে আরও একটি নীতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে-কবিতা আমাদের বোধগম্য হয় নাই তাহা গ্রহণ করি নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় না যে ঐ কবিতা অ-কবিতা; এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, সঙ্কলকদ্বয় বুদ্ধিতে খাটো। আমাদের দুর্বোধ্য কবিতা হয়তো খুব উচ্চাঙ্গের, কিন্তু যতক্ষণ বুঝিতে না পারিতেছি ততক্ষণ আমাদের সংশয়ের অবস্থা। সংশয়ের বস্তু পাঠকের পাতে দিই নাই, ইহা যদি দোষের হয় তবে সে দোষ স্বীকার করিতেছি।

আমাদের মাপকাঠি কি এতক্ষণ বলিলাম, কিন্তু তাহা কি নয় আরও সহজে বলা যায়। আমরা কাব্যকে কাব্যরূপেই

বিচারের চেষ্টা করিয়াছি ; কাব্যের একটি স্বতন্ত্র দাবী আছে এই সহজ সত্যটি সবিনয়ে স্বীকার করিয়া লইলে অনেক কুয়াশা আপনি কাটিয়া যায়। রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক মতবাদের যেমন নিজস্ব মূল্য ও দাবী আছে, কাব্যেরও তেমনি একটি নিজস্ব মূল্য ও দাবী বর্তমান। ইহা সব সময়ে স্বীকৃত হয় না বলিয়া কাব্যে ও অকাব্যে তালগোল পাকাইয়া যায়। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও রুচি অনুযায়ী নির্বাচন কালে কাব্যকে অকাব্যের জনতা হইতে বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি। আরও একটি কথা। নবরসের মধ্যে আমরা সাধারণত মধুর রসের কবিতা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। অ-মধুর রসকে বেশি প্রশ্রয় দিই নাই।

॥ ২ ॥

কাব্যবিতানকে দুই খণ্ডে বিভক্ত বলা চলে। বড়ু চণ্ডীদাস্ হইতে প্রাচীন কাল, ঈশ্বর গুপ্ত হইতে নবীন কাল। প্রাচীন কালে ৪৯ জন কবি, নবীন্ কালে ১১১ জন কবি ; সমগ্র কালে ১৬০ জন কবি আছেন। প্রাচীন কবিদের কাব্য নির্বাচনে তেমন বেগ পাইতে হয় নাই। যে দূরত্বে সন্নিবেশিত হইলে ভালো-মন্দ অবধারণ সহজ হয়, তাঁহারা সেই দূরত্বে সন্নিবিষ্ট।

যতদূর সম্ভব আমরা খণ্ড কবিতা বাছিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৈষ্ণবপদের বেলায় অসুবিধা হয় নাই, এগুলি খণ্ডও বটে, ক্ষুদ্রও বটে, অনেকগুলি করিয়া দিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্য-রচনাকারীদের বেলায় সে সুযোগ না থাকায় তাঁহাদের কাব্য হইতে খণ্ডিত অংশ দিতে হইয়াছে। ময়মনসিংহ-গাথার বেলাতেও এই একই কথা।

নবীন কালেও ঐ নিয়ম অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি— আর, দুটি তিনটি ক্ষেত্র বাদে তাহা সম্ভবও হইয়াছে।

এবারে কবিতার সংখ্যা সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বলিলে ভুল-

বোঝাবুঝি হইবার আশঙ্কা আছে মনে হয়। মধুসূদনের কাব্য হইতে সাতটি কবিতা লইয়াছি, রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে কুড়িটি। অন্য সকল কবির বেলায় হয় দুটি নয় একটি। সংখ্যা রসের প্রমাণ নয়। সম্ভব হইলে রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনের আরও কবিতা লইতাম, কিন্তু তাহা সম্ভব নয়, আর তাঁহাদের ক্ষেত্রে আবশ্যকও নাই, কেন না, নানা শ্রেণীর সঙ্কলনগ্রন্থের কৃপায় (নিজেদের গ্রন্থ তো আছেই) তাঁহাদের কাব্য সুবিদিত। অন্যান্য কবির কথাই বলি। যাঁহাদের দুটি করিয়া কবিতা লইয়াছি তাঁহারা সকলে যে একপর্যায়ভুক্ত বা সমগুরুত্বসম্পন্ন এমন আমরা মনে করি না বা অপরেও মনে করিবেন আশা করি না। আবার যাঁহাদের একটি করিয়া কবিতা লইয়াছি তাঁহারা কবি হিসাবে নিম্নতর পর্যায়ের এমন আমরা মনে করি না বা অপরেও মনে করিবেন আশা করি না। ইহাতে সঙ্কলনকর্তা ছাড়া আর কাহারও ন্যূনতা প্রমাণ হয় না। এ ভাগ কাজের সুবিধার ভাগ—অন্য কোন গুরুত্ব ইহাতে কেহ যেন আরোপ না করেন।

নবীনতর কবিদের কবিতা কেন বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি সে কথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু বই ছাপা হইবার পরে দেখিতেছি যে কয়েক জন প্রবীণ কবিও বাদ পড়িয়া গিয়াছেন —ইহা অমার্জনীয় অনবধানতা। ভবিষ্যতে অন্যান্য ত্রুটির মত এ ত্রুটিও সংশোধন করিয়া লইবার ইচ্ছা রহিল।

॥ ৩ ॥

যে-সব কবি, কবিতার স্বত্বাধিকারী ও উত্তরাধিকারী অনুগ্রহপূর্বক কবিতা মুদ্রণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু নিতান্ত বন্ধুস্নেহবশে বইখানির প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব লইয়া যে কঠিন সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন তাহার স্বরূপ একমাত্র আমি জানি। তাঁহার রসজ্ঞান ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন বইখানার প্রত্যেক পৃষ্ঠা বহন

করিতেছে। বস্তুত তাঁহার অকুণ্ঠ সাহায্য না পাইলে এ বই এভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। ধন্যবাদের আকাঙ্ক্ষায় তিনি কাজে নামেন নাই, কাজেই ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিব না। বেঙ্গল পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিতান প্রকাশে যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা বাঙালী পাঠকসমাজের ধন্যবাদের পাত্র। পাঠকসমাজের উপরে সে ভার অর্পণ করিয়া আমি কেবল ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা মাত্র জানাইয়া ক্ষান্ত হইলাম।

এই গ্রন্থের অপর সঙ্কলনকর্তা শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ। অশেষ পরিশ্রম, সূক্ষ্ম বিচার ও লঘুগুরু তৌল করিয়া তিনি কবিতাগুলি নির্বাচন করিয়াছেন। নবীন বয়সেই কবিতা-অকবিতায় ভেদ বুঝিবার যে বিচক্ষণতা তিনি দেখাইয়াছেন তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আর সেইজন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি—এখন দেখিতেছি ঠকি নাই। তিনি এ দেশে উপস্থিত থাকিলে এই বই আরও সত্বর প্রকাশিত হইত, ভ্রমপ্রমাদও কম থাকিত। বছর দুই আগে তিনি লণ্ডনে গিয়াছেন, বর্তমানে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত London School of Oriental and African Studies নামে বিখ্যাত বিদ্যায়তনের অধ্যাপক। সেখানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এটি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ভরসার কথা। এ বইএর সর্বপ্রকার দায়িত্ব সমানভাবে আমাদের দুইজনেরই, কিন্তু বয়সে বড় বলিয়া স্বভাবতই ভ্রমপ্রমাদত্রুটির দায়িত্ব আমারই অধিক। সঙ্কলন, মুদ্রণ ও প্রকাশন সমাপ্ত হইল, এবারে ভুলত্রুটি ও অক্ষমতার দায়িত্ব স্বীকার করা ছাড়া আর কি করিবার থাকিতে পারে?

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কবিতা, লিরিক-জাতীয় রচনা। প্রাচীন যুগের মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবজীবনীগুলি গদ্যধর্মী, সেকালে সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রচলন থাকিলে খুব সম্ভব এ সব গদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিত। বাংলা সাহিত্যের লিখিত রূপ যে সময় হইতে পাওয়া যায় তখন হইতেই ইহার লিরিক প্রকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা প্রাচীনতম নিদর্শন গ্রহণ করি নাই, চর্যাগুলি সাধারণের অবোধ্য ভাষায় লিখিত। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি বাংলা কাব্যে এই লিরিক প্রবাহটি অক্ষুণ্ণ আছে। সে প্রবাহটি কখনো ক্ষীণ, কখনো উদার, কখনো গভীর, কখনো শুষ্কপ্রায় হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে নাই। এখন, এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের সমগ্র রূপটি সঙ্কলিত করিয়া একখানি গ্রন্থে দেখিবার মানসে এই গ্রন্থের রচনা বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত প্রতিভার আবিষ্কার বা ব্যক্তিগত কবিকীর্তির স্বরূপ উদ্ধার, বা ব্যক্তিগত কবির রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংগ্রহ এ সঙ্কলনের তেমন উদ্দেশ্য নয়—যেমন হইতেছে বাংলা কাব্যের লিরিক প্রবাহের অখণ্ড, অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্ন রূপটি দেখিবার ইচ্ছা। এ গ্রন্থখানাকে বাংলা কাব্যপ্রবাহের একখানি ক্ষীণ মানচিত্র বলিয়া দাবী করি। এ দাবী যদি কাহারও কাছে স্পর্ধা বলিয়া মনে হয়, তবে তাঁহাকে মনে করাইয়া দিব যে, এই স্পর্ধার মূলে বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা নাই, আছে বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র রূপ দেখিবার ও দেখাইবার ইচ্ছা। বাহাদুরি অপরকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেকে দেখাইতে চায়—অনুরাগ দেখাইতে চায় অনুরাগের পাত্রকে। সঙ্কলনকারিদ্বয় এখানে সামান্যতম উপলক্ষ্য মাত্র। তাহারা দুইজনে কাব্যপ্রবাহের দুই কূল ধরিয়া চলিতে চলিতে মানচিত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছে, আর তাহা সযত্নে পাঠকগণের সম্মুখে এখন উপস্থাপিত হইল। তাহাদের

আশা এই যে, বইখানা দেখিলে পাঠক বাংলা কাব্যের মূল প্রবাহের সমগ্রতার ও স্বরূপের একটা আভাস পাইবেন। দেখা যাইবে যে, 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে, কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে'—সেই বাঁশীর সুর আজও অক্ষীণ ধারায় বাজিতেছে ; রবীন্দ্রনাথের হাতের গুণে বাঁশীর সুর বীণাধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে, মধুসূদনের বাঁশীর সঙ্গে তাল রক্ষা করিয়া ভেরীমন্দ্র বাজিয়াছে ; কখনো ক্ষীণ, কখনো প্রস্ফুট সত্য, কিন্তু কোনোখানে ছেদ পড়ে নাই, কখনো অবসান ঘটে নাই, বড়ু চণ্ডীদাস হইতে জীবনানন্দ দাশ অবধি বাঁশী বাজিয়াই চলিয়াছে। এ বাঁশরী-সঙ্গীতের অবসান না ঘটুক।

বাংলা কাব্যে দুটি অবিস্মরণীয় যুগ। একটি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল। বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ। অপরটি, মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান পর্যন্ত আশী বৎসর কাল। এটিরও প্রধান ঐশ্বর্য লিরিক-জাতীয় রচনা।

বর্তমান মুহূর্তে বাঙালীর প্রতিভা বা শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিকগণের প্রতিভা লিরিক ধারায় প্রবাহিত হইতেছে না, সার্থকতার অন্যপথ অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, দুদিন পরে হোক, বা পঁচিশ বছর পরে হোক, জাতীয় প্রতিভা স্বকীয় অভ্যস্ত খাতে আবার ফিরিয়া আসিবে। নদী আপন শয্যা চিরকালের জন্য ত্যাগ করে না।

বর্তমান কাল মহৎ কাব্যকীর্তির অনুকূল নয়—এ কেবল বাংলাদেশের পক্ষে নয়, সকল দেশের পক্ষেই সত্য। কেন এমন হইল? পৃথিবীর আবহাওয়ায় এমন কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহার ফলে এমন ঘটিল কি? মেকলে বলিয়াছেন বটে যে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে কাব্যের প্রসার কমিয়া আসিবে। মেকলের অনেক কথার মতই এ কথাটাও অর্ধসত্য। বিশুদ্ধ

বিজ্ঞানের সঙ্গে কাব্য বা অন্য শিল্পের বিরোধ নাই, দুই-ই সত্যের সন্ধান করে। আসল বিরোধের কারণ অন্যত্র। টেকনোলজি বা যন্ত্রবিদ্যার প্রসার কাব্য ও শিল্পের অন্তরায়। টেকনোলজি বস্তুর সন্ধান করে, সত্যের সন্ধান নয়। বিশ্বকর্মা ওস্তাদ কারিগর মাত্র, তাহার ওস্তাদি যতই প্রশংসার্হ হোক, স্রষ্টার স্থান সে অধিকার করিতে পারে না।

কাব্য ও শিল্পের অবনতির আর একটি কারণ Liberal Educationএ আস্থার অভাব, ও তাহার সঙ্কোচ। Liberal Educationএর অধীশ্বরী সরস্বতী। তাহার বিপরীত শিক্ষা-রীতির অধীশ্বর কে? আমার মনে হয়, ঐ কারিগর বিশ্বকর্মা। 'উদার শিক্ষা'র পাঠশালা-পলাতক ছাত্রের দল তাহার কারিগরী বিদ্যালয়ে গিয়া ভিড় জমাইতেছে, আর অল্প দু'চার দিনের মধ্যেই পাঠ সমাপ্ত করিয়া বস্তুসন্ধানতৎপরতার ডিগ্রি লইয়া হাসিতে হাসিতে খনিতে নামিতেছে, কারখানায় ঢুকিতেছে। সকলেরই উৎসাহের অন্ত নাই। দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাইবে যে! দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতে কাহরও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু মানস-সম্পদও তো একটা ঐশ্বর্য। কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি কি ঐশ্বর্য নয়? এ-সমস্তর সম্ভাবনার পথ বন্ধ করিয়া একান্তভাবে পটাশ ও লৌহপিণ্ড সৃষ্টিটাই কি একমাত্র বাঞ্ছনীয়? এ ভাবে কিছুকাল চলিলে ঐ পটাশ ও লৌহপিণ্ডের পিরামিড-স্তূপের চূড়া হইতে যে মনোভূমি দৃশ্যমান হইবে তাহার কাছে সাহারা মরুভূমি মাথার টাকের মতই ক্ষুদ্রায়ত।

কাব্য ও শিল্পের অবনতির এ দুটি কারণ ছাড়া আরও কারণ আছে। প্রভুত্বপ্রয়াসী রাজনীতিক ও শাসকগণ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ শিল্প ও Liberal Educationকে মনে মনে বড় ভয় করে, এ-সমস্ত সত্যের সন্ধান দেয় বলিয়াই ভয় করে; তবে এগুলিকে একেবারে অস্বীকার করাও চলে না, তাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্থলে বা নামে টেকনোলজি, বিশুদ্ধ শিল্পের স্থলে বা

নামে প্রচারধর্মী সাহিত্য এবং Liberal Educationএর স্থলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিক্ষাপদ্ধতি প্রসারে তাহাদের বড় উৎসাহ।

এখন, এতগুলি কারণ যেখানে বিশুদ্ধ শিল্পের প্রতিকূল সেখানে বেচারা কাব্যের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। দুঃস্বপ্নের কালরাত্রি অবসানের অপেক্ষায় নীরবে ধৈর্য ধরিয়া থাকা ছাড়া সে আর কি করিতে পারে? এ দুরবস্থার কখনো অবসান ঘটিবে কি? একমাত্র ইতিহাসই ইহার উত্তরদানে সক্ষম।

॥ ৫ ॥

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মূল প্রেরণা তাঁহার দিব্যজীবনের প্রভাব। এই প্রভাবের ফলে বাংলা কাব্যসাহিত্য একটি উদারতা ও প্রসন্নতা লাভ করিল এবং পূর্ববর্তী সঙ্কীর্ণ খাত হইতে বাহিরে আসিয়া জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে দাঁড়াইল। পূর্বতন গ্রাম্য পরিবেশ, গোষ্ঠী-পরিবেশ ও ক্ষুদ্র আনুষ্ঠানিক দৃষ্টি পিছনে পড়িয়া রহিল। দিব্যজীবনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ মুক্ত হৃদয়ের কাব্য বৈষ্ণব-পদাবলী। মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধের উপরে এ যুগের কাব্যের প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় গৌরবময় যে যুগের উল্লেখ করিয়াছি, বিদ্যাসাগর ও মাইকেলে যাহার সূচনা, তাহার প্রতিষ্ঠা প্রধানত মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধের উপর। এ যুগের মূল প্রেরণা আসিয়াছে পশ্চিমের চিত্তলোক হইতে, কোন দিব্যপুরুষের জীবনপ্রভাব হইতে নয়। ইহাতেই এ যুগের সাহিত্যের সঙ্গে সে যুগের সাহিত্যের মূল পার্থক্য। সে যুগে কাব্যকেন্দ্রে ছিলেন চৈতন্য-দেব, এ যুগের কাব্যকেন্দ্রে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতিষ্ঠিত নির্বিশেষ মানব। তাই এ যুগের সাহিত্যের প্রধান গুণ অসাম্প্রদায়িকতা।

নব্য যুগের প্রথম কবি রূপে যাঁহার কবিতা সঙ্কলিত সেই ঈশ্বর গুপ্ত এ দু'এর কোন ধারার অন্তর্গত নহেন। তাঁহার

কাব্যশিল্পের আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তখন না ছিল ভারতের যুগ, তাঁহার না ছিল ভারতচন্দ্রের প্রতিভা; তিনি না পাইলেন নব্যযুগের প্রাণের ইঙ্গিত, না পাইলেন পুরাতন সমাজব্যবস্থার অটল ভিত্তি। ফলে জীবনোপকরণবিচ্যুত তাঁহার শক্তি অকিঞ্চিৎকরতায় ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। নিছক কবি-প্রতিভার বিচারে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভেদেই কবিদ্বয়ের কাব্যসৃষ্টিতে তারতম্য ঘটিয়াছে। মনে করাইয়া দিতে চাই যে, এখানে কেবল কাব্য ও কবিতার কথাই বলিতেছি, সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গের কথা বলিতেছি না।

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইল মেঘনাদবধ কাব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার চেয়ে বড় বিষয় আর কি আছে জানি না। দুর্গেশনন্দিনীও এমন বিস্ময়-কর নয়, কেন না, আলালের গল্প বলিবার উৎকর্ষ ও সীতার বনবাসের গদ্যরীতির উৎকর্ষ দুর্গেশনন্দিনীর পূর্বসূত্ররূপে বিরাজ করিয়া বিস্ময়বোধকে বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পরে মেঘনাদবধ কাব্য—এ যে দুস্তর ব্যবধান। এই অকস্মাৎ-মধ্যাহ্নপরিণতির মূলে আছে পাশ্চাত্ত্যের চিত্তলোকের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এটি এ যুগের সাহিত্যিকের পক্ষে অনিবার্যতম গুণ। বিদ্যাসাগরের সময় হইতে এ পর্যন্ত এমন একজনও উল্লেখযোগ্য বাঙালী সাহিত্যিক দেখা যায় না যিনি পাশ্চাত্ত্যের চিত্তলোকের সহিত কিছু না কিছু পরিচিত নহেন। খাঁটি বাঙালী সাহিত্যিক আর সম্ভব নয়, কেননা এ যুগের আমরা যে-লোকে ও যে-যুগে বাস করিতেছি যথাক্রমে তাহাদের নাম বিশ্বলোক ও বিশ্বযুগ।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক খ্যাতির কারণ-নির্ণয় এখনকার পাঠকের পক্ষে দুষ্কর। তাঁহাদের মহাকাব্যগুলি ব্যর্থতার

মরুভূমি। এখানে-ওখানে যে দু'চারটি মরুদ্যান দেখা যায় সে-সব নিতান্তই লিরিক উচ্ছ্বাস। মধুসূদনের বলিবার কিছু ছিল, ইঁহাদের কিছু বক্তব্য ছিল না। মধুসূদনগঠিত নূতন কাব্যসংস্কার বা Traditionটা মাত্র ছিল তাঁহাদের সম্বল। প্রাণহীন সেই সংস্কার তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাকাব্য (?) না লিখিয়া হেমচন্দ্র যদি সমাজবিষয়ক ব্যঙ্গকাব্য ও ব্যঙ্গনাট্য রচনা করিতেন, নবীনচন্দ্র যদি মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া কাব্য না লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া উপন্যাস লিখিতেন— হয়তো তাঁহাদের কীর্তি সময়ের বিচারে অধিক টেঁকসই হইত।

বিহারীলাল এক সময় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিলেন। তার পরে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কল্যাণে এমন মূল্য লাভ করিয়াছেন যাহা তাঁহার প্রাপ্য মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু'চার কথায় কিছু বলা অতিশয় কঠিন। মধুসূদনের আরব্ধ কার্য রবীন্দ্রনাথে আসিয়া একটা চরম পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে। ইঁহাদের কৃপায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু একথা ঠিক যে, বাংলা সাহিত্য বিশ্বপথিকে পরিণত হইয়াছে। এখন আর তাহার পক্ষে পূর্বতন পল্লীগৃহে বা গোষ্ঠগৃহে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। নব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদে যে urbanity গুণ দেখা যায় প্রাচীন সাহিত্যে তাহা বিরল। এমন কি, তুলনায় বহুমানাস্পদ বৈষ্ণবপদাবলীও Parochial বলিয়া অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল যে পাশ্চাত্ত্য চিত্ত ও ভারতীয় চিত্তের সঙ্গে পরিচিত এমন নয়, এ দেশের লোকচিত্তজাত কাব্যের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় সুগভীর। দেশবিদেশের বহুধারার কলোল্লাস ধ্বনিত তাঁহার কাব্যে।

রবীন্দ্রকাব্য হইতে কুড়িটি মাত্র কবিতা নির্বাচন করিয়া সকল পাঠককে খুশী করা যায় না, সে চেষ্টাও করি নাই। অন্য একটি নিয়ম অনুসরণ করিয়াছি। চয়নিকা, সঞ্চয়িতা বা অন্য

সঙ্কলনগ্রন্থ-যোগে খ্যাতিলাভ করে নাই—অথচ আমাদের বিবেচনায় কবির শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত, এমন কবিতা কুড়িটি লইয়াছি—একশ'টি লইলেও স্বল্পখ্যাত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাণ্ডার নিঃশেষ হইত না।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকগণের মধ্যবর্তী কালে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কবির সংখ্যা অল্প নয়। যথাসাধ্য সকলের কবিতাই সংগ্রহ করিয়াছি। অনেকের কবিতা এই বোধহয় প্রথম কোন সঙ্কলনগ্রন্থে স্থান পাইল। এ রকম অজ্ঞতা বা অশ্রদ্ধাজাত উপেক্ষা সাহিত্যের পক্ষে ভালো নয়। কাব্যে উপেক্ষিতের এখানেই শেষ মনে করি না। পুরাতন সাময়িক পত্রের মুদ্রিত পত্রগুচ্ছে অনেক মৌমাছির গুঞ্জরণ নীরব হইয়া আছে। সেগুলি অচিরে আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইলে বাংলা কাব্যের সম্পদ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের একটি যুগাবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রতি যুগ তো সরাসরি আপন অবসান আনে না, পুরাতনের জের চলে, নূতনের সূচনা দেখা দেয়—এইভাবে নূতনে পুরাতনে জোড় মিলাইয়া যুগসূত্র গাঁথা হইতে থাকে। তবু এ ক্ষেত্রে পুরাতনের চেয়ে নূতনের মূল্য বেশি।

পূর্ববর্তী যুগে ছিল কাব্যে বিষয়ীর প্রাধান্য, নূতন যুগে দেখা দিতেছে কাব্যে বিষয়ের প্রাধান্য। বিষয়ীর অতিগুরুত্ব কাব্যকে অনেক পরিমাণে অবাস্তব করিয়া তোলে, সেটা ক্ষতিকর। আবার বিষয়ের অতিগুরুত্ব কাব্যকে বহুল পরিমাণে অতিবাস্তব করিয়া তোলে—সেটাও ক্ষতিকর। কাব্য কুজ্‌ঝটিকা নয়, আবার সংখ্যা-তত্ত্বও নয়। বিষয় ও বিষয়ীর যথোচিত সমন্বয়েই কাব্যের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য। পূর্বযুগ যদি একদিকে ঝুঁকিয়া থাকে তবে বর্তমান যুগ অপর দিকে ঝুঁকিবার প্রবণতা দেখাইতেছে। বর্তমান যুগ সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে ইহার অধিক বলিবার দুঃসাহস রাখি না।

॥ ৬ ॥

সাহিত্যবিচারে সবচেয়ে কঠিন সমকালীন রচনার মূল্যনির্ধারণ। সে চেষ্টা করিব না। তবে সাধারণভাবে দু'চারটি কথা বলিতে বাধা নাই। কোন কোন কবি ও সমালোচক বর্তমান কালে রচিত কাব্যকে "আধুনিক কবিতা" নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন। এখানে "আধুনিক" অর্থ অধুনা-কালে-রচিত মাত্র নয়, একটি বিশেষ গুণের প্রতিই তাঁহারা লক্ষ্য করেন, তাঁহাদের মতে আধুনিক কবিতার "আধুনিক" কালবাচক সংজ্ঞা নয়, গুণবাচক সংজ্ঞা। এখন জিজ্ঞাস্য, এই "আধুনিকতা" গুণটি কি? রবীন্দ্রযুগের কাব্যলক্ষণের সঙ্গে ইহার প্রভেদ কোথায়? রবীন্দ্র-যুগের কাব্যের সঙ্গে "রবীন্দ্রোত্তর" বা "রবীন্দ্রেতর" কবিগণের কাহারও শিল্পধর্মে কোন প্রভেদ ঘটে নাই এমন মনে করা ভুল। ভাষা, ছন্দ, যতিস্থাপন ও কাব্যবস্তুর নূতন পরীক্ষা চলিতেছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু এগুলিকেও একটি সামান্য লক্ষণ বলা চলে না, এক এক কবির ক্ষেত্রে এক এক রকম পরীক্ষা। আর, সকলের ক্ষেত্রে পরীক্ষাটা সমান হইলেও তাহাকে কাব্যে নবযুগের বা আধুনিকতার লক্ষণ বলিতাম না। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের অভিনবত্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্য নয়—ঐ কাব্যে জীবন সম্বন্ধে যে নূতন চেতনা ও দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে সেই জন্যই। "আধুনিক" কবিগণের মধ্যে সেই নূতন জীবনচৈতন্য প্রকাশ পাইয়াছে কি? অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে কাহারও কাহারও কাব্যে আঙ্গিকের অভিনবত্ব আছে। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? এ যেন—পাগড়িটা নূতন কিন্তু মাথাটা কোথায়?

তবে কি কাব্যে আধুনিকতা বলিয়া কোন গুণ আদৌ নাই? আছে বলিয়াই মনে করি—কিন্তু বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা এখনো দেখা দেয় নাই। সে বস্তু কি যেমন বুঝিয়াছি বলিবার চেষ্টা করিব।

জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিচ্ছেদ ও প্রকৃতি প্রভৃতি সর্বকালের কবি-

চিত্তকে বিচলিত করে এবং ভিন্ন ভিন্ন কবির ক্ষেত্রে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এখানে কবিতে কবিতে প্রভেদটাই সত্য। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে কখনো কখনো কোন একটি বৃহৎ বা মহৎ ভাব সমস্ত সমাজকে বা সমাজের বিরাট এক অংশকে যেন পাইয়া বসে আর তখন সেই ভাবাবেশে কবিতে কবিতে মৌলিক পার্থক্য অনেকটা ঘুচিয়া গিয়া সমস্ত কবিই অল্পবিস্তর একই সুরে যেন গান করিতে থাকে। এই বৃহৎ বা মহৎ ভাবটি তৎকালীন "আধুনিক গুণ"। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে কিছুকালের জন্য বাংলাদেশের বৃহৎ এক অংশ এইরকম একটি মহাভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছিল। সেকালে সাময়িকপত্র ও উদ্যোগী সমালোচক থাকিলে এই যুগব্যাপী দেশব্যাপী ভাবকে "আধুনিক" বলিয়া প্রচার করিতে পারিত।

আবার উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফসল ঘরে উঠিলে শিক্ষিত বাঙালীসমাজ একটি বৃহৎ ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে বিচিত্রতর ফসল ফলাইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি, মেঘনাদবধ কাব্য, বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রথম উপন্যাসগুলি, হেম-নবীনের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী প্রভৃতি সে যুগের বিশিষ্ট ফসল। কাব্যোৎকর্ষে তর-তমর অনিবার্য প্রভেদ ছাড়িয়া দিলে সমস্তগুলিতেই একটি সামান্য গুণ আছে, তাহাকে বলিতে পারি "আধুনিকতা" গুণ। অর্থাৎ ঐ গুণটি ঐ বিশেষকালোদ্ভূত—আর ঐ গুণটি তৎপূর্ব-কালেও ছিল না, আর পরবর্তী কালেও থাকিবে না।

এখন আমার কথা যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, কাব্যে আধুনিকতা গুণ অসম্ভব নয়, বরঞ্চ কোন কোন যুগে তাহা উজ্জ্বলমূর্তিতে দেখা দিয়া থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কাব্যে আধুনিকতা গুণের সঞ্চার কোন কবি-বিশেষের বা গোষ্ঠীবদ্ধ কবিগণের মর্জির উপর নির্ভর করে না। ইতিহাসের বৃহৎ হস্তক্ষেপের ফলেই একমাত্র তাহা সম্ভব।

গোড়ার প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করি—এইরূপ কোন বৃহৎ ভাবের দ্বারা আমাদের সমাজ বর্তমানে আবিষ্ট হইয়াছে কি? বরঞ্চ দেখি যে ভিন্ন ভিন্ন কবিগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পথে আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় নিযুক্ত। ইহা নিন্দার্হ নয়। বৃহৎ ভাবের অভাবে আত্মপ্রকাশের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা। আর স্বাভাবিক ভাবেই এক এক কবিগোষ্ঠীতে এক এক প্রকার শিল্পলক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। সে লক্ষণ, আগেই বলিয়াছি, টেকনিকের বা অঙ্গের, আত্মার নয়। তবে একটি বিষয়ে বিভিন্ন কবিগোষ্ঠীতে মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রপ্রভাব ও রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে স্বেচ্ছাকৃত প্রয়াসে এড়াইবার আগ্রহ। বলা বাহুল্য ইহা কোন বৃহৎ ভাব নয়, কিংবা ক্ষুদ্র গুণও নয়, ইহা একটি negative মনোভাব, অনেক সময়েই আপনার অক্ষমতার স্বীকৃতি মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কবিদের বড় সঙ্কটে ফেলিয়াছেন। অনেক "রবীন্দ্রোত্তর" কবি রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাব এড়াইবার আশায় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সে চেষ্টার ফলে তাঁহাদের কাব্য কি রূপ গ্রহণ করিতেছে তাকাইয়া দেখেন না। সে চেষ্টার ফলে তাঁহাদের কবিতা যদি অস্পষ্ট হয়, অর্থহীন হয়, বিকল ছন্দে রচিত হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই, তবু তাঁহারা রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকার করিবেন না। অনেক "রবীন্দ্রোত্তর" কবিকে একটা রবীন্দ্র-কম্‌প্লেক্স-এ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকার কবিবার অর্থ কি? বাংলা-দেশের জলবায়ু, আকাশ-বাতাসকে অস্বীকার করিবার মতই উহা নিরর্থক নয় কি? বাংলাদেশের নিসর্গ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া যদি কাব্যরচনা সম্ভব না হয়, তবে রবীন্দ্রকাব্যকেও অস্বীকার করিয়া কাব্যরচনা সম্ভব নয়। আর কোন কবি সেরূপ অবাস্তব চেষ্টাই বা করিবে কেন ভাবিয়া পাই না। তাঁহার প্রভাবকে অস্বীকার করিবার সরল অর্থ হইতেছে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে অস্বীকার। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যকে যেখানে

পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, সম্ভব হইলে সেখান হইতে শুরু করিতে হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি উল্টাপথে যাত্রা করা যায় তবে তাহার নাম অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া। কাব্য বা কবি বা বাংলা সাহিত্য কাহারও পক্ষেই উহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

কিন্তু "রবীন্দ্রোত্তর" কবিগণের এই অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার মূলে আছে একটি প্রবল হীনমন্যতার ভাব। তাঁহাদের ভয় এই যে, রবীন্দ্রকাব্যের ধারে-কাছে অগ্রসর হইলে জ্যোতিষ্করাজ তাঁহাদের মত নগণ্য উল্কাপিণ্ডকে টানিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। সেই ভয়ে তাঁহারা দূরত্ব রক্ষা করিয়া এমন পাড়ায় সঞ্চরণ করেন যেখানে রবির টান পৌঁছায় না এবং রবির আলো। ভাবাকাশের সেই সুদূর গড়ের মাঠে রবীন্দ্রোত্তরগণ অর্থহীন শব্দের কুয়াশায় আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করিয়া নৈশভ্রমণ সমাধা করেন। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা এই যে, ওরই মধ্যে নিজেদের অনবধানতায় তাঁহাদের কাব্য যেখানে একটু স্পষ্ট, একটুখানি অভিধান-ব্যাকরণ ও কাণ্ডজ্ঞানসম্মত, সেখানেই রবীন্দ্রপ্রভাব—কি ছন্দঃস্পন্দে, কি শব্দসমন্বয়ে, কি ভাববিন্যাসে। অনবধানতাজাত ঐ ছত্রগুলি প্রমাণ করিয়া দেয় যে, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথেরই কাব্য-জগতের অধিবাসী ; আরও প্রমাণ করে যে, তাঁহাদের অনেকেরই সত্যকার কবিদৃষ্টি আছে। এ প্রহসন বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক ট্রাজেডি।

আসল কথা, পূর্ববর্তীদের প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া কাব্য-রচনার চেষ্টা সম্ভব বা উচিত নয়, তাহাতে একঘরে হইয়া পড়িতে হয়। পূর্ববর্তীদের চেষ্টাকে আত্মসাৎ করিতে হইবে। ইহাই 'প্রগতি', বিপরীত ক্রিয়া 'প্রতিক্রিয়া'।

রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তাঁহার আদিকালের কাব্যে হেমচন্দ্র, বিহারীলাল ও বৈষ্ণবকবিগণের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই, বা সে প্রভাব অস্বীকার করিবার চেষ্টায় নিজেকে বিড়ম্বিত করেন নাই। স্বভাবের নিয়মে

এবং কবিপ্রকৃতির প্রাণধর্মের বেগে সে-সব প্রভাবকে অতিক্রম ও আত্মসাৎ করিয়াছেন, এবং সেই সার্থক প্রচেষ্টার দ্বারা সমৃদ্ধতর হইয়া অবশেষে আপন অভ্রান্ত স্বকীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রোত্তরগণ বলিতে পারেন যে আমাদের শক্তি অল্প, রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘেঁসিলে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা, কাজেই আত্মরক্ষার আশায় দূরে দূরে থাকি। রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধে সোরাবের পরাজয় হইলেও প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল যে সোরাব বীরপুরুষ, রোস্তমেরই যোগ্য উত্তমপুরুষ। আজকার দিনে কে কবি আর কে কবি নয় তাহার একমাত্র কষ্টিপাথর রবীন্দ্রসান্নিধ্য। যে কবির মূলধন বেশি, রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার নিজস্ব কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে; যাঁহার মূলধন অল্প, তাঁহার অল্প উদ্বৃত্ত থাকিবে, যাঁহার মূলধন নাই, তিনি ধরা পড়িয়া যাইবেন। তাহাতেই বা আক্ষেপ কিসের? কবিতারচনাতেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা নয়, তিনি অন্যত্র প্রতিভার পথ সন্ধান করিবেন। জীবনের ক্ষেত্র ব্যাপক, জীবনের সার্থকতার পথ অগণ্য।

অনেক "রবীন্দ্রোত্তর" কবি দুরূহতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দুরূহতা নানা শ্রেণীর। এক শ্রেণীর দুরূহতা নিতান্তই শব্দগত। অভিধান মন্থন করিয়া উৎকট ও অপরিচিত শব্দ সাজাইয়া তাঁহারা কবিতা রচনা করেন, তন্মধ্যে সমস্তই যে বাংলা বা সংস্কৃত এমন নয়, ইংরেজী, ফরাসী ও গ্রীক-লাটিনও থাকে। হাতের কাছে বিশ্বশব্দকোষ না লইয়া বসিলে সে সব বুঝিয়া ওঠা অসম্ভব, অবশ্য হরিনাথ দে বা ব্রজেন্দ্র শীলের কথা স্বতন্ত্র। এই সব কবি ভুলিয়া যান যে, শব্দ কেবল অর্থের দ্বারা পাঠকের মনকে উদ্বোধিত করে না, অর্থের অতিরিক্ত একটি ভাবমণ্ডল তাহাকে ঘিরিয়া সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ভাবমণ্ডলের দ্বারাই পাঠকের চিত্তে রসের উদ্বোধন ঘটে। উৎকট ও অপরিচিত শব্দে সেই ভাবমণ্ডলের অভাব, কাজেই পাঠকের পক্ষে সে সব নিরর্থক।

আর একশ্রেণীর দুরূহতা অন্য প্রকার।

অনেক কবিতার প্রত্যেকটি শব্দ সুবোধ্য, এমন কি প্রত্যেকটি ছত্রও সুবোধ্য, কিন্তু এক ছত্রের সঙ্গে অন্য ছত্রের অর্থগত সঙ্গতি নাই, কাজেই সমস্ত কবিতাটি একটি অর্থগত হট্টগোল। হাটের মধ্যে প্রত্যেক লোক যে কথা বলে খুব অর্থপূর্ণ, কিন্তু সামগ্রিকভাবে হাটের গোলমাল যে শোনে সে কোন অর্থ পায় না, তাই তাহাকে বলা হয় হট্টগোল।

তৃতীয় শ্রেণীর দুরূহতাই চরম, তাহার ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত কোন প্রকার অর্থই হয় না। এ সব কে বোঝে জানি না। অন্তত সম্পাদকগণ বোঝেন, নতুবা ছাপিবেন কেন? কিন্তু কি উপায়ে বোঝেন তাহা দুর্বোধ্য। হয়তো কোন Special Code আছে। কিন্তু পাঠকসাধারণের কি উপায়? যে-পাঠক হোমার হইতে হুমায়ুন কবীরের যাবতীয় কবিতা বোঝেন তাঁহাদের নির্বোধ মনে করিতে পারি না।

এখন, এই দুরূহতার আসল কারণ কি? মনের দীনতা ঢাকিবার উদ্দেশ্যে এসব কি Smoke Screen বা কুয়াশার আবরণ? না, রবীন্দ্রপ্রভাব এড়াইবার উদ্দেশ্যে অপথে চলিবার চেষ্টা? আমার মনে হয় দুটা কার্যকারণে জড়িত, দীন মন কাব্যের সদর রাস্তায় চলিতে ভয় পায় বলিয়াই দুরূহ শব্দের কাঁটাবনে নামিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার আছে। ইঁহারা রবীন্দ্রপ্রভাব এড়াইতে গিয়া কোন কোন আধুনিক দুর্বোধ্য বিদেশী কবির (কবি কি না আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে !) কাছে ধরা দিয়া বসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত একথা স্বীকার করায় লজ্জা আছে, কিন্তু বিদেশী কবির প্রভাবে লজ্জার কি থাকিতে পারে?

"আমি স্বদেশবাসী, আমায় দেখে
লজ্জা হতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে
লজ্জা কি লো তারে?"

দুরূহতা কাব্যের গুণ নয়, দোষ, বোধ করি মহত্তম দোষ। আর সে দোষের মূলে কবির দীনতা, শিল্পশক্তির অক্ষমতা বা অপূর্ণতা, এবং সাহসের অভাব। লোকে বুঝিবে বলিয়া লেখা, লোকে যদি না বুঝিল লিখিবার সার্থকতা কি? এখন, অনেকে এক প্রকার "সন্ধ্যাভাষা" ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহাদের কাব্য সাধারণ পাঠকের আসরে আসিয়া পৌঁছায় না, এক একজন কবিকে কেন্দ্র করিয়া নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। ফলে ইঁহারা প্রায় নীরব কবির পর্যায়ভুক্ত হইয়া বিরাজ করেন।

কিন্তু, না, খুব সম্ভব এই সব কবি বলিবেন, আমাদের কবিতা এর বেশি স্পষ্ট হইবার নয়, কারণ এ-সব অভিধান-ব্যাকরণ বা সাধারণ ভাষারীতির পথ বাহিয়া আসে না, মনের অতি গোপন গর্ত হইতে, মনের Subconscious অংশ হইতে সোজা ভুরভুরি কাটিয়া চিত্ততলে দেখা দেয়, স্বাভাবিক নিয়মেই সে-সব দুর্বোধ্য, কাজেই তাহার প্রকাশও দুরূহ হইতে বাধ্য। তাঁহারা বলিবেন এ-সব Subconsciousএর হাতছানি। হাতছানির একটা মোটা অর্থ আছে, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম অর্থ হয় না। কাজেই এ-সব কবিতা একটা স্থূল ইঙ্গিত দিতে পারে, তাহার বেশি আশা করা নিতান্তই জুলুম।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, তাহাও দিতে পারে কি? অন্তত কবির গোষ্ঠী-বহির্ভূত পাঠককে দিতে পারে কি?

এই সব দাবীর উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, কাব্যের প্রেরণা Subconscious বা অবচেতন লোক হইতেই আসুক কিংবা Superconscious বা উচ্চেতন লোক হইতেই আসুক, তদবস্থায় তাহাকে শিল্পে ব্যবহার করা চলে না। কাব্যের ইঙ্গিত বা প্রেরণা মনের চেতনলোকে আসিয়া পৌঁছিলে চৈতন্যচেষ্টার দ্বারা তাহাকে সর্বজন-ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতে হয়। খনির সোনা টাঁক-শালে আসিয়া তবেই সর্বজনগ্রাহ্য রূপ গ্রহণ করে। আধুনিক কবিগণের Subconsciousএর প্রেরণা মোটেই নূতন দাবী নয়।

যে-কালে যে-কেহ যখনই কবিতা লিখিয়াছেন (পোপ, ড্রাইডেন বা ভারতচন্দ্রের যুগ ছাড়া) অনুরূপ দাবী করিয়াছেন ; পরিভাষা ভিন্ন, এইমাত্র তফাত। কেহ অপৌরুষেয়ত্বের দাবী করিয়াছেন, কেহ অলৌকিকত্বের, কেহ জীবনদেবতার; এমনি কত কি। কিন্তু কেহই প্রেরণাকে সোজা কাব্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেন নাই ; Sub-conscious বা Superconsciousকে মনের Conscious Patternএ ঢালাই করিয়া তবে মুক্তি দিয়াছেন। কারণ শিল্পীর মূল আকাঙ্ক্ষা—মানুষ যেন তাহাকে না ভোলে ; তাহার মরদেহ নষ্ট হইবার পরেও মানুষে যেন তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার ব্যক্তিত্বকে মনে করিয়া রাখে। সেইজন্যই তাঁহারা মনের ছায়াময় ইঙ্গিত ও বেদনাকে সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। মহাকাব্য লিখিয়াছেন বলিয়া বাল্মীকি মহাকবি নন, যুগ যুগ ধরিয়া কোটি কোটি মানুষ তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বহন করিয়াছে বলিয়াই তিনি মহাকবি। এখন, আধুনিকগণ মানুষের মনে বাঁচিয়া থাকিবার সেই সরল উদার পথটাই যদি কাঁটাগাছ বুনিয়া রুদ্ধ করেন তবে সে দোষ কাহার ? গোষ্ঠীর কবি হইয়া থাকাই যেন তাঁহাদের আদর্শ। কিন্তু গোষ্ঠী কতদিন থাকিবে ? বুদ্বুদ ক্ষণস্থায়ী, নদীস্রোত চিরন্তন।

কবিতায় বাচ্যার্থে অস্পষ্টতার বা দুরূহতার স্থান নাই, সেখানে সেটা দোষ বলিয়াই গণ্য। তবে ব্যঙ্গ্যার্থে মতভেদের ও অর্থভেদের অবকাশ আছে। ইহাকে দুরূহতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু বস্তুত ইহাকে দুরূহতা না বলিয়া গভীরতা বলাই উচিত। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কবিতা ও গান পড়িয়াছি বলি না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে তাঁহার শত শত কবিতা ও গানের মধ্যে দু তিনটির বেশি ছত্রে বাচ্যার্থের দুরূহতা চোখে পড়ে নাই। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের বেলায় মতভেদের অবকাশ সুপ্রচুর। 'সোনার তরী' বা 'দুই পাখী' কবিতায় বাচ্যার্থের দুরূহতা আছে কি ? ব্যঙ্গার্থে মতভেদের সমাধান আজও হইল না, কখনো হইবেও না, যুগে

যুগে নূতন মন নূতন অর্থের সন্ধান পাইবে ঐ শ্রেণীর কবিতায়।

কিন্তু আবার খুব সম্ভব ইঁহারা বলিবেন, আমাদের কবিতা বুঝিবার যোগ্যতা তোমাদের নাই, আমরা সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরিয়াছি। এ দাবী কোন্ যুগে কোন্ কবি না করিয়াছেন ? এ দাবী যেমন পুরাতন, ইহার উত্তরও তেমনি পুরাতন ; কাব্যে মূল শ্রেণীভেদ নূতন ও পুরাতনে নয় ; মূল শ্রেণীভেদ কাব্যে ও অকাব্যে। এখন তাঁহারা কোন্ পথটা ধরিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কিন্তু কবিগণ বেয়াড়া স্বভাবের লোক, অপরের উপদেশ তাঁহারা শোনেন না। আমি নিজেও কখনো শুনি নাই। তাঁহারা শুনিবেন এমন আশা করি কেন।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি টি. এস্. এলিয়ট বলিয়াছেন যে, এ যুগের কাব্য দুরূহ হইতে বাধ্য। উক্তিটি খুব সম্ভব তাঁহার নিজ কাব্যের পক্ষে ওকালতি। আর যদি কোন অর্থ থাকে সহজে বোধ্য নয়। তবে একথা ঠিক যে বর্তমান যুগে কাব্যরচনা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমে আরও কঠিন হইবার আশঙ্কা। আর এই কঠিন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইবার ফলেই অধিকাংশ কবির কাব্য ও কবিতা সার্থক হইতেছে না।

এ যুগের অধিকাংশ কবি কাব্যের বিষয়নির্বাচনে ভুল করিতেছেন। এক সময়ে দান্তে বলিয়াছিলেন যে, কাব্যের যথার্থ বিষয়—War, God and Love! এই তিনটি বিষয় প্রায় সমগ্র জীবনক্ষেত্রকে স্পর্শ করে, অন্তত সে সময়ে করিত। কিন্তু বর্তমান জীবনক্ষেত্রের পরিধি ঐ তিনটি বিষয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় কি ? আধুনিক যুগে এমন সব ভাবতন্তুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে দান্তের সময়ে যাহা ছিল না। কাজেই কাব্যে বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। তার উপর, চলাচলের সুবিধায়, তার-বেতার, সংবাদপত্র ও সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় মানুষের মনের সম্মুখে প্রতিনিয়ত সংবাদপুঞ্জ স্তূপীকৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে স্থায়ী অস্থায়ী, মুখ্য গৌণ কত বিষয় রহিয়াছে ; অস্থায়ী ও গৌণের

সংখ্যা স্বভাবতই অধিক।

এখন, এই তথ্যের ভিড়ে কাব্যের বিষয়নির্বাচনে ভুল না হওয়াই অস্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ, টমাস হার্ডি বা ডি-লা-মেয়ারের ভুল হইবে না। কিন্তু অল্প শক্তিমান কবির ভুল হইবার সম্ভাবনা, আর সেইরূপ ভুলের সমষ্টিই আধুনিক কাব্য। আধুনিক কবিদের (শুধু এদেশের নয়) প্রথম ভুল এই যে, তাঁহারা জগতের যাবতীয় বিষয়কেই কাব্যের বিষয় মনে করেন। যাবতীয়বিষয় কাব্যে প্রকাশযোগ্য হইলে সাহিত্যে বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইত না, কাব্যই হইত একমাত্র সাহিত্য। এক সময় তাই তো ছিল, কিন্তু সমাজের জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষ ক্রমে বিষয়-বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হইয়াছে, আর স্বাভাবিক শিল্পজ্ঞানের ফলে বুঝিয়াছে যে, বিষয়ভেদে বাহনভেদ আবশ্যক। তাই এককালে যেখানে কেবল কাব্য ছিল সেখানে কালক্রমে গদ্য আসিয়াছে, এবং গদ্যকে অবলম্বন করিয়া বহুতর শাখাপ্রশাখা গজাইয়াছে—প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, পুস্তিকা, রম্যরচনা; যুগে যুগে নূতন শাখা গজাইতেছে এবং গজাইতে থাকিবে। বিষয়-ব্যাপ্তিতে শাখা-বৃদ্ধি—ইহাই স্বভাবের নিয়ম। কিন্তু একালের 'আধুনিক'-গণ এই বিবর্তন-ধারার বিরুদ্ধে চলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছেন, যদিচ ক্ষণে ক্ষণে স্বভাবের নিয়মচারিগণকে প্রতি-ক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত করা তাঁহাদের একপ্রকার মুদ্রাদোষ হইয়া পড়িয়াছে। রেলগাড়িতে চড়িয়া যে ব্যক্তি ছুটিতেছে স্বভাবেপ্রতিষ্ঠ গাছপালাগুলির পশ্চাদপসরণ তাহার চোখে প্রতি-ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে না হইয়া পারে না।

দান্তের মতে War কাব্যের বিষয়; হোমারের ইলিয়ডে কাব্যের বিষয় War বা যুদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক যুগের War Propaganda কাব্যের বিষয় হইবার যোগ্য নয়। কেননা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে মুখ্য ও গৌণাংশ বর্তমান; হোমার মুখ্যাংশকে অবলম্বন করিয়াছেন, আধুনিক কবি মুখ্যাংশকে

বুঝিতে পারে না, গৌণাংশকে অবলম্বন করে; যাহার যথার্থ বাহন Pamphlet তাহা পদ্যের ক্ষেত্রে অনধিকারপ্রবেশ করে। এ সেই কুমীরের শিয়ালের ঠ্যাং মনে করিয়া বটের শিকড় চাপিয়া ধরা! এ ধুগের আধুনিক কাব্যের বিষয়ের একটা তালিকা করিলে দেখা যাইবে যে, একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডি অব্ এররস্ ঘটিয়া গিয়াছে, যে-সব বিষয়ের স্বাভাবিক স্থান হ্যাণ্ডবিলে, প্রচার-পুস্তিকায়, সভার কর্মসূচীতে এবং বিজ্ঞাপনে, পদ্যে তাহাই পদচারণা করিতেছে। এসব যদি কাব্য হয় তবে শুভঙ্করীর পাটীগণিতও কাব্য; তবে শুভঙ্করীর স্বপক্ষে বলা চলে যে তখনই শুভঙ্করীর সৃষ্টি হইয়াছিল যখন আমাদের সাহিত্যে গদ্য সৃষ্টি হয় নাই।

কাব্যশিল্পের লক্ষ্য রসবাক্য-সৃষ্টি। রসবাক্য কি এখানে সে বিতর্কে যাইব না, ও বস্তু যে বোঝে সে বোঝে; সকলে বোঝে না; সকলে বুঝিলে এ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন হইত না।

কিন্তু সংসারের যাবতীয় বিষয়কে রসবাক্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। তার আবশ্যকই বা কি? বিষয়ানুসারে কোনটা রসবাক্য হইবে, কোনটা বা জ্ঞানবাক্য, নীতিবাক্য বা তত্ত্ববাক্য হইবে। এখন আধুনিক কবি ও তাঁহাদের উত্তরসাধক বা সমালোচকগণ জ্ঞানবাক্য বা নীতিবাক্য বা তত্ত্ববাক্যকে রস-বাক্যের মর্যাদা দিয়া একটা বিষম ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছেন। রূপ-কথায় পড়িয়াছিলাম শিয়াল ঘোমটা টানিয়া ঘরে ঢুকিয়া শেষে সর্বনাশ ঘটাইল! এও অনেকটা তাহারই অনুরূপ।

সেকালে হেম-নবীনের নীতিবাক্যকে কবিরা নিজে রসবাক্য মনে করিয়াছিলেন, অধিকাংশ পাঠকেও তাহাদের সেই মর্যাদা দিয়াছিল। আবার একালে আধুনিকগণের তত্ত্ববাক্য রসবাক্যের মর্যাদা পাইতেছে; অবশ্য তাহাতে তত্ত্ব রস হইয়া উঠিতেছে না, কিন্তু ছাপার অক্ষরকে যাঁহারা অভ্রান্ত মনে করেন তাঁহারা বিপাকে পড়িতেছেন। একালের বিচারবিভ্রাট সেকালের

বিচারবিভ্রাটেরই প্রকারভেদ, এমন কি নূতনত্বের দাবীও তাহার নাই।

॥ ৭ ॥

ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যতত্ত্বের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ কাব্যে অথবা দুর্বোধ্যতার অপর একটি কারণ। ওয়ার্ডস্বার্থ ক্ষুদ্র বিষয়কে কাব্যে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। পরবর্তীদের হাতে ইহার অপপ্রয়োগ ঘটিয়াছে। তাঁহারা ক্ষুদ্র বিষয়ের স্থলে বহুল ক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে গ্রহণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর এক নয়। এখন, অকিঞ্চিৎকর বিষয় হইতে রস আদায়ের চেষ্টায় ভাষার উপরে সহনাতীত চাপ পড়ে। সব জিনিসের মত ভাষারও চাপ সহ্য করিবার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে ভাষা বাঁকিয়া চুরিয়া অষ্টাবক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া দুর্বোধ্য হইয়া ওঠে। সব দেশের কাব্য হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা চলে।

এ সব ছাড়া, কাব্যের উপরে আধুনিক মনের চাহিদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আধুনিক মন কাব্য হইতে আর 'অহৈতুক আনন্দ' পাইয়া সন্তুষ্ট নয়। আধুনিক মন কাব্য হইতে জ্ঞান, শিক্ষা ও রাজনৈতিক নির্দেশও পাইতে চায়। যেহেতু কাব্যের বিষয় সমগ্র মানবজীবন—কাব্যের কাছে এ-সবের সন্ধান, আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু তাহা কাব্যের প্রকৃতি ও সত্যকে অস্বীকার করিয়া পাইতে ইচ্ছা করিলে অকারণ জুলুম করা হয়। খেজুর গাছ হইতে রস আশা করিতে পারি কিন্তু একেবারে সরাসরি পাটালি গুড় আশা করিলে কেমন হয়। অহৈতুক আনন্দর মধ্যেই সমস্ত আছে। তাহা মানুষের মনকে প্রসন্ন ও উদার করিয়া দিব্যদৃকলাভে সাহায্য করে। আর দিব্যদৃষ্টিলব্ধের পক্ষে জীবনের কোন শিক্ষা, কোন জ্ঞান, কোন নির্দেশই দুর্লভ নহে। কিন্তু তাহা না করিয়া কাব্য যদি একটি 'Palpable design'

হাতে করিয়া অবতীর্ণ হয়—তবে সে কৌশলী জালিক হইতে পারে, কিন্তু কিন্তু কাব্যপদ হইতে নামিয়া পড়ে।

কিছুকাল হইতে সব দেশের শিক্ষিতসমাজ ধর্মের উপরে অনেক পরিমাণে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ধর্মের তৃষ্ণা একটি সত্যকার আকাঙ্ক্ষা। ধর্মে তৃষ্ণা মিটিতেছে না দেখিয়া কবিগণ কাব্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন। গ্যেটে আর্ট ও রিলিজনকে সমার্থক রূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। তার পরে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে, সজীব ধর্মের প্রভাব আধুনিক শিক্ষিত মনের উপর আরও শিথিল হইয়াছে। আর যে পরিমাণে ধর্মের উপরে ভরসা কমিয়াছে সেই পরিমাণে কাব্যের উপর ভরসা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই—কাব্য কি ধর্মের বিকল্প হইতে সমর্থ? এ জটিল প্রশ্নের উত্তর দানের ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত বলা যায় যে, ধর্ম আবার সজীব রূপে আপন দায়িত্ব গ্রহণ না করা অবধি কাব্যের ঘাড়ে একটা অকারণ দায়িত্বের বোঝা চাপিয়া থাকিবে। জ্ঞান, শিক্ষা, রাজনৈতিক নির্দেশ ও ধর্মতত্ত্ব—এতগুলি দায়িত্ব মিটাইবার সাধ্য বেচারা কাব্যের নাই। সে যাহা পারে, যাহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ ও প্রকৃতিনির্দিষ্ট শক্তি, তাহার মূল্য এ-সমস্তর চেয়ে অনেক বেশি। অহৈতুক আনন্দ জীবনের নিগূঢ়তম প্রেরণা। বর্তমানে অবান্তর চাহিদা মিটাইতে গিয়া কাব্য স্বধর্মের ব্যভিচার করিতে বাধ্য হইতেছে। আর, যে পরিমাণে তাহা করিতেছে সেই পরিমাণে কাব্য অকাব্য হইয়া উঠিতেছে। এখন ইহার প্রতিকার কোন সমালোচক বা মহাকবি বা কবিগোষ্ঠীর হাতে নাই। ইতিহাসের পুনরায় বৃহৎ হস্তক্ষেপ ছাড়া ইহার প্রতিকার সম্ভব নয়, কেন না, ইতিহাসের বৃহৎ হস্তক্ষেপের ফলেই এই দশা ঘটিয়াছে। যে সাপে কামড়াইয়াছে একমাত্র সেই সাপেই বিষ তুলিতে সক্ষম।

॥ ৮ ॥

একথা কেহ যেন মনে না করেন যে, “রবীন্দ্রোত্তর” বা “আধুনিক” কবিগণের কাব্যে কোন গুণ দেখিতে পাই নাই, কেবলই দোষ দেখিয়াছি। আদৌ তাহা নয়। পূর্বতন কাব্য-সংস্কারকে ভাঙিয়া নূতন রীতি গড়িবার প্রচেষ্টা, ছন্দে ভাষায় ও যতিস্থাপনে নূতন পরীক্ষা, বিষয়ে বৈচিত্র্যসাধন, ভাষায় অতি-স্ফীতি দূর করিয়া দৃঢ়পিনদ্ধ সংহতি সাধনের প্রয়াস, জ্ঞানের নূতন দিগন্ত হইতে অভিনব উপকরণ আহরণ করিয়া রসবস্তুতে পরিণত করিবার আগ্রহ প্রভৃতির দ্বারা ইঁহারা নবীনতর কবি-গণের সৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই সম্মিলিত কীর্তির জন্য ইঁহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আর স্বকীয় কীর্তির জন্য অনেকেই বাংলা কাব্যেও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছেন। দেশ যাঁহাদের স্বীকার করিয়াছে, আমি তাঁহাদের অস্বীকার করিবার কে? তবে দোষের বিস্তারিত উল্লেখ করিলাম তার প্রথম কারণ, শক্তিমানের দোষ উল্লেখে তাঁহাদের কীর্তির অপহ্নব ঘটে না। দ্বিতীয় কারণ, এ সব দোষ সর্ব দেশের আধুনিক কাব্যের, কেবল বাংলা সাহিত্যের নয়। কাজেই এসব যদি সত্যই দোষ হয়, তবে দায়িত্ব তাঁহাদের একার নয়। তাঁহারা যুগের আবহাওয়ার দোষগুণ বহন করিতেছেন মাত্র।

নৈরাশ্যের সুরে এ মুখবন্ধ শেষ করিতে চাহি না। গত দশ বছরের মধ্যে বহু নবীন কবি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন; আবার প্রতিদিন নবীনতর কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের অধিকাংশই এখনো কলেজের ছাত্র। ইঁহাদের অনেকেরই কবিতা পড়িবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। সাধারণভাবে ইঁহারা—আর প্রবীণতর কবিদের মধ্যে অনেকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের আশাভরসা-স্থল। নবীন ও নবীনতরগণ বহুল পরিমাণে অকারণ-দুর্বোধ্যতার অপবাদ হইতে মুক্ত, সাময়িক ফ্যাশনের মোহে

অবিচলিত, বিষয়নির্বাচনে অভ্রান্ত, আর অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ ও প্রকাশভঙ্গীর, স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। প্রাতঃসূর্যপ্রভা যদি দিবামানের শুভসূচী হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগের কারণ নাই। ইঁহাদের পূর্বসূরিগণ কাব্যের তৎকালীন Tradition বা সংস্কারকে বহুল পরিমাণে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবারে আশা করা যায় যে সেই নির্মল অবন্ধুর ভূমিতে নবীন কবিগণ আর একটি কাব্যসৌধ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের সীমানা পরিবর্ধিত করিবেন।

৮ই চৈত্র
১৩৬৩। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সংযোজন - মুখবন্ধ

কাব্যবিতানের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে সংযোজন নামে একটি অংশ মুদ্রিত হ'ল। এই অংশের প্রথমদিকে কয়েকজন প্রবীণ কবির কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। অনবধানতাবশতঃ এঁদের কবিতা গতবারে ছাপা হয়নি। তার পরে মুদ্রিত হয়েছে অনেক কয়জন নবীন কবির কবিতা। তাঁরা বয়সে নবীন হ'লেও তাঁদের সকলেরই নাম বাঙালী পাঠকের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত। নূতন সংস্করণের জন্য নবীন কবিদের কাব্যগ্রন্থ ঘাঁটতে গিয়ে দেখি যে, যাঁদের কবিতা আমার পছন্দ তাঁদের সংখ্যা এত বেশি যে, তাঁদের কবিতার জন্যই একখানি নূতন সঙ্কলন আবশ্যক। কাব্যবিতানের নূতন সংস্করণ পরিবর্ধিত হওয়া সত্বেও একাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইচ্ছা রইলো যে, সুযোগ পেলে এই কাজটি কখনো করবো। আপাততঃ সংযোজন অংশেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হলাম, কেননা, একখানা সঙ্কলন গ্রন্থে যা গ্রথিত করা যায় তার শেষসীমা পর্যন্ত যাওয়া গিয়েছে। এই কারণেই ইচ্ছা থাকলেও অনেক কবির কবিতা দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

যে-সব নবীন কবির কবিতা গ্রহণ করেছি, দু'চার জন বাদে তাঁদের সকলেরই বয়স ত্রিশের কোঠায়, ত্রিশের কাছ ঘেঁষে, ত্রিশের কোঠার মধ্যাহ্ন বোধহয় কারো পার হয়নি। কাজেই, তাঁরা কবিপরিচয়ে শুধু নয়, বয়সেও নবীন।

তাঁদের কবিতা পড়তে পড়তে বিশেষ ভাবে এই কথাটাই মনে হচ্ছিল বাংলা কাব্যের একটা ফাঁড়া বোধহয় কেটে গেল। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে একটা মানসিক কুয়াশা জমে উঠেছিল, যার প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যে। ইউরোপের ইতিহাসে এই কুয়াশার কারণ থাকলেও আমাদের ছিল না, কিন্তু যেহেতু ইউরোপ এখন চিন্তার ক্ষেত্রে বড় শরিক, ছোট শরিক তার দেখাদেখি খড়ে আগুন দিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে কুয়াশা বলে চালিয়ে দিয়ে একপ্রকার অস্বাভাবিক আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করলো। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী সত্ত্বেও ঝড়ের ধোঁয়াকে কুয়াশা বলে চালিয়ে দিয়ে ঝাপসা আবহাওয়ায় স্ফীততর রূপে প্রতিপন্ন হওয়া যাদের মতলব ছিল, তারা বিরত হয়নি। আলো আঁধারিতে ভিড় জমে গিয়েছে, সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে, সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে কবিতার। কবিতার প্রাণ দুর্বল অল্প আঘাতেই প্রাণ ত্যাগ বা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তবে সেই অবস্থার এতদিনে বোধহয় অবসান হতে চলেছে, কোন কুয়াশাই চিরস্থায়ী নয়, এমনকি খড়ের ধোঁয়ার কুয়াশাও নয়। তাই বলছিলাম—বাংলা কাব্যের ফাঁড়া বোধহয় কেটে গেল।

নবীন কবিদের কাব্যগ্রন্থ পড়তে পড়তে বুঝলাম শ্রেষ্ঠ কাব্যের দুটি শ্রেষ্ঠ উপাদান আবার দেখা দিয়েছে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে—প্রেম ও প্রকৃতি। এতদিন ওরা নল-দময়ন্তীর মতো নির্বাসিত জীবন যাপন করছিল। প্রেম ও প্রকৃতির উপাদানে যে কাব্য গঠিত তার রস ও রূপকে রোমান্টিক বললে শব্দের অপব্যবহার হয় না; অপরে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারেন, তবে শব্দভেদে বস্তুভেদ ঘটবে এমন আশঙ্কা নেই।

ইংরাজি কাব্যের মতোই বাংলা কাব্যের মূল প্রকৃতি রোমান্টিক। ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে ইংরাজি কাব্য স্বধর্ম পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছে, যেমন নাকি হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে, কিন্তু তা টেঁকেনি, কাব্যপ্রকৃতি আবার স্বধর্মে ফিরে এসে গৌরবময় যুগের সৃষ্টি করেছে। বাংলা কাব্য চণ্ডীদাস থেকে জীবনানন্দ দাশ অবধি রোমান্টিক ধর্মীয়। মাঝখানে কয়েক বছর, অন্য নামের অভাবে যাকে যুদ্ধান্তবর্তী যুগ বলা হয়েছে, সেই কয়েক বছর বাংলা কাব্য মূল প্রকৃতির প্রেরণা অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছিল। আমার বিশ্বাস এখন সেই ভুল ভেঙে গিয়ে বাংলা কাব্যের মূল প্রকৃতি আবার স্বধর্মে ফিরে এসেছে। নদী-প্রবাহের মতোই কাব্যপ্রবাহ মূল খাতকে কখনো চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করে না, কিছুকালের জন্য নূতন খাতকে আশ্রয় করলেও শেষ পর্যন্ত আবার মূল খাতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সংযোজন অংশের যে-সব কবির বয়স ত্রিশ বা তার কাছাকাছি—তাঁদের কবিতা কাব্যপ্রকৃতির এই মূল সত্যটিকে প্রমাণ করছে। তবে কিছুকালের জন্য অন্য খাতে সঞ্চরণের ফলে নূতন শব্দসম্ভার, নূতন অলঙ্কার, নূতনভাব প্রেরণা সংগ্রহ ক'রে পুষ্টতর হয়ে ফিরে এসেছে, পুরাতন অথচ পুরানো নয়, পুরাতনের মধ্যে নূতন। এই ভাবেই সমস্ত দেশের কাব্যের পরিপুষ্টি ঘটে থাকে, বাংলা দেশে অন্যথা হবে এমন কারণ নেই। এই সব নবীন কবিরাই ভাবী বাংলা কাব্যের আশা-ভরসার স্থল। তাঁদের কবিতা সংযোজিত হওয়ায় কাব্যবিতানের সৌষ্ঠব ও গৌরব বর্ধিত হ'ল। তাঁদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি।

৫ই মাঘ
। ১৩৭২ ।

প্র.

বড়ু চণ্ডীদাস

১

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে ।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন ।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে ।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী ।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন ।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জাণী ।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

২

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরেঁা তোহ্মারে হে ।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ১ ॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল ।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

৩

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘুগুরু জনে
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো ॥
কত দুখ কহিব কাঁহিণী
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।

সব গোপীগনে মোর কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

৪

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাই সে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদিনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে ॥ ১ ॥
আল।
দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আণিল
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ধ্রু ॥
তবেঁ বুঝিলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের
সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি
নিকট মেলিল আসিআঁ ॥
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ
দুগুণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ
করমফল আহ্মারে ॥ ২ ॥

সব খন মোরে   নান্দের নন্দন
চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী   কে হরি নিলে
মো দুখমতীর হেলে ॥
একেঁ দহদহ   ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন   দিতেঁ না পাইলোঁ
এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩ ॥
কি মোর যৌবন   ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী বাশে।
আন পাণী মোকে   একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ   যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ   শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিদ্যাপতি

১

জব—গোধূলি সময় বেলি
ধনি—মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি-রেহা
দন্দ পসারি গেলি ॥
ধনি—অলপ বয়সি বালা
জনু—গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরসনে আস ন পূরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা ॥

গোরি কলেবর নূনা
জনু—আঁচরে উজোর সোনা।
কেসরি জিনিয়া মাঝহি খীন
দুলহ লোচন-কোনা॥
ইসত হাসনি সনে
মুঝে—হানল নয়ন-বানে।
চিরঁজীব রহু রূপনারায়ন
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

২

সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল
মেঘ-মাল সয়ঁ তড়িত-লতা জনি
হিয়দয়ে সেল দই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি
আধহি নয়ন-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
এক তনু গোরা কনক-কটোরা
অতনুক কাঁচলা উপাম।
হার হরল মন জনি বুঝি ঐসন
ফাঁস পসারল কাম॥
দসন মুকুতা-পাঁতি অধর মিলায়ল
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পূরল আসা॥

৩

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পলটি নেহারি।

ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বরনারি ॥
জোরি ভুজজুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বদন সুছন্দ।
দাম-চম্পক কাম পূজল
জইসে সারদ চন্দ ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভব সরদ-ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু ॥
পুনহি দরসন জীব জুড়াএব
টুটব বিরহক ওর।
চরণ জাবক হৃদয় পাবক
দহই সবঅঙ্গ মোর ॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জদুপতি
চিত থির নহি হোয়।
সে জে রমণি পরম গুনমনি
পুনু কিএ মিলব তোয় ॥

৪

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর জত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরসনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচর ভরিঅ যদি মহানিধি পাই।
তব হম পিয়া দূর-দেসে ন পঠাই ॥
সীতক ওঢ়নী পিয়া, গিরিসীক বা।
বরিখাক ছত্র পিয়া দরিয়াক না ॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি
সুজনক দুখ দিন দুই চারি ॥

৫

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা ॥
পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি ন কহলা ॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল জদি কি আর জিবনে ॥
পূরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি জে ছল করমে ॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারি ॥

৬

সখি হে হমর দুখক নহি ওর।
ই ভর বাদর মাহ ভাদর
সুন মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরসন্তিয়া
কন্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর সর হন্তিয়া ॥
কুলিস কত সত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুর ডাক ডাহুক
ফাটি জায়ত ছাতিয়া ॥

তিমির দিগ ভরি ঘোর জামিনি
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহ কইসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥

৭

আজু রজনী হম ভাগে গমাওলুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা
জীবন জৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু জব পিয়া সঙ্গ হোঅত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুঅ নব নেহা ॥

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধু বোল স্রবনহি সুনল
স্রুতিপথ পরস ন ভেল॥
কত মধু জামিনি রভস গমাওল
ন বুঝল কইসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ল ন গেল।
কত বিদগধ জন রস আমোদঈ
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রান জুড়াএত
লাখে ন মিলল এক॥

৯

মাধব, বহুত মিনতি কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনি ছাড়বি মোয়॥
গনইতে দোস গুনলেস ন পাওবি
জব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগনাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির ন ই ছার॥
কিএ মানুস পসু পখী ভএ জনমিএ
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুনু পুনু
মতি রহ তুঅ পরসঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরইত ইহ ভব-সিন্ধু।
তুআ পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দিনবন্ধু॥

১০

তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম
 সুত মিত রমনি সমাজ।
তোহে বিসারি মন তাহে সমরপল
 অব মঝু হব কোন কাজ॥
 মাধব, হম পরিনাম নিরাসা
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
 অতএ তোহরি বিসবাসা॥
আধ জনম হম নিঁদে গমাওল
 জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবন রমনি-রভস-রঙ্গ মাতল
 তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
 ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
 সাগর লহরি সমানা॥
ভনই বিদ্যাপতি সেস সমন ভয়
 তুঅ বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহাওসি অব
 তারন ভার তোহারা॥

কৃত্তিবাস

কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য-গুণে।
মুখটি-বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

শুভক্ষণে গর্ভে থাকি পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতামহ আমা কৈল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
বারেন্দ্র উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গাপার॥
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা পাইলাম আমি বিদ্যার প্রচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানা ছন্দে নানা ভাষ বিদ্যার প্রসর॥
আকাশবাণী হইল সাক্ষাৎ সরস্বতী।
তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারথি॥
বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উগ্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর॥
সপ্ত-ঘটি বেলা যখন দগড়ে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধায়া আইল দূত হাথে সুবর্ণ লাটি॥
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার।
সোনারুপার ঘর দেখি মনে চমৎকার॥

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাশে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ স্থনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রে মিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন॥

দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজা বিগুমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বরে।
রাজার নিকটে আমি চলিলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঞি দাণ্ডাইলাম চারি হাত আন্তর
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে আমার মুখে শ্লোক সরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজা দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে গোসাঞি করিলে সম্মান॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্রমিত্র সভে বলে পুন দ্বিজরাজে।
যত খুজ তত দিতে পারে মহারাজে॥
কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার॥

আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অস্থিতি।
পাট পাছড়া পাইনু আমি চন্দনে ভূসিতি ॥
ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই।
যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহী ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ারে।
অপূর্ব্বজ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপমায়ের আশীর্ব্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি-প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥
সাত-কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥[১]

চণ্ডীদাস

১

কনক-বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত
সুন্দর অরুণ আর ॥

---

১ ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণে বিভিন্ন পুঁথির পাঠান্তর মিলাইয়া যে পাঠ তৈয়ারী করিয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধৃত।

সই, কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতর কাটিয়া পাঁজর
মরমে রহল পশি॥ ধ্রু॥
গলার উপর মণিময় হার
গগন-মণ্ডল হেরু।
কুচযুগ-গিরি কনক-গাগরি
উলটি পড়ল মেরু॥
উরজে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরিয়ে সুন্দর তার।
চরণের ফুল হেরি যে তুকুল
জলদ-শোভিত-ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন জনে॥

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী ফুলয়ে গাথনী
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু হাত তুলি॥

এক দিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

৩

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ধ্রু॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী-কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

৪

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনবেথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি
কানাকানি শুনি এই কথা॥

সই লোকে বলে কালা পরিবাদ ।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ ॥ ধ্রু ॥
যমুনা-সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে ।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা ।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা ॥

৫

যত নিবারিয়ে পায় নিবার না যায় রে ।
আন পথ যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে ।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ ।
তভু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান ।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥
ধিক্ রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব ।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ ॥

৬

পিরিতি বলিয়া একটি কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল- লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঞি সে তাহারি বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥
সই একথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব দে॥ ধ্রু॥
ধরম করম লোক চরচাতে
একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে॥
চণ্ডীদাস কহে শুন ল সুন্দরি
পিরিতি রসের সার।
পিরিতি-রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥

৭

কানড়-কুসুম জিনি কালিয়া বরণ খানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে॥

সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন-কোণে না চাইহ তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥ ধ্রু ॥
আরতি পিরিতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া রভস কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশিদিশি অনুখণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী-স্বর না মানে আপন পর
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥

৮

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বন্ধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বন্ধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥ ধ্রু ॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যন্ত্রণা দিলুঁ ॥

বন্ধুর পিরিতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বন্ধুর পিরিতি
শুনিয়া জগত সুখী॥

৯

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমান॥

১০

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।



সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে দু কুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

বিজয় গুপ্ত

মুই হেন অভাগিনী, হেন ছার নহে জানি,
ছার কার্য্যে কেন আমি আসি।
ফিরিয়া ঘরেতে যাই, পদ্মারে বড় ডরাই
যাইতে পরাণে দুঃখ বাসি ॥
রূপেতে অতি সুন্দর মহাবীর লক্ষীন্দর
বত্রিশ লক্ষণ ধরে গায়।
দেখিয়া দুঃখী নাগিনী, কাতর হইল পরাণি
দুঃখে করয় হায় হায় ॥

হারাইয়া সর্ব্বধন, পাইয়াছে এই ধন
কি বলিয়া প্রবোধিবে মায়।
তার প্রাণের দোসর, একমাত্র লক্ষীন্দর,
কালসর্পে তারে খেয়ে যায়॥
মুই যদি জানি সাঁচে, নির্ব্বন্ধেতে এই আছে
তবে আমি রহিতাম ভাড়ি।
আসিলাম রাত্রিভাগে, দেখিয়া যে দুঃখ লাগে
হেন কন্যা হইবেক রাড়ী॥
সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর, যেন স্বর্গ বিদ্যাধর
অলক্ষণ নাহি কোন গায়।
রূপেতে যে মনোহর, কন্যা যোগ্য হয় বর
বিধাতা বিমুখ হ'ল তায়॥
পামরী তুই মনসা তোর মনে কিবা আশা
বুঝিতে নারিনু আমি সাঁচে।
যেমন এই মহাজন, খাইতে করেছ মন
আপন পেটের পুত্র আছে॥
আমি যে নাগিনী লোক নাহি জানি মনে শোক
খাইতে যে দুঃখ বাসি বড়।
এমন মহাবীর, সুন্দর সর্ব্বশরীর
কোন খানে লইব কামড়॥
চিন্তিয়া চিত্ত উতালি হেন মায়ার পুতলি
বিষেতে বিবর্ণ হবে কায়।
বিষ যে কাল বিকাল, পূরিলেক দুই গাল
লখাইরে দংশিতে কালী যায়॥
মুখেতে নাহিক রাও, স্থূল করিলেক গাও
নিকটে ছাড়িল নিজ ফণা।
বিজয় গুপ্ত বিরচিত, শুনিবারে সুললিত
বিস্মিত হইল সর্ব্বজনা॥

রায় রামানন্দ

পহিলহিঁ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনভব পেশল জনি॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥ ধ্রু॥
না খোজলুঁ দূতি না খোজনু আন।
দুঁহুক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন-রুদ্র নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

মুরারি গুপ্ত

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগ বাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥ ধ্রু॥

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম-ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়॥
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু-ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহু-রাতি॥

নরহরি সরকার

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখন জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু॥
গৌরগদাধর-লীলা আদ্রব করেক শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥

নরহরি

উমত ঝুমত চরত চরত
চরণ ধরত মোর।
মধুর মুরতি পুজল যুবতি
সোণ কুসুম জোর॥
সখি শ্যাম নাগর দেখ।
রজনি-জাগরে অরুণ লোচন
হৃদয়ে নখর-রেখ॥ ধ্রু॥
কটি-আভরণ নীল বসন
আনতহিঁ আন বেশ।
বকুল-মাল ভ্রমরি-জাল
সৌরভে ভুলল দেশ॥
অধর অরুণ অমিয়া-ঝরণ
রসবতী রস লেল।
নয়ন-কমলে মধু পিবইতে
ভ্রমর বরণ ভেল॥
কিঙ্কিনী-জাল অতি রসাল
রিরমি রিরমি বাজে।
নরহরি পহুঁ গিরত গিরত
রাই-অঙ্গন মাঝে॥

বাসুদেব ঘোষ

আজু রজনি হাম কৈছে বঞ্চব রে
মোহে বিমুখ নট-রাজ।



নব অনুরাগে আশ নাহি পূরল
বিফল ভেল সব কাজ ॥
সজনি কাহে বনায়লুঁ বেশ।
আধ পলকে কত যুগ বহি যাওত
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ ॥ ধ্রু ॥
গুরুজন-গৌরব দূরহি ডারলুঁ
গৌর-প্রেমরস লাগি।
দুল্লভ প্রেম মোহে বিহি চঞ্চল
মঝু ভালে দেয়ল আগি ॥
প্রেম-রতন-ফল জগ ভরি বিথারল
হাম তাহে ভেল নৈরাশ।
নব অনুরাগ ভরমে হাম ভুলল
বাসু ঘোষ না পূরল আশ ॥

২

দেখ দেখ গোরা নট-রায়।
বদন শরদ-শশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি
কুলবতী হেরি মুরছায় ॥
চাঁচর চিকুর মাথে চম্পক-কলিকা তাথে
যুবতীর মন মধুকর।
শ্রুতি-পদ্মযুগ মূলে কনক-কুণ্ডল দোলে
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর ॥
কম্বু কণ্ঠে মৃদু বাণী সুধার তরঙ্গ খানি
হরি-রসে জগত ডুবায়।
করিবর-কর জিনি বাহু-যুগ সুবলনি
অঙ্গদ বলয়া শোভে তায় ॥
বক্ষ হেম-ধরাধর নাভি-পদ্ম সরোবর
মধ্য হেরি কেশরী পালায়।

অরুণ বসন সাজে চরণে নূপুর বাজে
বাসু ঘোষে গোরা-গুণ গায় ॥

৩

চিত-চোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভোর ।
অকিঞ্চন জনে করই কোর, পতিত-অধম-বন্ধুয়া ॥
ভুবন-তারণ-কারণ নাম, জীব লাগিয়া তেজল ধাম ।
প্রকট হইলা নদীয়ানগরে যৈছে শরদ ইন্দুয়া ॥
অসীম মহিমা কে করু ওর, যুবতী-জীবন করই চোর ।
বিধি নিরমিল কি দিয়া গৌর, বড়ই রসের সিন্ধুয়া ॥
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সুখ, হরল সকল মনের দুখ ।
বাসু ঘোষ কহে কিবা সে রূপ, নিরখি চিত সানন্দুয়া ॥

৪

নিরমল গোরা তনু কষিল কাঞ্চন জনু
হেরইতে ভৈ গেলুঁ ভোর ।
ভাঙ-ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর ॥
সজনি যব হাম পেখলুঁ গোরা ।
আকুল দীগ বিদিগ নাহি পাইয়ে
মদনলালসে মন ভোরা ॥ ধ্রু ॥
অরুণিত-নয়নে তেরছ অবলোকনে
বরিখে কুসুম-শর সাধে ।
জিবইতে জীবনে থেহ নাহি পায়লুঁ
ডুবলুঁ গঙ্গ অগাধে ॥
মন্ত্র মহোষধি তুহুঁ জানসি যদি
মঝু লাগি করবি উপায় ।

বাসুদেব ঘোষ কহে শুন শুন এ সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায় ॥

রামানন্দ বসু

১

মলয়জ-মিলিত যমুনা-জল শীতল
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ কদম্ব-তরু কুসুমিত
কোকিলা ভ্রমরা করু গান ॥
তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ-তমাল-তনু
বামে রসবতী রাই।
একে নব জলধর কোরে বিজুরি থির
কাঞ্চনে রতন মিশাই ॥
দুহুঁ তনু এক মন নিবিড় আলিঙ্গন
দুহুঁ জন একই পরাণ।
বসু রামানন্দ ভণে তুলনা না হয় মনে
রূপের নিছনি পাঁচ-বাণ ॥

২

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দূর ॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন ॥

তোমার পীত-বাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী ॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয় স্বধাইলে গোকুলে ॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি ॥

বৃন্দাবন দাস

১

কনক পূর্ণচাঁদে, কামিনীমোহন কাঁদে,
মদনে মদন-গর্ব্ব চূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধভাষা, ঈষত উন্নত নাসা,
দাড়িম্ব কুসুম জিনি কর্ণ ॥
ঝরে নয়নারবিন্দে পুষ্প-কণা মকরন্দে
তারক-ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু, কভু বোলে হাহা প্রভু,
আপাদমস্তক পুলকিত ॥
প্রেমে না দেখয়ে বাট, ক্ষণে মারে মালসাট,
ক্ষণে কৃষ্ণ বলে ক্ষণে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায়, সবে দেখিবার যায়,
কর্ম্মবন্ধে পড়ি গেল বাঁধা ॥
পাই হেন প্রেমধন, নাচয়ে বৈষ্ণবগণ,
আনন্দ-সায়রে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলি, চাতক করিয়া কেলি
চাঁদ দেখি যৈছন চকোর ॥

প্রেমে মাতোয়ারা গোরা, জগত করিল ভোরা,
পাইল সব জীবন আশ।
জড় অন্ধ মূক মাত্র, সভে ভেল প্রেমপাত্র
বঞ্চিত এ বৃন্দাবন দাস ॥

২

অলসে অরুণ-আঁখি কহ গৌরাঙ্গ এ কি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন্ স্থানে।
বদন-সরসী-রুহ মলিন যে হইয়াছে
সারা নিশি করি জাগরণে ॥
তুয়া সনে কিসের পিরীতি।
এমন সোনার দেহ, পরশ করিল কেহ,
না জানি সে কেমন রসবতী ॥ ধ্রু ॥
নদীয়া-নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ ওহে,
অবহি পার ছাড়িবারে।
সুরধনী তীরে গিয়া, মার্জ্জন করহ হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥
গৌরাঙ্গ করুণাভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি,
কাহে প্রিয়ে কহ কটুভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিঞা সাগরে ভাসি,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

লোচন দাস

আর শুন্যাছ আলো সই
গোরা-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুল-বধূ
কান্দ্যা আকুল তথা ॥

হলদি বাঁটিতে গোরী
বসিল যতনে।
হলদি-বরণ গোরাচাঁদ
পড়্যা গেল মনে॥
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন
কিসের হলদি বাঁটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল
ভাস্যা গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গ-ভাব
সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাঁটন
গেল ছারে খারে॥
লোচন বোলে আলো সই
কি বলিব আর।
হয় নাই হ'বার নয়
গোরা অবতার॥

অনন্ত দাস

তোহারি সঙ্কেত- নিকুঞ্জে বসিয়া
কত করু পরলাপ।
তুহিন-পবনে বিরহ-বেদনে
সঘনে হৃদয় কাঁপ॥
পুরুব বাসক- শয়ন সোঙরি
রচই বিবিধ শেজ।
সহচরীগণে করিয়া রোদনে
দূরেহি সবহুঁ তেজ॥

কবহুঁ সুমুখী বিমুখ হইয়া
মানিনী সমান রহে।
যাহ যাহ কান না হেরি বয়ান
সতত এমতি কহে॥
কবহুঁ রোদন দশন বিথারি
খল খল করি হাসে।
দারুণ বিরহে ভৈ গেও বাউরি
কহই অনন্ত দাসে॥

বলরাম দাস

১

কলিযুগ-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদনে
কুমতি-করিণি দূর গেল।
পামর দুরগত নাম-মোতি শত-
দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ-নগর-গিরি-কন্দরে
উয়ল কেশরি-রাজ॥ ধ্রু॥
সংকীর্ত্তন-রণ হুঙ্কৃতি শুনইতে
দুরিত দীপিগণ ভাগি।
ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল
পুনবত গরব তেয়াগি॥
ত্যাগ যাগ যম তিরিথি বরত সম
শশ জম্বুকি জরি যাতি।
বলরাম দাস কহ অতয়ে সে জগমাহ
হরি-ধনি শবদ খেয়াতি॥

২

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করি তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

৩

সহজই কাঞ্চন- কান্তি কলেবর
হেরইতে জগজন-মনমোহনিয়া।
তাহে কত কোটি মদন মুরছাওল
অরুণকিরণহর অম্বর বনিয়া॥
রাই প্রেম ভরে গমন সুমন্থর
অন্তর গর গর পড়ই ধরণীয়া।
স্বেদ কম্প ঘন ঘন পুলকাবলী
ঘন হুহুঙ্কার করত গরজনিয়া॥
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরখনিয়া।

ও রসে ভোর ওর নাহি পাওই
পতিত কোরে ধরি লোর সিচনিয়া ॥
হরি হরি বলি রোই কত বিলপই
আনন্দে উনমত দিবস রজনিয়া।
হরি হরি রব শুনি জগত ভরিয়া গেল
বঞ্চিত বলরাম দাস পামরিয়া ॥

জ্ঞানদাস

১

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর-পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥
মল্লিকা-মালতী-মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীল গিরি-শিখর বাহিয়া ॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিলে ফাগু রঙ্গিয়া ॥
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া ॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়েছে
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যাম-রূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥

২

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে।
চিত হরি কালিয়া নাগর নিল ছলে ॥[১]
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা ॥
কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া ॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু কুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি থাক বুক ॥

৩

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে   সেখানে ভুলিলুঁ বাটে
তিমিরে গরাসিল মোরে ॥ ধ্রু ॥
রসে তনু ঢর ঢর   তাহে নব কৈশোর
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে   মউর-চন্দ্রিকা ঠামে
ললিত লাবণ্য রূপ-শেষ ॥

১ প্রথম লাইন দুটিতে পদকল্পতরুর পাঠ না লইয়া পদ-রত্নাকরের পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছে। পদকল্পতরুর পাঠ এই—

আলো মুঞি জানে না, জানিলে জাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে।

ললাটে চন্দন-পাঁতি নব-গোরোচনা কাঁতি
তার মাঝে পূর্ণিমক চাঁদ।
অলকা-বলিত মুখ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা রূপ
কামিনী জনের মন ফান্দ॥
লোকে তারে কাল কয় সহজে সে কাল নয়
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেত ঠেকা
ভুবন-মোহন রূপ-ভাঁতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল সে সকল দেখি গেল
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয়
সে কি সতী বোলাইতে পারে॥

৪

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরি-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপনে দেখিলুঁ হেনকালে॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।

দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
"আমা কিন বিকাইলুঁ" বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥

৫

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥
সোই কি আর বলিব।
যে পুনি করিয়াছি মনে সেই সে করিব ॥ ধ্রু ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরিতির সার ॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

৬

বিগলিত কুন্তল মণিময় কুণ্ডল
ঝুনুঝুনু অভরণ বাজ।
ঘামহিঁ অলকা তিলক বহি যাওত
ঘন দোলত মণিরাজ॥
দেখ দেখ দুহুঁ জন-কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর-সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি॥ ধ্রু॥
গীমহি ভুজযুগ উপর শশোধর
কনক-ধরাধর মাঝ।
অপরূপ পবনে সঘন জনু দোলত
গগন সহিত দ্বিজরাজ॥
চঞ্চল চরণ-কমল মণি-নূপুর
সশবদ মঙ্গল পূর।
মনমথ-কোটি মথন করু ঐছন
জ্ঞানদাস চিতে ফুর॥

৭

সখি হে উলটি নেহারহ নাহ।
চান্দ-অমিয়া বিনু চকোর না জীবয়ে
জানি করহ নিরবাহ॥ ধ্রু॥
কতয়ে কলাবতি পশুপতি-পদযুগ
সেবই যাকর আশে।

সো বহু-বল্লভ তোহারি পরশ বিনু
দগধল মদন-হুতাশে ॥
শ্যাম-সুধাকর নিকটহি রোয়ত
কুঞ্জ চিত-কুমুদ বিকাস।
অঞ্চল অন্তর মান-তিমির রহু
লোচন পড়ল উপাস ॥
সো সুখ-সম্পদ তুহুঁ বিনু সুন্দরি
হাসি হাসি আপন বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ অলপ ভাগি নহ
দূতিক পরশ না পাই ॥

৮

ধরব ধরবা ধর মোর পীতবাস পর
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বনমালা পরাইব
চূড়া বান্ধ আলাঞা কবরী ॥
গৌর অঙ্গুলি তোর সোনা-বান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ কদম্ব-হিলনে থাক
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে ॥
মুরলী অধরে লেহ এই রন্ধ্রে ফুক দেহ
অঙ্গুলি লোলায়্যা দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি ॥

৯

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।

অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ
রবির কিরণ দেখি ॥ ধ্রু ॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মাণিক হারালুঁ হেলে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
মরণ-অধিক শেল ॥

১০

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ-ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ-অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা ॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যামবন্ধু বিনু
আর কেহো মোর নয় ॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয় ॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোরে।

তোমরা কুলবতী দেখিলে কুমতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে ॥
গুরু দুরুজন বলু কুবচন
না যাব সে লোক-পাড়া।
জ্ঞানদাস কয় কানুর পিরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥

নরোত্তম দাস

১

অরুণ-কমল-দলে শেজ বিছায়ব
বৈসাব কিশোর কিশোরী।
অলকাবৃত মুখ- পঙ্কজ মনোহর
মরকত-শ্যাম হেম-গোরী ॥
প্রাণেশ্বরি কবে মোর হবে কৃপা দিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে চম্পক-কুসুম-বর
শুনব বচন আধ মিঠি ॥ ধ্রু ॥
মৃগ-মদ তিলক সুসিন্দুর বনায়ব
লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতী ফুল হার পহিরায়ব
ধাওব মধুকর-বৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে বীজন দেওব
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রম-জল সকল মিটব দুহুঁ-কলেবর
হেরব পরম-আনন্দে ॥
নরোত্তম দাস আশ পদ-পঙ্কজ
সেবন মাধুরি-পানে।
হোয়ব হেন দিন না দেখিয়ে কিছু চিন
দুহুঁ জন হেরব নয়ানে ॥

২

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ-অঙ্গ পরশিব দুহুঁ-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোহাঁকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পুরি
যোগাইব অধর-যুগলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণ-ধন
সেই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোক-নাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদে ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

১

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ তাঁর নিত্য-ধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাহা সে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প বহে অশ্রুধার ॥
মুক্তাহার বকপাতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন
ভাবাবেশে মথুরা নগরী ॥

কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥
এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজভাব করেন বিদিত।
বহির্বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
সেই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ

১

চম্পক-সোন-কু- সুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনমোহন ভাঙনী রে॥
জয় শচী-নন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলি-যুগ-কাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে॥ ধ্রু॥
বিপুল-পুলক-কুল- আকুল কলেবর
গর-গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহিঁ মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥

২

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনি জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বাণি
সপনে না পাতয়ে কাণ॥ ধ্রু॥

"রা" কহি "ধা" পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি লোটায় ধরণি পুন
কো কহ আরতি ওর ॥
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল
কানুর এতহুঁ সম্বাদ।
নীচয়ে জানহ তছু দুখ-খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ ॥

৩

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ
মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুণে ধরব লব-লেশ ॥ ধ্রু ॥
নাসিকা হো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম ॥
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ
পূছত গোবিন্দদাস ॥

৪

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ ধ্রু ॥

মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুল-কামিনি তাহে কুহু-যামিনি
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দুর গেল ॥
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণ- হুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

৫

কুঞ্চিত-কেশিনি নিরুপম-বেশিনি
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে।
অধর সুরঙ্গিণি অঙ্গ তরঙ্গিণি
সঙ্গিণি নব নব রঙ্গিণি রে ॥
সুন্দরি রাধে আওয়ে বনী।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুট-মণি ॥ ধ্রু ॥
কুঞ্জর-গামিনি মোতিম দামিনি
দামিনি-চমক-নেহারিণি রে।
অভরণ-ধারিণি নব অভিসারিণি
শ্যামর-হৃদয়-বিহারিণি রে ॥
নব অনুরাগিণি অখিল-সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিণি মোহিনি রে।

রাস-বিলাসিনি হাস-বিকাশিনি
গোবিন্দদাস চিত মোহিনি রে ॥

৬

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি
ঐছন জলদ করল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥
চলু গজ-গামিনি হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥
চৌদিশে অথির পবন করু দোল।
জগ ভরি শীকরনিকর হিলোল ॥
চলইতে গোরি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট ॥
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস ॥

কঞ্জ-চরণ-যুগ যাবক-রঞ্জন
খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জির বাজে।
নীল বসন মণি-কিঙ্কিণি-রণরণি
কুঞ্জর-গমন দমন খিন মাঝে ॥
সাজলি শ্যাম-বিনোদিনি রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ-তরঙ্গিণি রঙ্গিণি
মদন-মোহন-মন-মোহন-ছাঁদে ॥ ধ্রু
কনক-কটোর চোর কুচ-কোরক
জোরে উজোরল মোতিম-দাম।

ভুজযুগ থীর বিজুরি পরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম ॥
মধুরিম হাস সুধারস-নিরসন।
দশন-জোতি জিতি মোতিক-কাঁতি ॥
সুভগ কপোল লোল মণি-কুণ্ডল
দশ দিশ ভরল নয়ন-শর পাঁতি ॥
ঝাঁপল কবরি ভালে অলকাবলি
ভাঙু-ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
মুরতি শিঙ্গার-দেব-অধিদেবি ॥

৮

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত-মধুকর-ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরনি ॥
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি ॥

শিথিল-ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি।
ততহি বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পন্থ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দদাস গাওনি ॥

৯

দেখত বেকত গৌর-চন্দ
বেঢ়ল ভকত-নখত-বৃন্দ
অখিল-ভুবন উজরকারি
কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া।
অগতি-পতিত-কুমুদ-বন্ধু
হেরি উছল রসক সিন্ধু
হৃদয়-কুহর-তিমির-হারি
উদিত দিনহিঁ রাতিয়া ॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত
মত্ত-করিবর-ভাতিয়া।
নটন খটন ভৈ গেল ভোর
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণি খসত
শোহত পুলক-পাঁতিয়া ॥
অসিম-মহিমা কো কহুঁ ওর
নিজ পর ধরি করই কোর

প্রেম অমিয়া হরখি বরখি
তরখিত মহি মাতিয়া।
যো রসে উত্তম অধম ভাস
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস
কো জানে কি খেনে কোন গঢ়ল
কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ॥

১০

অরুণিত চরণে রণিত মণি-মঞ্জির
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন-মনোরম
অলিকুল-মিলিত ললিত বন-মাল ॥
ভালে বনি আওত মদন-মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম
রঙ্গিম-ভঙ্গিম নয়ন-নাচনিয়া ॥ ধ্রু ॥
মাঝহি খীণ পীন-উর-অম্বর
প্রাতর-অরুণ-কিরণ মণি-রাজ।
কুঞ্জর-করভ-করহি কর-বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥
অধর-সুধা-ঝর মুরলি-তরঙ্গিণি
বিগলিত-রঙ্গিণি-হৃদয়-দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-ফুল ॥
রোচন-তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেঢ়ল রমণি-মন-মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগর-বর তরুণ তমাল ॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

১

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে,
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥
সহর শিলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জন-রাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যায় করি কৃষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
যে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
হৈল রাজা মামুদ সরিপ ॥
মন্ত্রী হলো রায়জাদা, ব্যাপারিয়া ভাবে সদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হলো অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনের কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লিখে মাল,
বিনা উপকারে খায় ক্ষতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ,
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥

পেয়াদা সভার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে,
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
প্রজারা ব্যাকুলচিত্ত, বেচে ধান্য গরু নিত্য,
টাকায় দ্রব্য হয় দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈল গরিব খাঁ সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই,
পথে চণ্ডী দিলা দরসনে॥
ভাই নহে উপযুক্ত, রূপরায় নিল বিত্ত,
যদুকুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর,
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥
বাহিল গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি,
তেউট্যায় হৈল উপনীত।
দারুকেশ্বর উতরি, পাইল বাতনগিরি,
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম দামোদর,
উপনীত কুচুটে নগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান,
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া,
আজ্ঞা দিলা করিতে সঙ্গীত।
করে ল'য়ে পত্রমসী, আপনি কলমে বসি,
নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব॥
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই,
আরড়া নগরে উপনীত।

যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
আরড়া ব্রাহ্মণ-ভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি,
রাজা দিল দশ আড়া ধান ॥
সুধন্য বাকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়,
সুত পাশে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রূপেগুণে অবদাত,
গুরু করি করিল পূজিত ॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়কেরে দিলেন ভূষণ ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,
প্রকাশিলা নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
সমভাষা করিয়া কুশল ॥

২

বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল,
লেখাজোকা করে টাকাকড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর বেড়া,
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ,
আমি আইলাম সেই হেতু ॥
বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণেনী
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।

প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক পাড়া,
কালি দিবে মাংসের উধার ॥

আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকি দিব ধার,
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর ॥
শুন গো শুন খুড়ি, কিছু কার্য্য আছে দেরি,
ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরি।
আমার যে ধার খুড়ি, কালি দেহ বাকী কড়ি,
অন্য বণিকের যাই বাড়ী ॥

বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন।
সহাস্য বদনে বাণী বলে বেণে নিতম্বিনী,
দেখি বাপা অঙ্গুরি কেমন ॥
ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ,
ধায় বেণে খিড়কির পথে।
মনে বড় কুতুহলী, কান্ধেতে কড়ির থলী,
হড়পী তরাজু করি হাতে ॥

করে বীর বেণের জোহার।
বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখিতো,
এ তোর কেমন ব্যবহার ॥
খুড়া উঠিয়া প্রভাতকালে, কাননে এড়িয়া জালে,
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে,
এই হেতু নাহি দেখ তুমি ॥

খুল্লড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
হ'য়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিয়া মূল,
তবে সে বিপদে আমি তরি ॥

বীর দেয় অঙ্গুরি বেণিয়া প্রণাম করি
জোখে রতন চড়ায়ে পড়ান।
কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

জগন্নাথ দাস

যমুনাক তীরে ধীরে চলু মাধব
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে।
ইন্দিবর-নয়নি বরজ-বধু কামিনি
সদন তেজিয়া বনে ধাওই রে ॥
অসিত অম্বুধর অসিত সরসিরুহ
অতসি-কুসুম অহিমকর-সুতা-নির।
ইন্দ্র-নীলমণি উদার মরকত-
শ্রী-নিন্দিত বপু-আভা রে ॥
শিরে শিখণ্ডদল নব গুঞ্জাফল
নিরমল মুকুতা লম্বি নাসাতল।
নব কিশল অবতংস গোরোচন
অ তিলক মুখ শোভা রে
শ্রোণি তাম্বর বেত্র বাম কর
কম্বু-কণ্ঠে বনমালা মনোহর।
ধাতু-রাগ-বৈচিত্র কলেবর
চরণে চরণ পরি শোভা রে ॥
গো-ধুলি-ধূসর বিশাল বক্ষথল
রঙ্গ-ভূমি জিনি বিলাস নটবর।
গো-ছান্দন রজু বিনিহিত কন্ধর
রূপে ভুবন-মনলোভা রে ॥

ব্রহ্ম পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যে চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর।
সো হরি কৌতুক ব্রজ-বালক সাথে
গোপ-নগরি অভিলাসা রে॥
সো পহুঁ-পদতল-পরাগ-ধূসর
মানস মন করু আশা নিরন্তর।
অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ
জননি-জঠর-ভয়-নাশা রে॥

যাদবেন্দ্র

আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইয় পথ-পানে চাহি যাইয়
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইয় কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয় বাধা পানই হাতে থুইয়
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

রায় শেখর

১

কুন্দন কনক-কমল-রুচি-নিন্দিত
সুরধুনি-তীর-বিহারী।
কুঞ্চিত-কণ্ঠ-কলিত-কুসুমাকুল
কুল-কামিনি-মনহারী ॥
জয় জয় জগ-জীবন যশ-ধীর
জাহ্নবি যমুনা যেন জলধর বরিখন
ঐছে নয়নে বহে নীর ॥ ধ্রু ॥
পহুমিনি-পুরুব-পিরিতে পুলকায়িত
পরিজন-প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত পট নিপতিতাঞ্চল
পদ-পঙ্কজ পরচারী ॥
রসবতি-রমণি-রঞ্জন রুচিরানন
রতি-পতি রঞ্জিত তায়।
রসিক-রসায়ন রসময় ভাষণ
রচয়তি শেখর রায় ॥

২

নিরুপম কাঞ্চন-রুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোয়।
নিরমল বদন বচন-অমিয়া-সর
লাজে সুধাকর রোয় ॥
হেরলু রে সখি রসময় গৌর।
বেশ বিলাসে মদন ভোর ॥ ধ্রু ॥

লোল অলককুল তিলক সুরঞ্জিত

নাসা খগপতি-উন।

ভাঙ কামান বাণ দৃগঞ্চল

চন্দন-রেখ তাহে গুণ ॥

কম্বু-কণ্ঠে মণি-হার বিরাজিত

কাম-কলঙ্কিত শোভা।

চরণ অলঙ্কৃত মঞ্জির ঝঙ্কৃত

রায় শেখর মন-লোভা ॥

৩

আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
স্তোক-কৃষ্ণ অংশুমান্ দাম বসুদাম সাথে ॥
কটি কাছনি বঙ্কিম ধটি বেণুবর বাম কাঁধে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে ॥
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কাণে কুণ্ডল-খেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ-বালা ॥
স্ফুট চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনু-শোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা ॥

৪

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ

সঘনে দামিনি ঝলকই।

কুলিশ-পাতন- শবদ ঝন ঝন

পবন খরতর বলগই ॥

সজনি আজু দুরদিন ভেল।

হমারি কান্ত নি- তান্ত আগুসরি

সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥ ধ্রু ॥

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জিবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥

অজ্ঞাত

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে আসি বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি ॥
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেইখানে লঞা থোব ॥ ধ্রু ॥
কাল কেশের মাঝে তোমারে রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহারে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ ॥
নহে ত লেহের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।

কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥

ঘনশ্যাম দাস

নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই
ঘন ঘন মেটসি তাই।
সচকিত-লোচনে জলদ নেহারসি
মানসি হাত বাঢ়াই ॥
খেনে ঘর বাহির করসি নিরন্তর
খেনে খেনে দশ দিশ হেরি।
ময়ুর ময়ুরী সনে হাসি সম্ভাষসি
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥
কেলি-কদম্ব পুনহিঁ পুন হেরসি
ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥

কাশীরাম দেব

দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণনা

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতি সতী তিলোত্তমা
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
তোমার অঙ্গের আভা ম্লান করিলেক সভা
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।

তোমার শরীর দেখি নিমিষ না ধরে আঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে ॥
শশী নিন্দি মুখপদ্ম, করিয়াছ কোন ছদ্ম,
এ-বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গ ঘ্রাণ ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে ॥
রক্তকর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ জিনি বিষধর ॥
হের দেখ বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে,
লম্বিত হইল শাখাসহ।
কি দেবী নামিলা তুমি, কি হেতু ভ্রমহ ভুমি,
না ভাণ্ডিহ সত্য মোরে কহ ॥
তব অঙ্গ যোগ্য পতি মানুষ না দেখি সতি,
কিবা দেব দিক্‌পালগণ।
তব অঙ্গ দরশনে মোহ গেল নারীগণে,
মানবীতে রূপ অতুলন ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি, মধুর কোমল বাণী
সবিনয়ে বলয়ে পার্ব্বতী।
না দেবী গন্ধর্ব্বী আমি মানুষী নিবসি ভুমি,
ফলাহারী সৈরিন্ধ্রীর জাতি ॥
রাণী দয়া করি মোরে, রাখহ আপন ঘরে,
সেবা করি রহিব তোমার।
না ছোঁব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত,
এই মাত্র নিয়ম আমার ॥
প্রবাল মুকুতা পাঁতি, ভাল জানি নিত্য গাঁথি,
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ।
সিন্দুর কজ্জল আদি, রত্ন আভরণ নিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশবেশ ॥

গোবিন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁরে।
আমার নৈপুণ্য দেখি পাণ্ডবের প্রিয়সখি
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমারে॥
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ, ইথে না জানিহ আন,
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা।
রাজ্য নিল শত্রুগণে, পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
তেঁই আমি আইলাম হেথা॥
বিরাট পর্ব্বের কথা বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত সুজনের মনঃপূত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

রূপরাম চক্রবর্ত্তী

আত্মকাহিনী

অনেক দিবস বাড়ি কাইতি-শ্রীরামপুর।
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর॥
পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞী জানে।
বিশাশয় পড়ুয়া পড়ে যার সন্নিধানে॥
কর্ণের সমান দাতা অভিরাম রায়।
[সতত পুরাণ] পাঠ যাহার সভায়॥
নিরন্তর পাঠ পড়ি নিজ নিকেতনে।
জুমর অমর ভেদ হইল অল্প দিনে॥
ছোট ভাই রামেশ্বর প্রাণের সমান।
বড় ভাই রত্নেশ্বর বুদ্ধি হইল আন॥

বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ।
খাইতে শুইতে বাক্য বলে জলন্ত আগুন ॥
খাইতে শুইতে শয়নে স্বপনে মন্দ বলে।
[হাড় মা] স দগ্ধ হয় বিহান বিকালে ॥
বিশেষ বাজিল দ্বন্দ্ব বুধবার দিনে।
মনে দুঃখ উঠিল হইব উদাসীনে ॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি ॥
খুঙ্গি পুথি লয়ে আমি করিলাম গমন।
রাজারাম রায় দিল কড়ি বার পণ ॥
খুঙ্গি নিল পুথি নিল বস্ত্র নাই গায়।
তসরের ধুতি দিল মণিরাম রায় ॥
[হাতে লইয়া] খুঙ্গি পুথি জুমর অমর।
পাসণ্ডা পড়িতে গেলাম ভট্টাচার্য্যের ঘর ॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া হইল মায়া মো ॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।
আনন্দে পড়ান পাঠ হরষিত মনে ॥
সদাই পড়ান গুরু মনে বড় দয়া।
পড়িল কারক টীকা তিঙন্ত লীলয়া ॥
সাত মাসে সাত টীকা পড়াইল গোসাঞী।
বিদ্যা বিনু ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে কিছু নাঞী ॥
যেখানে সেখানে করি টীকার বিচার।
চক্রবর্ত্তী সকল মানিল পরিহার ॥
বিশাশয় পড়ুয়া মধ্যে আমি পড়ি আগে।
বিটঙ্ক ভারথী সুধা মকরন্দ ভাগে ॥
আড়ুয়ে পড়ান গুরু চৌপাড়ির ঘর।
শ্যামল উজ্জ্বল তনু পরম সুন্দর ॥
পরম পণ্ডিত গুরু বড় দয়াময়।
ভট্টাচার্য্য কণাদ মানিল পরাজয় ॥

বেদান্ত দেখিলে পথে ডানি বামে যান।
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য সভার প্রধান ॥
মাঘ রঘু নৈষথ পড়িল হরষিত।
পিঙ্গল পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত ॥

অতিশয় বিরলে বসিয়া পাঠ চাই।
ভট্টাচার্য্য গুরু [শুনি] বুক নাঞী বান্ধে
সীতার হরণ পাঠে গড়াগড়ি কান্দে ॥
শনিবারে ধর্ম্মের কারণে হৈল ডেড়ি।
দৈব-হেতু সেদিন মাঘের টীকা পড়ি ॥
গুরুর সম্মুখে বসিয়া পাঠ চাই।
পূর্ব্ব-পক্ষ শুনাইতে গুরুকে ডরাই ॥
সমাস-টীকার হেতু বাড়িল জঞ্জাল।
পূর্ব্বপক্ষ ধরিতে বিধাতা হৈল কাল ॥
এত শুনি গুরু হৈল পাবকের ধার।
পূর্ব্বপক্ষ পরম ধরিল তিন বার ॥
ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।
ক্রোধ করি নিষ্ঠুর বলেন উর্দ্ধ-রায় ॥
গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যায় দিন।
পড়াবার বেলা হই এহার অধীন ॥
বিশাশয় পড়ুয়া থাকে মোর মুখ চায়্যা।
দুই প্রহর বেলা যায় এহার লাগিয়া ॥
গোটা চারি অক্ষর অনন্ত বর্ণ কয়।
সদাই পাঠের বেলায় জঞ্জাল লাগায় ॥
পড়াতে নারিল তোরে যাহ নিজ ঘর।
নহে নবদ্বীপ যাহ কিবা শান্তিপুর ॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে আছে।
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে ॥

নহে জউগ্রাম চল কলানিধির ঠাঞি।
তাঁর সম ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে নাঞি॥
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।
বিটঙ্ক মুখের শোভা বসন্তের চিনা॥
এমন বচন শুনি মনে লাগে ডর।
সূর্য্যের সমান গুরু পরম সুন্দর॥
অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য লঙ্ঘে কোন জন।
নবদ্বীপে পড়িতে আনন্দ হৈল মন॥
গুরুর বচন শুনি নিল খুঙ্গি পুথি।
মনে হল্য নবদ্বীপ যাব দিবারাতি॥
হেন বেলা জননী পড়িয়া গেল মনে।
পুনর্ব্বার যাত্রা হইল শ্রীরামপুরের গনে॥
আড়ুয়্যা করিল পাছে ডানি দিগে বাসা।
পুরান জাঙ্গালে নাঞী জীবনের আশা॥
ঘুরে ঘুরে বুলি শুধু পলাশনের বিলে।
দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে॥
হেনকালে ভগবান ছলিবারে মন।
মায়া ছলে দুটি ব্যাঘ্র করিল সৃজন॥
দুটা বাঘ দু-দিগে বসিয়া লেজ নাড়ে।
গোটা দুই কাছাড় খাইল গোপাল-দীঘির পাড়ে॥
সন্ধি-মূল হারাল্য সুবন্ত-টীকা নাই।
আপুনি কাননে পুথি কুড়ান গোঁসাই॥
[(পাঠ) পড়্যা ঘরে আসি তৃষ্ণায় আকুল।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম হাতে দিলা ফুল॥
একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা।
সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা॥
গলায় চাঁপার মালা আসা বাড়ি হাথে।
ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে॥]
প্রথমে আপনি ধর্ম্ম কুড়াইল পুঁথি।
সম্মুখে দাণ্ডাল্য যেন ব্রাহ্মণমূরতি॥

সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চনকুণ্ডল ঝলমল ॥
ভয় নাই আপনি বলেন ভগবান।
এই লহ খুঙ্গি পুথি বাঁধ অভিধান ॥
[ডাক দিয়া বলিল কাননে কেন একা।
পূর্ব্ব তপস্যার ফলে তোরে দিলাঙ দেখা ॥]
আমি ধর্ম্ম-ঠাকুর বাঁকুড়ারায় নাম।
বার দিনের গীত বাপু গাও রূপরাম ॥
[আজ হৈতে রূপরাম আমার গাও গীত।
পরিণামে পাবে বড় মনের পিরীত ॥]
ঠাকুর বলেন তুলে রাখ খুঙ্গি পুথি।
কালি হইতে আমার গাইবে বারমতি ॥
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজ্যা বুলি ॥
আমি ধর্ম্ম অনাদ্য তোমারে দিনু দেখা।
পূর্ব্বকালে ভাগ্য আছে কপালের লেখা ॥
যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত।
সদাই গাইবে গুণ আমার চরিত ॥
যখন শুনিব তোমার মন্দিরার ধ্বনি।
আসরে অবশ্য বাপু উরিব আপুনি ॥
খুঙ্গি পুথি সব [তুমি] তুল্যা রাখ ঘরে।
আনন্দে গাইবে গীত আমার আসরে ॥
এত বলি মহাবিদ্যা দিল মোর কাণে।
দিবসে তরাস-তনু দেখি চারি পানে ॥
বলিবারে বচন বিলম্ব আর নাই।
গলেতে হাড়ের মালা দিলেন গোঁসাই ॥
দম্ফ করে বলে দ্বিজ বিক্রমে বড়াই।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমার গীতে কার্য্য নাই ॥
এত শুনি অন্তর্ধান দেব নিরঞ্জন।
তিন দিন উপবাসী ধর্ম্মের কারণ ॥

তিমিরে তপনমালা দেখিতে না পাই।
খুঙ্গি পুথি বান্ধিয়া ঐমনি দিল ধাই ॥
দিশাহারা হয়্যা ধায়্যা বুলি বেনা-বনে।
চঞ্চল বসন বেশ বড় ত্রাস মনে ॥
আকাশে অনেক বেলা তৃষ্ণায় বিকল।
শাঁখারিপুকুরে খাইল পরিপূর্ণ জল ॥
সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন।
প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ ॥
সোনা হীরা দুটি বনি দুয়ারে বসিয়া।
রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুথি লৈয়া ॥
হেনকালে আইল ঘর ভাই রত্নেশ্বর।
দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জ্বর ॥
তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা।
পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হইল হারা ॥
বাড়িতে বসিতে ভাই বলিল কুবচন।
জননী সহিত নাঞী হইল দরশন ॥
দাদা বড় নিদারুণ বলে উচ্চস্বরে।
কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে ॥
কাছাড়িল জুমর অমর অভিধান।
বাহিরে সুবন্তী-টীকা গড়াগড়ি যান ॥
পুনর্ব্বার মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
নবদ্বীপে পড়িবারে যাব দিবারাতি ॥
সোনা হীরা দুটি বনি আছিল দুয়ারে।
জননীকে বারতা বলিতে নাঞী পারে ॥
খুঙ্গি পুথি লৈয়া পুন করিল গমন।
তিন দিন উপবাসী দৈবের কারণ ॥
শানিঘাট গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
পথের পথিকে দেখ্যা জিজ্ঞাসা করিল ॥
ঠাকুরদাস পাল তায় বড় ভাগ্যবান।
না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান ॥

আড়াই সের ধানেতে কিনিল চিড়া ভাজা
দামুদরের জলেতে করিল স্নান পূজা ॥
জলপান করি তথা বড় অভিলাষে।
আচম্বিতে চিড়া ভাজা উড়াইল বাতাসে ॥
চিড়া ভাজা উড়্যা গেল শুধু খাই জল ॥
খুঙ্গি পুথি বয়্যা যাইতে অঙ্গে নাই বল ॥
দিগনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
তাঁতিঘরে কর্ম্ম বড় পথেতে শুনিল ॥
দৈবহেতু দুঃখ পাই সহজে কাতর।
দক্ষিণা মাগিতে গেলাম তাঁতিদের ঘর ॥
ধাওয়াধাই তাঁতিঘরে দিল দরশন।
চিড়া-দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন ॥
মনে কৈল পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই।
তাঁতি ঘরে ধর্ম্ম-ঠাকুর নাঞি দিল খই ॥
দক্ষিণা আনিয়া দিল দশগণ্ডা কড়ি।
দৈবের ঘটনে তার কানা দেড় বুড়ি ॥
খুঙ্গি পুথি লয়ে পুনু করিল গমন।
বাহাদুর এড়াল্যে দিলাম দরশন ॥
গোয়ালাভূমের রাজা গণেশরায় নাম।
বিপ্রকুলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান্ ॥
তারে গিয়া স্বপনে বলেন নিরঞ্জন।
প্রতিষ্ঠা করিতে তারে দিল নানা ধন ॥
এতেক দিলেন দ্রব্য শুন সর্ব্বজন।
আচম্বিতে দুটি পালি দিল দরশন ॥
পালি দেখি মহারাজা আনন্দিত মনে।
দ্বাদশ মঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে ॥
বারমতি গাইল আর দ্বাদশ মঙ্গল।
সন্তুষ্ট হইলেন ধর্ম্ম ভকতবৎসল ॥
সেই হইতে গীত গাই ধর্ম্মের আসরে।
অদ্যাবধি খুঙ্গি পুথি তোলা আছে ঘরে ॥

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে যত আছিল [ত] প্রজা ॥
বর্দ্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম।
[তার পরা]-জয় হইল দক্ষিণে মহিম ॥
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুর ঘর ॥
শাকে সীমে জড় হৈলে যত সন হয়।
চারি যুগ তিন বাণ বেদে যত রয় ॥
রসের উপরে রস তায় রস দেও।
এই শকে গীত হইল লেখা করি নেও ॥[১]

ঘনরাম

কামরূপযুদ্ধ

সাজিতে সেনাপতি, আদেশে নরপতি,
কোপে তাপে তা দেয় গোঁফে।
ঝিকি ঝিকি ঝিক্কেই, ফিকি ফিকি ফিক্কেই,
অসিটা উভু লোফে ॥
করয়ে তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন,
রিপুগণ কম্পিত ডরে।
অরাতি পুরী মাঝ, সঘনে সাজ সাজ,
নিশানে নকীব ফুকারে ॥
বাজে রণ দুন্দুভি, কম্পয়ে সুর-ভুবি,
দুড়্ দুড়্ দুড়ুম গোলা গাজে।

১ বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত ডক্টর সুকুমার সেন ও শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল কর্ত্তৃক সম্পাদিত "রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল"-এর বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া যে-পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা হইতে গৃহীত।

শুনি রণ ডিগ ডিগ, চমকে দশদিগ,
বিবিধ বসনে বীর সাজে ॥
কোমর কড়াকড়ি, কসিয়া তড়বড়ি,
তুরগী তুরগ তৈনাতে ।
বারণে বীরবর, যমদুত দোসর,
চমকিত চাপি চলে তাতে ॥
জোড়া কাড়া খঞ্জর, জাঠি ঝকড়া শর,
সাঙ্গি শেল পরিমল চাপ ।
ধাওয়াধাই ধরাতলে, অনুচর দল-বলে,
ধাইল ছাড়ি বীরদাপ ॥
দামামা দড়ম্‌সা, ধাঙসা ধাঙ ধাঙসা,
ভাঙ ভাঙ রণশিঙ্গা বাজে ।
বেষ্টিত গজ বাজী, অষ্ট অযুত তাজী,
ভূপতি চলিল গজরাজে ॥
তড়বড়ি গমনে, খুর ধূলি গগনে,
ভুবনে একাকার ময় ।
আচ্ছাদে রবিপথ, দিশায় না চলে পথ,
রপটে রিপু ভাবে ভয় ॥
ভূপতি গজরাজে, গভীর গভীর গাজে,
করিবর আগে আগে যায় ।
ঢালি চঞ্চল চলে, ঢালি পাক ফরিকালে,
ধর্ ধর্ বলি বেগে ধায় ॥
বড় গোলা বন্দুক, ভুড় ভুড় দশ মুখ,
চকিতে চমকিত শেষ ।
অবনী টল টল, কম্পিত কুলাচল,
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥
মার মার কাট কাট, বলিয়া যত ঠাট,
কালুবীরে ধরিতে ধায় ।
কালু রণ-সিংহজ, দরপ দিগ্‌গজ,
দৃক্‌পাত নাহি করে তায় ॥

আসিয়া চৌবেড়ে, জাঠি ঝগড়া এড়ে,
কোপে কালু করে বীরদর্প।
যথা গিরিশিখরে, হরিকরি-নিকরে,
শালুর সম্মুখে যেন সর্প॥
বারণ ঘন ঘটা, তরল তড়িত ছটা,
ধারাসম বরিষে গুলি তীর।
ঘনরাম ব্রাহ্মণ, সঙ্গীত বিরচন,
যার জীবন রঘুবীর॥
মার্ মার্ কাট্ কাট্, চৌদিগে চোট্পাট্,
চালিয়া চঞ্চল ঢাল।
বীর বান্ধি রিষ, দশ বিশ ত্রিশ,
হানিছে মারিছে হাঁফাল॥
শর শেল গুলি, আথালি পাথালি
সামালে সমরে কালু।
সেনাগণে হানে, যেমন কৃপাণে,
কাটে কলা-ওল-আলু॥

সেনা সব সাথে, দাদালি দু হাতে,
কালু করে কাটাকাটি।
বীর দম্ভে লম্ফে, নৃপতির অম্পে,
কম্পে কাঙুরের মাটী॥
শরের নিশান, শুনি শন্ শান্,
ঝন্ ঝান্ ঝঁকিছে খাঁড়া।
টাঙ্গি টন্ টান্, হানিছে ঠন্ ঠান্,
সেনাগণে দিয়া তাড়া॥
রাহুত মাহুত, হানিছে যুথে যূথ,
শ্রীযুক্ত কালু খণ্ডাতি।
ছাড়ে সিংহনাদ, শুনি পরমাদ,
হুতাসে হুটারে হাতী॥

বীর যমরাড়, বুঝিয়া বিরাড়,
বিপদে না বান্ধে বুক।
সবে দিল ভঙ্গ, যেমন ভুজঙ্গ,
বিনতাসুত সম্মুখ॥
পিছে ফেলি ঢাল, পালাতে ভূপাল,
হাঁফাল মারিয়া বীর।
একই রপটে, ভূপতির জটে,
ধেয়ে ধরে কালু বীর॥
বিরাটের দ্রোহে দক্ষিণ গোগৃহে,
নৃপতি সুশর্ম্মা বীরে।
জিনিয়া মহিম, হাতে গলে ভীম,
বেন্ধে দিল যুধিষ্ঠিরে॥
সেইরূপ বলে, রাজা কর্পূরধলে,
হাতে গলে নিল বেন্ধে।
ধনুকের হুলে কান্ধে লয়ে চলে,
সব শোকাকুল কেন্দে॥

রাধামোহন

বেলি অবসান হেরি শচি-নন্দন
ভাবহিঁ গদ গদ বোল।
কানুক গমন- সময় অব হোয়ল
শুনিলে বেণুক রোল॥
সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
প্রেমহি নিমগন রহতহিঁ অনুখন
কথিহু নাহি অবকাশ॥ ধ্রু॥

খেনে পুন কহই নিকট শুনিয়ে অব
ঘন হাম্বা-রব রাব।
হেরইতে শ্যাম- চন্দ্র অনুমানিয়ে
গোকুল-জন যত ধাব ॥
ঐছন ভাতি করত কত অনুভব
যো রসে কৃত-অবতার।
রাধামোহন-পহু সো বর শেখর
তৈছন সতত বিহার ॥

নাসির মামুদ

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলি-খুরলি গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণি-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আও রি আও রি
ফুকরি চলত কান রি ॥
বয়েস কিশোর মোহন ভাতি
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু-চন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন-ভান রি।
আগম নিগম বেদসার
লিলায় করত গোঠ-বিহার
নাসিরমামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি ॥

জগদানন্দ

অকরুণ পুন বাল অরুণ
উদিত মুদিত কুমুদ-বদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরি পদু-
মিনিক সদন সাজে।
কি জানি সজনি রজনি ভোর
ঘুঘু ঘন ঘোষে ঘোর
গত যামিনি জিত-দামিনি
কামিনি-কুল লাজে॥
কুহকত হত-শোক কোক
জাগব অব সবহুঁ লোক
শুক-শারিক-পিকু কাকলি
নিধুবন ভরু ওয়াজে।
গলিত ললিত বসন সাজ
মণিযুত বেণি-ফণি বিরাজ
উচ-কোরক-রুচ-চোরক
কুচ-জোরক মাঝে॥
তড়িত-জড়িত জলদ ভাতি
দুহে স্থখে শুতি রহল মাতি
জিনি ভাদর রস-বাদর
পরমাদর শেজে।
বরজ-কুলজ জলজ-নয়নি
ঘুমল বিমল-কমল-বয়নি
কৃত-নালিশ ভুজ বালিশ
আলিস নাহি তেজে॥

টুটল কিয়ে ঘুণ ধনুগুণ
কিয়ে রতি-রণে ভেল তূণ শুন
সমর মাঝ পড়ল লাজ
  রতি-পতি ভয় ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতি-বৃন্দ
গুরুগণ-গতি কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস-বিরস
  রসবতি রসরাজে ॥

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধক্ধ্বক্ ধক্ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা ॥
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥

চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্তকেশে ॥
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

২

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥

অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
যার নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার॥

৩

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি ॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া ॥
হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছনি লয়ে মরি ॥
কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে ॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিলা মায় ॥
খুঙ্গী পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে ॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোন্‌খানে বাসা ॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যাব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই ॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা ॥
মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে জোগাই।
ভাল বাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই ॥
কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয় ॥
রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ॥

কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্টরীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত ॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে ॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী ॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর ॥
ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা ॥

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা

'ধোপার পাট' হইতে

মনের দুঃখু মিটিয়াছে মিটিয়াছে আশা।
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনের ছিল আশা ॥
সুখেতে থাকগো বন্ধু সুন্দর নারী লইয়া।
সুখে কর গীর বাস জনম ভরিয়া ॥
না লইও না লইও বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম।
তোমার চরণে আমার শতেক পরনাম ॥
এইনা ঘাটেতে আছে পাতার বিছানা।
সুখেতে রজনী দোয়ে করেছি বঞ্চনা ॥
মনে না রাইখরে বন্ধু সেই দিনের কথা।
আর না রাখিও মনে সেই মালা গাথা ॥
রাইতের নিশি আনি শুনি তোমার বাঁশীর গানে।
অভাগিনীর কথা বঁধুরে না রাখিও মনে ॥
আমি মইরাছি নদী না বলিও কারে।
টুনী পঙ্খী নাহি জানে না কইও বন্ধুরে ॥

নদীর কূলের বিরিক্ষ লতা ডালে ঘুমাও পাখী।
আমার কথা না কহিও বন্ধের নিকটে ॥
আশমানের চান্দ তারা কহি যে তোমরারে।
আমি যে মইরাছি কথা না কইও বন্ধেরে ॥
না কইও না কইও বাপ আমি আইছি দেশে।
তোমার চরণে পরনাম জানাই উদ্দিশে ॥
কানে কানে কইরে বাতাস কানাকানি কথা।
তোমার কাছে কহিবাম যত মনের কথা ॥
রাত্রিকালের সাক্ষী তুমি দিবাকালের সাক্ষী।
কলঙ্কিণীর কথা জান দেশের পশু পক্ষী ॥
আমি যে আইছি দেশে আমার মাথা খাও।
আমার মরণ কথা বন্ধে না জানাও ॥
দেশের লোকে নাই সে জানে আমার মরণ কথা।
কি জানি শুনিলে বন্ধু পাইবে মনে বেথা ॥
কোন দেশ হইতে আইছরে ঢেউ যাইবা কোথাকারে
আমারে ভাসায়ে নেও দুস্তর সাগরে ॥
তারা হইল নিমি ঝিমি রাত্র নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা সেইনা নদীর জলে ॥

ময়মনসিংহ-গীতিকা

রঘুসুত-বিরচিত 'কঙ্ক ও লীলা' হইতে

দারুণ ফাল্গুন মাস গাছে নানান ফুল।
মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী-বকুল ॥
মধু-লোভে যাওরে উড়ে ভ্রমরা-ভ্রমরী।
বহু দিন নাহি শুনি বঁধুর বাঁশরী ॥
নানা দেশে যাওরে ভ্রমর আর পুষ্প-মধু খাও।
কৈও কৈও লীলার কথা যদি লাগাল পাও ॥

কৈও কৈও বঁধুর আগে শুন অলিকুল।
মালতীর গাছে তার ফুটিয়াছে ফুল ॥
দারুণ চৈত্রের হাওয়া দুর হইতে আসে।
আমার বঁধু এমন কালে রৈয়াছে বিদেশে ॥
গাছে গাছে সোনার পাতা ফুটে সোনার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরা উঠে ভ্রমরার রোল ॥
ডালে বসে কোকিল ডাকে পুষ্পেতে ভ্রমর।
এমন না কালে বঁধু গেল দেশান্তর ॥
না কইয়া না বইলারে বঁধু হইলা বৈদেশী।
মালঞ্চে ফুটিয়া ফুল ঝইরা হৈল বাসী ॥
বিনা সুতে হার গাঁতি মালতী-বকুলে।
প্রাণের বঁধু নাহি ঘরে দিব কার গলে ॥
কইও কইও কোকিলা রে কইও বঁধুর আগে।
গাঁথা মালা বাসি হইলে প্রাণে বড় লাগে ॥
যদি নাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও।
অভাগিনী লীলার দুঃখ বঁধুরে জানাও ॥

নূতন বৎসর আইল ধরি নব সাজ।
কুঞ্জে ফুটে রক্তজবা আর গন্ধরাজ ॥
গাছে ধরে নবপত্র নবীন মুকুল।
চারিদিকে শুনি মধুমক্ষিকার রোল ॥
এহিত বৈশাখ মাস অতি দুঃসময়।
দারুণ রৌদ্রের তাপে তনু দগ্ধ হয় ॥
কোকিল কোকিলা মাগে বসন্ত বিদায়।
আমার বঁধু এমন কালে রইয়াছে কোথায় ॥
নূতন বৎসর আইল মনে নব আশা।
অভাগী লীলার কাছে কেবলি নৈরাশা ॥

জ্যৈষ্ঠমাস জ্যেষ্ঠ রে সকল মাসের বড়।
ফলে-ফুলে তরু-লতা দেখিতে সুন্দর ॥

আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান ফল।
মন সাধে ডালে বসি বিহঙ্গসকল॥
নানা গীতি গায়রে তারা নানান ফল খায়।
অচেনা অজানা দেশে উড়িয়া বেড়ায়॥
নিত্য আসে নব পাখী নূতন ভ্রমর।
কান্দিয়া সুধাইলে কেহ না দেয় উত্তর॥
দারুণ গ্রীষ্মের তাপ জ্বলন্ত অনল।
ভূতলে শুইল কন্যা পাতিয়া অঞ্চল॥

আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।
অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা-সম্ভাষণে॥
নূতন বরষা আসে লইয়া নব আশা।
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা॥
হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরু-লতা উঠিল বাঁচিয়া॥
শুক্‌না নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী॥
পাল উড়াইয়া তারা কত দেশে যায়।
আমার বঁধুর তারা লাগাল নি পায়॥
এতকাল ছিল রে লীলা বড় আশার আশে।
সাধুর তরণী বাহি বঁধু আইব দেশে॥
কত দিন বাঁচেরে প্রাণ আশায় ধরিয়া।
দুই মাস গেল লীলার কান্দিয়া কান্দিয়া॥

কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামণ হার॥

মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা॥
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা॥
জলেতে কমল ফুটে আর নদী-কূল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল॥
দিন-রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি॥
খাউরি বিউনা করে যত ডুমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী॥

রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর॥
কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস-রজনী॥
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।
'বউ কথা কও' বলি কান্দি ফিরে পথে॥
কাহারে সুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি।
আমিও তোমার মত চির বিরহিণী॥
শুনরে বিরহী পাখী আরে পাখী পাইতাম তোমায় কাছে
কহিতাম মনের দুঃখ মনে যত আছে॥
কি কব দুঃখের কথা কহিতে না জুড়ায়।
দেশে না আসিল বঁধু বর্ষ বহি যায়॥
দিন যায় ক্ষণ রে যায় না মিটিল আশ।
এইরূপে কান্দিয়া গেল লীলার ছয় মাস॥

রামপ্রসাদ সেন

১

মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে আসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে?
শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে॥

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে প'ড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যাজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা॥

৩

মন রে, কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা
কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন করে,
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥

৪

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথায় ক'রে ছলো।
ওমা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল॥
মা, খেলবি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে-খেলা খেলালে মা গো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥

অজ্ঞাত

গড়েছে কোন্ স্থতোরে এমন তরী, গাঙ্ ছেড়ে ডাঙ্গাতে চলে।
ধন্য তার কারিগিরি বুঝতে নারি এ কৌশল সে কোথায় পেলে॥

দেখি না কেবা মাঝি কোথায় বসে হাওয়ায় আসে হাওয়ায় চলে
তরীটি পরিপাটী মাস্তুলটি মাঝখানে তার বাদাম খোলে ॥
লাগে না হাওয়ার বল এমনি সে কল সকল দিকে সমান চলে।
তরীতে আছে আটা মণি কোঠা জ্বল্‌ছে বাতি রংমহালে।
সেখানে মনের মানুষ বিরাজ করে মন পবনে তরী চলে ॥
সখিন কয়, হলে ঝড়ি তুফান ভারি উঠবে রে ঢেউ মন সলিলে।
যেদিন ভাঙ্গবে রে কল হবে অচল চলবে না আর জলে স্থলে ॥

অজ্ঞাত

জীর্ণ তরীর ভাবনা গেল না,
নৌকা পানি ত আর মানে না।
একে আমার জীর্ণ তরী,
নদীর তরঙ্গ ভারী
অকূলে পড়েছে তরী,
তরী কেনারা আর পা'ল না।
(জীর্ণ তরীর ভাবনা গেল না।)
পচন কাষ্ঠের নৌকাখানি
মন ! মন কাষ্ঠের বট্যাখানি
জয় আল্লা বলে মার থাবা।
ডুবে যেন যায় না ॥
(জীর্ণ তরীর ভাবনা গেল না।)

অজ্ঞাত

মেয়েলি গান

আলুর পাতা থালু থালু
ভ্যান্দার পাতা দৈ।
সকল জামাই খায়্যা গ্যালো
মা'জল্যা জামাই কৈ ?
আসত্যাছে আসত্যাছে শোলাবন দিয়া,
শোলার শাক ভাজ্যা দিব
ঘেরতো মধু দিয়া।
বা'র বাড়ী গুয়ার গাছ করড় মরড় করে,
তারি তলে জামাই বসে অধিবাস করে ॥

মধু কান

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই
মরিতে হবে তবে আর কেন যাতনা পাই ॥
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ,
তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ,
ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই।
আজ আমাদের শুভযাত্রা,
দেখলাম তোমার রথযাত্রা,
আমরা করি গঙ্গাযাত্রা,
বঁধু ফিরে দেখ তাই।
কেন রব কৃতাঞ্জলি, করে যাওহে অন্তর্জলী,
সুদন বলে কেন জলি এখনি জ্বালা ঘুচাই ॥

গোবিন্দ অধিকারী

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের।
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,—
নৈলে শুধুই মদন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,—
নৈলে পারিবে কেন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
শারী বলে, আমার রাধার নামটী তাতে লেখা,—
ঐ যে যায় গো দেখা ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে,—
চূড়া তাতেই হেলে ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের যশোদা-জীবন,—
শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন;—
নৈলে শূন্য জীবন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎচিন্তামণি।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী,—
সে তোমার কৃষ্ণ জানে ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে, সত্য বটে বলে রাধার নাম,—
নৈলে মিছে সে গান॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,—
নৈলে কে কার গুরু॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেমের লহরী,—
প্রেমের ঢেউ কিশোরী॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের কদম তলায় থানা।
শারী বলে, আমার রাধা করে আনাগোনা,—
নৈলে যেত জানা॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো,
নৈলে আঁধার কালো॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে, সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী,—
নৈলে হত কাশীবাসী॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ।
শারী বলে, আমার রাধা স্থগিত পবন,—
সে যে স্থির পবন॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে, আমার রাধা জীবন করে দান,—
থাকে কি আপনি প্রাণ॥

শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধা-কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল,—
ব'লে বৃন্দাবনে চল॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়

পুরবাসী বলে উমার মা, তোর হারা তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়, কই উমা বলি কই ॥
কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা, একবার আয় মা করি কোলে।
অমনি দু'বাহু পসারী মায়ের গলা ধরি, অভিমানে কাঁদি, রাণীরে বলে ॥
কই, মেয়ে বলে, আন্‌তে গিয়েছিলে।
তোমার পাষাণ প্রাণ আমার পিতাও পাষাণ, জেনে,
এলাম আপনা হ'তে, গেলে না ক নিতে,
রব না, যাব, দুদিন গেলে ॥

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী (হরু ঠাকুর)

১

কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না
মনেতে করিতে সে বিধু-বয়ান সখি
এ যে পাপ-প্রাণ ধৈরয না মানে।
প্রবোধি কেমনে তা বল না ॥
সই হেরি ধারা-পথ থাকয়ে যেমত
তৃষিত চাতক-জনা
আমি সেই মত হয়ে আছি পথ চেয়ে
মানসে করি সেরূপ ভাবনা ॥
হায় কি হবে সজনি, যায় যে রজনী
কেন চক্রপাণি এখনো।
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে,
রহিলো না জানি কি কারণো ॥

বিগলিত পত্রে চমকিত চিত্ত
হোতেছে,—স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এলো মুরারি পাই যাতনা॥
স রবি-কিরণের প্রায় হিমকর
এ তনু আমার দহিছে।
শিখি-পিক-রব অঙ্গে মোর সব
বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥
করিয়ে সঙ্কেত হরি কেন এত
করিলেকো প্রবঞ্চনা!
আমি বরঞ্চ গরল ভখি সেও ভাল
কি ফল বিফলে কাল যাপনা॥

২

রহিল না প্রেম গোপনে।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায়।
কুলকলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে, পীরিতে মজিয়ে,
অবশেষে দেখো প্রাণ যায়॥

আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে,
ঘটিল আমার সেই ভয়।
গৃহের বাহির, না পারি হইতে,
নগরের লোকগঞ্জনায়॥

হায়! কত জনে কত, বোলেছে নাথ,
মোরে থাকি মরমে।
বদন তুলিয়ে কথা নাহি কই সরমে।
হায়! কি পুরুষ নারী, করে ঠারাঠারি,
যখন তারা দেখে আমায়।

ভাবি কোথা যাব, লাজে মরে যাই,
বিদরে ধরণী যাই তায় ॥

হায়! হৃদয়মাঝারে লুকাবে,
সদা রাখি প্রেমরতনে।
কি জানি কেমনে সখা,
তথাপি লোকে জানে।
হায়! পীরিতের কিবা সৌরভ আছে,
সে সৌরভ মম অঙ্গে বয়।
কলঙ্কপবনে লইয়ে সে বাস,
ব্যাপিল ভুবনময় ॥

৩

এত দুঃখ অপমান, সাধের পীরিতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণ, নূতন আগুন,
উঠে, না হয় নির্বাণ ॥

অতি সমাদরে, জুড়াবার তরে,
কোরেছিলাম পীরিতি।
আমার সে সকল গেল, শেষে এই হোল,

রাম বসু

১

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায় গো সে
তারে বোলি বোলি বলা হোল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে।
নিলজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক সে বিধাতারে
নারীজনম যেন করে না॥

২

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ,
বদন ঢেকে যেয়ো না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বোলে ধোরে রাখ্‌বো না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেলো।
সদা রাগে কর ভর, আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুখ দিও না॥
দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধুবদন।
পীরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি।
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি, অনেরকর দেখি।
আমার কপালে না সুখ, বিধাতা হোলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না॥

৩

এই খেদ তারে দেখে মোর্‌তে পেলেম্ না।
আমায় চাক্ না চাক্, সখা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে একবার ফিরে গেল না॥
জীবন থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইলো প্রবাসে।

অমি সেই আশাবৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল।
স্থজিলাম্ সই, হোলো স্থখফল।
তরু সমূলে শুকাল, শেষে এই হোল সই,
কাল কোকিলের রবে প্রাণ বাঁচে না

রামনিধি গুপ্ত

১

আমারে কিছু বলো না সই মোর মন মোর বশ হলো।
লোকলাজ কুলভয় কোথায়ে রহিল ॥
পিরীতি স্থখের নিধি, অনুকুল দিলে বিধি,
এ যতনে প্রাণ সেহ বরং ভাল ॥

২

কেন লো প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়।
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি হৃদি কমলে জ্বলায় ॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিত মন, এখন তা নয়।
আজ ফণিময় হেরি, কাতর পরাণ,
নিকট না হতে পারি, দংশে পাছে ভয় ॥

৩

দেখিবে আপন মত আপন জনে। (প্রাণ)
না বুঝিলে তব মত, মতাধীন হবে কেনে ॥
দৈবের ঘটনা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
কমলে কণ্টক আছে, মধুকর তা কি মানে ॥

৪

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, তা কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না॥
ভেবে ছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না।

দাশরথি রায়

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্ত-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা-সতি॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দা গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি।
তিষ্ঠ সদা হৃদি গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশা-বংশীবট-মূলে।
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি॥
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি॥

লালন ফকির

১

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে।

আপন ঘরে বোঝাই সোনা,
পরে করে লেনা দেনা,
আমি হলেন জন্ম-কাণা না পাই দেখিতে।
রাজী হ'লে দরওয়ানি,
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি,
তারে বা কৈ চিনি শুনি বেড়াই কুপথে।
এই মানুষে আছে রে মন,
যারে বলে মানুষ-রতন।
লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম না চিন্‌তে॥

২

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা।
দেহের মাঝে বাড়ী আছে
সেই বাড়ীতে চোর লেগেছে,
ছয় জনাতে সিঁদ কাটিছে
চুরি করে একজনা॥
দেহের মাঝে বাগান আছে,
নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে,
কেবল লালনের প্রাণ মাতল না॥

গগন হরকরা

আমি কোথায় পাব তারে
আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

হারারে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥

লাগি সেই হৃদয়শশী
সদা প্রাণ রয় উদাসী,
পেলে মন হোত খুশি,
দেখতাম নয়ন ভরে ॥

আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন করে।
মরি হায়, হায় রে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
ওরে দেখ্‌না তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি
যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি।
সামান্যে কি দেখতে পারে তারে ॥

তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
মরি হায়, হায় রে।
ও সে না জানি কি কুহক জানে অলক্ষ্যে মন চুরি করে
কুল মান সব গেল রে
তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে।
তাই তো মোরে দেয় না দেখা সে রে।
ও তার বসত কোথায়
না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে।
মরি হায়, হায় রে।

ও সে-মানুষের উদ্দেশ জানিস যদি
(কৃপা করে)
(আমার সুহৃৎ হয়ে)
(ব্যথার ব্যথিত হয়ে)
আমায় বলে দে রে ॥

মদন বাউল



নিঠুর গরজী

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহানে ?
দেখ্ না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, (তার) তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড
তাই ভরসা দণ্ড
এর আছে কোন্ উপায়। (রে গরজী)
কয় যে মদন
শোন্ নিবেদন,
দিসনে বেদন
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজ ধারা
আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে ॥ (রে গরজী)

জগা কৈবর্ত্ত



ডাক যে শুনা যায়।
অচিন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শুনা যায়।
(কূলে ভিড়া ক্ষণেক জিরা)
অকূল পাড়ি থামতে নারি
সদাই ধারা ধায়॥

ধারার টানে তরী চলে
ডাকের চোটে মন যে টলে
(ও গুরু ধরো তুমি হাল)
টানাটানি ঘুচাও জগার
হৈল বিষম দায়॥

ঈশ্বর গুপ্ত

গল্‌দা-চিংড়ি

জলের ভিতরে মাছ কত রসভরা।
দাড়ি গোঁফ জটাধারী জামাযোড়া পরা ॥
শিরে অসি কাঁটাহীন গন্ধ নাই গায়।
আগাগোড়া মধুমাখা মধু তার পায় ॥
বিশেষতঃ শীতকালে অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি মীন-শিরোমণি ॥
গলদা চিঙড়ি মাছ নাম যার 'মোচা'।
পড়েছে চরণতলে এলাইয়া কোঁচা ॥
কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া
ভাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া ॥
ভিতরে থাকিলে ডিম কি কহিব আর।
ত্রিভুবনে নাহি হেন সুধার আহার ॥
স্বভাবে রোচক হয়ে বলবৃদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা পাকে গুরু মেদ পিত্ত হরে ॥
দীনের তারণকারী চিঙড়ির ঘুষো।
সুমধুর বাতহর পয়সায় দুশো ॥
মূলক বেগুন শাক যাতে তাতে লহ।
সমভাবে সদালাপ সকলের সহ ॥
অধম পুঁয়ের ডাঁটা তারে নিয়া তাবে।
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পারে ॥

ফুল-কপি

মনোহর ফুলকপি পাতা যুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায় ॥
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা ॥

রন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হ'লে কই।
যত পাই তত খাই আরো বলি কই ॥
ঘৃণার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি নিজে সেই কপি ॥
কপির সকলি গুণ দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে যেরূপেতে খাই

মধুসূদন দত্ত

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে সে রসের লেশমাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি!
ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে,
মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে।
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি

স্বর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে!
হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,—
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুন্ন খেদে?
তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে!
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে
চন্দ্রলোকে, সূর্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিবে তব পদে, শূর! চামুণ্ডা আপনি,
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস!—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে!
মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।
প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর (আহা, ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী!)—কহ শীঘ্র করি,—

কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব ? অনিমিষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে !
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব ! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
সুবর্ণ-নির্মিত গৃহে আমার বসতি—
মুক্তাময় মাঝ তার ; সোপান খচিত
মরকতে ; স্তম্ভে হীরা ; পদ্মরাগ মণি ;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে !
সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি ; গায় পাখী সুমধুর স্বরে ;
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল ! শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে !
খেলে উৎস ; চলে জল কলকল কলে !

কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা ! এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে !
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে !
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে ;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর ! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব !
রতন-কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন ; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ ; ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী !

মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি,
গলদেশে। প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু? বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে; ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী! —দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায়! সূর্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্যের পানে।—
কি আর কহিব তার? যতক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ; থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী!
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি!
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা!
কিন্তু বৃথা কহি কথা! পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে!
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্বকূলে; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে;
তুষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে!
লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে;

সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি ;
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে !

যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী ; লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা।
কত যে বয়েস তার, কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি !
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি !
আইস ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে ! কি আর কহিব ?
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি ;—
এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে।

শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে,
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব-খর্ব-কারি,
তাঁহার ; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা হেতু। কি আশ্চর্য ! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি ! তা না হ'লে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ?
দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে,

প্রেম-ভিখারিনী আমি তোমার চরণে !
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণলঙ্কাধামে ।
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃকুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে । কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা ; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী !
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে ।
ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা ! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে ? আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে ॥

॥ ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে সূর্পণখা-পত্রিকা নাম পঞ্চম সর্গ ॥

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী-দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়া-দেবী মন্থরা দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি ;—কেন আজি পুরবাসী যত
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে

মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘুকুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে
কহ, শুনি, হে রাজন্, এ বয়েসে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে
রসময়ী-নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?

হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !

নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—'অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে ।'

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চূণ-কালি গালে
খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ! লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে ।

না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব । নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধাহীন অধর ! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে !

কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্ম সাক্ষী করি
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হ'লে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ;—

প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে !
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ স্বললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !

ধর্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কিহে মনে এবে পূর্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?

তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিলে কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?

কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিনী-বেশে দাসী ! দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'

গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্বজনে !
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস-রজনী ।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে । গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে—
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে ।
রচি গাথা শিখাইব পল্লী-বাল-দলে ।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি ।'

থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি !

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি !)
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি !
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—

মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ পুরে।

চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী;
বিচার করুন ধর্ম ধর্ম-রীতি মতে!

॥ ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে কেকয়ী-পত্রিকা নাম চতুর্থ সর্গ ॥

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয়-শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা-সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্ত-গামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুমে ফোটে যার ইচ্ছা-বলে;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!

শ্রীমন্তের টোপর

—"শ্রীপতি————
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ॥"

—চণ্ডী

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি ! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি ! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি ।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ-ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী ।
বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি ॥

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্মনাশা-জলে !—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা ! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,

হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে !
কত যে ঐশ্বর্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে !
কামার্ত দানব যদি অপ্সরীয়ে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে ;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে

আত্মবিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে !
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ু-হীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে   সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে   বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে   নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার ।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি   পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি ?
জলন্ত-পাবক-শিখা-   লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়,   ধাইলি, অবোধ, হায়
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরান কাঁদে !

বাকী কি রাখিলি তুই   বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর   মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি,   দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

৬

যশোলাভ-লোভে আয়ু   কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?

সুগন্ধকুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য-বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

বঙ্গভূমির প্রতি

'My Native Land, Good Night!"—Byron

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন ক'রো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?

কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী !

বিহারীলাল চক্রবর্তী

১

সর্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা !
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-পতন ।

২

লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ;
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে,
মাঠে শুয়ে দূর্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি ।

৩

শূন্যময় নির্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরান ।

৪

সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে,
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে !
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থভরা ধরা !
কত আরে থাকিবি ধরিয়ে ?

৫

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এহেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
প'ড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ ।

৬

গর্বভরা অট্টালিকা যা'য়
এবে সব গড়াগড়ি যায় ;
বৃক্ষলতা অগণন
ঘেরে ক'রে আছে বন,
উপরে বিষাদ-বায়ু বায় ।

৭

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে,
যথায় শ্বাপদদল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লী সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে ।

৮

তথা তার মাঝে বাস করি'
ঘুমাইব দিবা-বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ-জন্তুকে যত ডরি ।

৯

কভু ভাবি কোন ঝরনার,
উপলে বন্ধুর যার ধার,
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার ;—

১০

গিয়ে তার তীর-তরু-তলে
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে
ডুবাইয়ে এ শরীর
শব-সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

১১

যে সময় কুরঙ্গিণীগণ
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—

১২

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যু-কালে মিত্র এলে,
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে।

১৩

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে
যথা যেন গর্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসঙ্ঘ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জিয়া বেলারে ;

১৪

সম্মুখেতে অসীম অপার
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেনপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার

১৫

মহাবেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন ।

১৬

সেই মহা রণ-রঙ্গস্থলে
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে,
কান বেশ ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে, শুনিগে সে সকলে ।

১৭

যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর,
ভূষিবেন নির্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন ক'রে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;

১৮

নিবেদিব তাঁহাদের কাছে,
মনে মোর যত খেদ আছে ;
শুনি, নাকি মিত্রবরে
দুখের যে অংশী করে,
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

১৯

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই ;
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।

২০

প্রাতঃকালে মাঠের উপর
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝরঝর,
চারিদিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত হবে কলেবর।

২১

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী
সাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্বরী।

২২

বরষার যে ঘোরা নিশায়
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;

২৩

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে
নড়ব'ড়ে পাতার কুটীরে
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

২৪

বৃথা হেন কত ভাবি মনে
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে!

২৫

হায় রে সে মজার স্বপন
কোথা উবে গিয়েছে এখন,
মোহিনী মায়ায় যার
সবে ছিল আপনার
যবে সবে-নূতন যৌবন!

বঙ্গসুন্দরী

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

উষা

অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক-সিন্দূরফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল ঐ হাসি, কে বা সে যে হাসাইল?
জগৎ মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে;
বল সে কে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে?
কমল-নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে প্রেম-অশ্রু নিরমল?
এই ছিল জীবগণ মৃতপ্রায় অচেতন,
তব পরশন মাত্র পাইল নব জীবন!
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল॥

—সদ্ভাবশতক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃর্ত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে ?

বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাং।

নমামি কমলাং
অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং
মাতরম্,
বন্দে মাতরম্,
শ্যামলাং সরলাং
সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং
মাতরম্॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়াময়ী কাব্যের প্রস্তাবনা

সান্ধ্য-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি!—
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে
পূরিছে বিটপী-বন!
কূট করতালি কবন্ধ তালিছে
ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে!

উধ্বর্চরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভুঁয়ে,
ক্ষুব্ধ অটবী বিরাট্ তাণ্ডবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে ;
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসেছে ভৈরবীপাল,
ভাম-মূরতি শ্মশান হাসিছে,
আলেয়া জ্বালিছে ভাল
চণ্ড-আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থি-ভূষণ গলে,
ঠঠ ঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশানভূমিতে চলে।

১ম প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধাকিটি ধিমিয়া।

২য় প্রেত। রাজা কি রাখাল ছিল কোন কাল
এখন মড়ার মাথার কপাল
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া।

১ম ও ২য় প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধাকিটি ধিমিয়া।

মুখে কটকট শব্দ বিকট
খেলিছে ভৈরবদলে,
দন্ত বিকাশি খিলি খিলি হাসি
অস্থি-ভূষণ গলে ;
খেলিতে খেলিতে চণ্ড দাপটে
প্রমথ চলিল শেষ,
নদীকূলে যেথা মুণ্ড ঝুলায়ে
শ্মশান করাল-বেশ।

দগ্ধ-বরণ বিগত-যৌবন
সম্মুখে স্থাপিত শব,
শুভ্র পলিত চিকুর শিরসে
বদনে বিরত রব,
তীব্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া
কপালে কুঞ্চিত রেখা,
অর্ধজীবনে শ্মশান-গহনে
মানব বসিয়া একা।
অট্ট হাসিতে প্রমথ হাসিল
ভৈরব ধরিল তালি,
অস্থি কুড়ায়ে নৃমুণ্ড-কপালে
সম্মুখে রাখিল ডালি॥

গোবিন্দচন্দ্র রায়

বাঙ্গালার বর্ষা

আসিল বরিষা কাল,
নীল রঙ্ মেঘজাল,
ঢাকিল আকাশ যেন
দিনে রাতি করিয়া
সুগভীর গরজনে,
ঝিরি ঝিরি বরিষণে,
নদ-নদী খাল-বিল
জলে দিল ভরিয়া॥

ক্ষেত খোলা তলে তলে
ঢাকিল নূতন জলে,
মন-সুখে ডাকে কোড়া
ধান-বনে বসিয়া।

পুকুরের ধারে ধারে,
ডাকে বেঙ্ উচুতারে,
ডাহুক-ডাহুকী ডাকে
জল-রসে রসিয়া ॥

৩

লতা পাতা গাছ ঘাসে
ঢাকে ধরা কুশ কাশে,
সকলি সরস রসে,
মেঘরস পাইয়া।
ভিজা বাস ভিজা গা,
ভিজা ঘর আঙ্গিনা,
হাট মাঠ সব ভিজা
পথঘাট লইয়া ॥

৪

কোন্ মাঝি নৌকা খুলে
বাতাসেতে পাল তুলে,
ভিজিছে বাবুই যেন
পাল দড়ি ধরিয়া।
কেহ-বা লাগায়ে কূলে,
আকাশেতে স্বর তুলে,
ছৈয়ের ভিতরে দি'ছে
বারমাসি জুড়িয়া ॥

কেহ-বা নৌকায় চ'ড়ে,
জীবনের আশা ছেড়ে
চলেছে চাকুরি দায়ে
তাড়াতাড়ি করিয়া।

নদীর তুফান দেখি,
ভয়েতে মুদিয়া আঁখি,
ডাকিছে মাঝিরা ঘন,
গাজি গাজি স্মরিয়া

৬

ধন-সুখে সুখী যারা,
আজি দেখ ঘরে তারা,
চপলা-চমক দেখে
বারান্দায় বসিয়া।
কাঁটালের বিচি ভাজা,
তায় মুড়ি তাজা তাজা,
লবণ মরিচ তেলে
খায় কেহ ঘসিয়া॥

৭

সুরস ইলিস মাছে,
কোল গাদা বেছে বেছে,
রাঁধে কুলবধূ ঝোল
সরিষপ বাটিয়া।
বাতাসে বহিয়া গন্ধ
পথিকে করিছে অন্ধ,
জিহ্বায় ছুটিছে জল
নদী-নালা কাটিয়া॥

৮

কেহবা করঞ্জ কাটি
চড়চড়ি পরিপাটি,
রাঁধিছে মনের সাধে
বাটি বাটি ভরিয়া

শ্বশুর-শাশুড়ী ঘরে,
ভয়েতে না কথা সরে,
কাঁদিছে কোণেতে কেহ
প্রবাসীরে স্মরিয়া

৯

আজি দেখ ঘরে ঘরে,
উঠে ধুঁয়া চূড়া ফেড়ে,
দিনে দিনে রাঁধা সারে
বরিষারে ডরিয়া।
ঘরেতে বিছানা পাতি,
দিবসে রচিয়া রাতি,
পান মুখে হুঁকা ধরি
আছে কেহ পড়িয়া ॥

১০

বধূরা গিন্নির ডরে,
কাদার সাগরে প'ড়ে
আজি দেখ হাবুডুবু
খেলিতেছে মরিয়া।
কেহ কাজ-কর্ম সেরে,
পা ধুয়ে বসিয়া ঘরে
মাখিছে আঙ্গুলে তেল
চুনে তপ্ত করিয়া ॥

১১

রসিক পুরুষ যারা,
আজি কোন খানে তারা
বসে আছে রসভরে
ঢুলুঢুলু হইয়া!

পায়ের উপরে পা,
বাবুদের মোছে তা,
ঘরেতে পোয়াতি কাঁদে
কাঁথা কাণি লইয়া

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনোরাজ্য-প্রয়াণ

[সূচনা—স্বপ্নের কুহক। মনোরথ-যাত্রা।
অনেক দিনের পরে কল্পনার দর্শন-প্রাপ্তি]

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী
আইল অমনি
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ ॥১॥

সুকোমল চরণ-কমল দু'টি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি';
করে পদ্ম-ফুল
করে ঢুল ঢুল
অলসিত আঁখি-সম আধো-আধো ফুটি' ॥২॥

কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে,
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে।
পরশের বশে
মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে ॥৩॥

অচেতন চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা।
স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্যে ফাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা ॥৪॥

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি'
কবির মনোমন্দিরে খুলি'-দিল রহস্যের চাবি।
দেখিতে দেখিতে
অমনি চকিতে
এল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাবি' ॥৫॥

মনোরথ নাম তার, কামচারী;
আরোহিল তাহে কবি, স্বপনের হয়ে আজ্ঞাকারী।
অমনি বিমান
করে গাত্রোত্থান,
চালায় সারথি হয়ে কল্পনা-কুমারী ॥৬॥

দেখিতে না-দিয়া কোথা কোন্ স্থান,
নিমেষে ধরার ধরা এড়াইয়া চলিল বিমান।
গিরিবর তায়
ভূতলে মিশায়,
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লভিল নির্বাণ ॥৭॥

কবিবর নাহি জানে কোথা রয়;
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময়।
কিছুকাল পরে,
আকুল অন্তরে,
সারথিরে উদ্দেশিয়া সম্বোধিয়া কয় ॥৮॥

"কোথায় গো সারথি ! তোমারে ধন্য !
নাহি দিক্-বিদিক্ ! অগম শূন্য ! হোথায় কি জন্য
মুখে নাই কথা,
এ কেমন প্রথা !
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন !" ॥৯॥

কিবা রাস-গুচ্ছ বাগাইয়া ধরি'
মুখ ফিরাইল কল্পনা-বালা মৃদু হাস্য করি' !
কবিবর তায়
কি যেন ধন পায়,
একদৃষ্টে চাহি'-রয় সকল পাশরি' ॥১০॥

কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা !
স্তব্ধ-পুলকিত-ছবি কবিবর, মুখে নাই ভাষা !
কথা যাহা কিছু
পড়ি রহে পিছু,
হেরিতে বদন-বিধু নয়ন-পিপাসা ॥১১॥

কোথা গেল কবির বাক্য-বিভব !
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া-গেল মুহূর্তে সে-সব
জাগি'-উঠে ভয়
'স্বপ্ন এ ত নয় ?'
কবি কহে, "স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব ! ॥১২॥

"সেই দেখি বদন, সুধার খনি !
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী !
ফেলিয়া আমায়
আছিলে কোথায় !
কাঁদিয়াছি তোমা-লাগি দিবস-রজনী ॥১৩॥

"কতকাল পরে আজি ভাগ্যোদয়!
পূর্বে সে যখন তুমি দেখা-দিতে, সে এক সময়!
জাগিছে সে-সব
যেন অভিনব!
যতনের বস্তু সে যে, বচনের নয়! ॥১৪॥

"বেড়াতাম কত খুশিতে-হাসিতে!
বারেক না মনে হ'ত, পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে!
শুধু জানিতাম
কল্পনা নাম,
নব-নব সাজি' সাজ, ছলিতে আসিতে! ॥১৫॥

"এখন আবার, এ কি চমৎকার!
রথ লয়ে আসিয়াছ, সারথির ধরিয়া আকার!
অশ্ব তেজে ভরা,
মৃদু হস্তে মরা!
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার! ॥১৬॥

"যাইতেছ কোথায়, বল ত শুনি!"
"মনোরাজ্যে যাইতেছি" হাস্য-মুখে কহিল তরুণী
শুনি' মনোরাজ্য,
হয়ে অনিবার্য,
"লয়ে চল, লয়ে চল!" বলি'-উঠে গুণী ॥১৭॥

"মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা!
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব-অপ্সরা
দলি' স্বর্ণরেণু
চরে কামধেনু!
কল্পতরু-ছায়া-তলে রত্নে হাসে ধরা ॥১৮॥

"তোমা সঙ্গে তথায় না যাব যদি,
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব অবধি !
অই মম তপ,
অই মম জপ,
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি !" ॥১৯॥

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ,
কল্পনা মধুর হাসি', হরি'-লয়ে হরিণ-অপাঙ্গ,
শিথিল-আয়াসে
দোল-দিল রাসে ;
তেজে গরবিয়া-উঠি' ধাইল তুরঙ্গ ॥২০॥

মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সন্নিকট ;
দূর-হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট !
গিরি নদী বন,
হর্ম্য সুশোভন,
স্তরে স্তরে শোভা-করে দিগন্তের পট ॥২১॥

সম্মুখে তোরণ-দ্বার শক্র-ধনু,
ভিতরে সরসী হাসে, চন্দ্র-ভাসে পুলকিত তনু ।
ঘন বনচ্ছায়
কজ্জলের প্রায়,
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাই অণু ॥২২॥

থামিল তুরঙ্গরাজি ক্ষণ-পরে ;
"নাম' কবি এই ঠাঁই" কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে ।
নামিলে সে গুণী
কল্পনা-তরুণী
নামিল, মরাল যেন কেলি-সরোবরে ॥২৩॥

"রম্য এষে উপবন !"
কহে কবি তখন,
ফিরাইয়া নয়ন
চৌদিক পানে।
"পুষ্প-লতা মিলি-জুলি'
সমীরে হেলি-দুলি',
করিছে কোলাকুলি
অভেদ প্রাণে ॥
পথ দিব্য দেখা-যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায় ;
হেলিয়া, তরু, তায়
ছায়া বিছায়।
নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারিদিক,
নয়ন অনিমিক,
ফিরান' দায়।" ॥২৪॥

—স্বপ্নপ্রয়াণ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

চাতক

এমন দারুণ পণ পেয়েছ কোথায় ?
যেখানে সেখানে যাও, সুশীতল জল পাও,
আপন প্রাণের দোষে মর পিপাসায়,
চাহিয়ে ফটিক জল রয়েছ আশায়।

চিরদিন পিপাসায় পরাণ বিকল।
দারুণ নিদাঘ-তাপে, মেদিনী বিদরে দাপে,
কাতর না হও, সও প্রবল অনল,
কেবল তোমার বোল,—'দে ফটিক জল'।

যে নয় তোমার, তুমি ভাব তার তরে।
সুধালে না কথা কও, শূন্য পানে চেয়ে রও,
যবে প্রাণ কাঁদে, পাখী, কাতর অন্তরে
'দে ফটিক জল' বল সকরুণ স্বরে।

মুক্তবেণী কাদম্বিনী ঢাকিলে অম্বরে,
পশুপক্ষী কলরবে নিবাসে প্রবেশে সবে,
তোমার হৃদয়ে আর আনন্দ না ধরে,
'দে ফটিক জল' বলে উঠ পক্ষভরে।

ভীষণ অশনি-নাদে মেদিনী কম্পিত,
ক্ষুদ্র পাখী, নাহি ডর, বক্ষ পাতি বজ্র ধর,
বজ্র-মাঝে নৃত্য কর, চিত্ত পুলকিত,
'দে ফটিক জল' শুনি উন্মাদ-সঙ্গীত॥

—প্রতিধ্বনি

সেন

মেঘনা

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানবজীবন?
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে,
অমনি মধুর স্রোতে সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানবজীবন?

বাসন্তী চন্দ্রিমা মাখা চারু নীলাম্বর
মধুরে কেমন
মিশিয়াছ অন্ত তীরে, মিশিয়াছ নীল নীরে
বঙ্কিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ এই মানবজীবন ?

মানবজীবনে
এত আশা, ভালবাসা, এতই নিরাশা,
এত দুঃখ কেন ?
প্রেমের প্রবাহ, হায়, কেন না বহিয়া যায়
এমন মধুরে ? কেন আকাঙ্ক্ষা স্বপন
নাহি হয়, হায়, শান্ত মধুর এমন ॥

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

উপমা

একদা প্রেয়সী হাসি সুধা-হাসি
সুধাইল মোরে সুধার স্বরে
"বল-না আমারে বুঝায়ে, কাহারে
উপমা কহে সে পণ্ডিতবরে।"

পাঠ্য পুঁথিখানি রহিল পড়িয়া,
পদ্মআঁখি দুটি হইল স্থির,
হাসিটুকু আসি আগ্রহে ডুবিল,
নয়নে ঘেরিল কৌতুক-নীর।

"অভিধান আমি দেখেছি যতনে,
অবিধান-কথা বুঝিতে নারি,
বুঝাইলে মোরে সরল ভাবেতে
তবে ত মরম বুঝিতে পারি

এতেক কহিয়া প্রেয়সী আমার
রহিল চাহিয়া উত্তর আশে ;
সে-রূপ অন্তরে পশিল আমার
উজলিয়া মোর হৃদয়াকাশে।

উছলিল মোর প্রণয়-জলধি,
তাহাতে তরঙ্গ ছুটিল বেগে,
নানা ছাঁদে কিবা খেলিতে লাগিল
চিন্তার বিজলী ভাবের মেঘে।—

(উত্তর)

যথা শোভা পায়, নীল মেঘ গায়,
সন্ধ্যার আগেতে সন্ধ্যার তারা,
যথা সরোবরে, সলিল উপরে,
ভাসে কুমুদিনী তরঙ্গ-হারা।

যথা মরুমাঝে শোভে শ্যাম দীপ—
জুড়ায় পথিক-তাপিত-আঁখি,
যথা বনফুল শোভে বনস্থলে
শ্যামলতা-পরে শিরটি রাখি।

যথা নিরজনে কুসুম-কাননে
বিমল-সলিলা সরসী-মাঝে
পূর্ণচন্দ্র-লেখা হাসি দেয় দেখা,
সাজায়ে নিশিরে রজত-সাজে।

যথা কাল রাতে শোভে আলো করি
অমূল্য মানিক রাজার নিধি,
যথা দীন-হৃদে—এ ঘোর সংসারে—
আশামণি সেই দিয়াছে বিধি।

তুমি রে তেমতি—প্রেয়সি আমার—
পরান-পুতলি—আঁখির তারা—
বিরাজিছ এই হৃদয়-মাঝারে
আঁধার নিশির আলোক পারা ॥

—কুসুমমালা

গোবিন্দচন্দ্র দাস

নৃসিংহ

দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার,
এক কণা এক বিন্দু রাখিব না আর।
আকণ্ঠ লইব চুষি, যত ইচ্ছা, যত খুশি,
চুষে নিব মেদ মজ্জা শুষে নিব হাড়।
ও বিশাল বক্ষ চিরা', হৃৎপিণ্ড লইব ছিঁড়া',
চুষিব ধমনী শিরা কৈশিকা অপার।
অণুতে অণুতে চুষি, সমস্ত লইব শুষি,
রাখিব না খোসা ভুষি ছাই ভস্ম ক্ষার;
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার।

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
শত যত্নে রক্তবীজ পারেনি রাখিতে নিজ,
বৃথা যত্ন বৃথা চেষ্টা কেন কর আর?
স্বর্গ মর্ত্য ব্যাপি' কিবা দেখ-না দীঘল জিহ্বা
মেলিয়াছি ও ললনা আশা আকাঙ্ক্ষার!

ত্রিজগতে তিল ভূমি নাহি যে পালাবে তুমি,
এ অনন্ত পিপাসায় পাবে না নিস্তার।
কেন তবে কাড়াকাড়ি, তিলার্ধ দিব না ছাড়ি,
চুষে নিব রক্ত মাংস শুষে নিব হাড়,
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার।

৩

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
দেও রূপ রস গন্ধ, কি বিষাদ কি আনন্দ,
দেও তব হাসি অশ্রু রোগ শোক ভার।
দেও কুল শীল মান, দেও আত্মা দেও প্রাণ,
দেও স্নেহ ভালবাসা ঘৃণা তিরস্কার।
যত নিন্দা যত গ্লানি, দেও লো সমস্ত আনি,
দেও লো কলঙ্ক কীর্তি যা আছে তোমার।
দেও লো যৌবন জরা, শত কথা ব্যথাভরা,
দেও পাপ অনুতাপ পুণ্য পুরস্কার।
দেও লো নরক স্বর্গ, জন্ম মৃত্যু চতুর্বর্গ,
দেও ভূত ভবিষ্যৎ আলো অন্ধকার।
নীলাম্বু সিন্ধুর বুকে দেও ঢেলে শত মুখে,
মিলে যাই সুখে দুখে বুকে দু'জনার।
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার।

৪

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
একটু রাখিলে বাকি, শত মৃত্যু দূরে থাকি,
পদাঘাতে ফেলে দিব যা দিয়েছ আর।
আমি লো শিবের মত আশুতোষ নহি তত,
চাহিদা অর্ধেক প্রাণ অর্ধ অবলার।

চাতকের বিন্দু বারি আমি ত চাহি না নারি,
চাহি অগস্ত্যের মত শত পারাবার।
অষ্টাদশবর্ষব্যাপী যে দীর্ঘ তৃষ্ণায় যাপি,
রমণী ধমনীহীন কি বুঝিবে তার ?
আমি চাহি পুরা পুরা, নাহি চাহি ক্ষুদকুঁড়া,
কেন কর আধাআধি সাধাসাধি আর ?
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার।

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার
আগে দিয়ে পরে 'না, না' আগে ত ছিল না জানা,
কে তোমার শোনে মানা বৃথা ছলনার।
শতজন্ম উপবাসী, খেয়েছি যে সুধারাশি,
আজ নাকি দেওয়া যায় উগারিয়া আর ?
সরলা, তোমারে কহি, জহ্নু মুনি আমি নহি,
আমি যা করেছি পান নহে ফিরিবার।
আমি রাহু যারে গ্রাসি, আমি যারে ভালবাসি,
জীবনে মরণে মুক্তি নাহিক তাহার।

প্রেমে পাপ হয় পুণ্য, কর্ম সে কামনাশূন্য,
অধর্ম হইয়ে ধর্ম করে সে উদ্ধার ;
রজকিনী চণ্ডীদাসে যে প্রেমে বৈকুণ্ঠ ভাসে,
সে কি লো কুণ্ঠিত প্রেম পাপ কুলটার ?
লছমী ও বিদ্যাপতি, পুণ্যধর্ম মূর্তিমতী,
বহে স্বর্গ-সরস্বতী প্রেমে দু'জনার।
প্রেমে নিবে দৃষ্টি-আলো, করে অন্ধকার কালো,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে প্রেমে একাকার,
তাই শ্যাম শ্যামরূপ প্রেমদেবতার।

৬

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার,
যদি নাহি পার দিতে, ফিরে যাও লো কুন্ঠিতে,
বৈকুণ্ঠ লুন্ঠিতে বুকে নাহি চাহি আর।
প্রেম—দয়া দানধর্ম, কৃপণের নহে কর্ম,
কৃপণ আপন নিয়ে ব্যস্ত অনিবার;
সে চাহিয়া আশেপাশে যদিও বা দিতে আসে,
দিতে সে চাহিয়া বসে—স্বভাব তাহার,
যদি না পারিবে দিতে কেন আস আর ?
যাও নারি, যাও ফিরা', নতুবা ও বক্ষ চিরা'
চুষে নিব হৃৎপিণ্ড শুষে নিব হাড়,
প্রেমের ভীষণ দৃশ্য, নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব,
ভীষণ নৃসিংহ রূপ প্রেমে অবতার।
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার ॥

কবে মানুষ মরে গেছে

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে শিউরে উঠে কায় !
এইখানে সে শুইত খাটে,
পদ্মমুখা রাণীর ঠাটে,
হৃদ্ধ কোমল পদ্ম-সম ধবল বিছানায় !
আজো দেখি দিন দু'পরে,
তেম্‌নি শুয়ে ভঙ্গীভরে,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা চোখে ভাঙ্গা সুখে চায় !
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায় !

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে চম্‌কে উঠে কায়!
এইখানে সে শুইত ভুঁয়ে,
আমার হাতে মাথা থুয়ে,
অমল বেশে হাস্‌ছে যেন কমল শেহালায়!
আজো দেখি দু'পর বেলা,
ভুঁয়ে শুয়ে ফুলের খেলা,
আকুল প্রাণে দুকূল পেতে বকুল শোভা পায়!
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়!

৩

মরে গেছে মানুষ কবে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে উছট্ লাগে পায়।
এইখানে সে বেড়ার কাছে
হেলান দিয়া বসিয়াছে,
হরিণ হেলা শশী যেন হাস্‌ছে বারেন্দায়!
এইখানে দরজার থামে,
দাঁড়াত হেলিয়ে বামে,
আজো দেখি তেম্‌নি তারে মধুর ভঙ্গিমায়,
হরিণ-হেলা শশী যেন আকাশ-নীলিমায়!

৪

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়!
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়!
আজো আমি দিন দু'পরে,
আয়নাতে তার চাই না ডরে,

কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায় !
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায় ।

৫

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার নাম লইতে চাহে ডাইনে বাঁয় !
আজো দেখি বাড়ি গেলে,
শত কার্য কর্ম ফেলে
চুপি দিয়ে চেয়ে থাকে পূবের জানালায় !
কখন দেখি এলো চুলে
দাঁড়ায়ে থাকে কপাট খুলে,
সরল আঁখি গলে তাহার তরল মমতায়,
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক যায় ।

৬

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তারে ঘরে গেলে দেখতে পাওয়া যায় !
এই দেখি সে সামনে খাড়া,
এই দেখি সে পাছে দাঁড়া,
এই দেখি সে পাছে পাছে হাঁটে পায় পায় !
এই দেখি সে দূরে হাসে,
এই দেখি সে কাছে আসে,
এই দেখি সে হাত বাড়ায়ে—আবার মিলে' যায় ।
কি জানি সে কোথায় ঢুকে,
কেমন করে কাহার বুকে,
খুঁজতে গেলে হেসে মরে, বুঝতে পারা দায় !
কেন সে বিজলী-রেখা,
এমন করে দেয় গো দেখা,
জানি না যে কেমন বা তার আশা অভিপ্রায় !
সে যে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক যায় ।

৭

মরে গেছে কবে সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার বাড়ি গেলে কথা শুনা যায়
        কখন বা সে করুণ প্রাণে
        মুগ্ধ করে করুণ গানে,
মধুর মধুর তানে মধুর মধুর বেদনায়।
        কখন বা সে অভিমানে
        মর্ম হতে চর্ম টানে,
কল্‌জে খুলে 'রায়বাঘিনী' রক্ত খেতে চায়,
বজ্র-সম ভয়ংকরী গর্জে গরিমায়।

৮

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তারে যখন-তখন দেখতে পাওয়া যা
        আজো দেখি আমতলাতে,
        দিন দু'পরে সন্ধ্যা প্রাতে,
আঁচল উড়ায় মলয় বাতে কনক-প্রতিমায়।
        কারে বা সে ভালবাসে,
        কারে বা সে দেখতে আসে,
কার আশাতে ঘুরে বা সে বিভল বাসনায়!
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক যায়!

৯

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।
শত্রু মিত্র তাহার কথা কেউ ভুলে নি হায়!
        তাহার হিংসা তাহার দ্বেষে
        শত্রু মরে মনের ক্লেশে,
পরাজয়ে তাহার কাছে প্রবল প্রতিভায়!

দীন ভিখারী দ্বারে এসে
দাঁড়ায় অশ্রুজলে ভেসে,
কোথায় গো মা লক্ষ্মী রাণী—হায়! হায়! হায়
হায়! হায়!
কবে মানুষ মরে গেছে—কেউ ভুলে নি তায়॥

দেবেন্দ্রনাথ সেন

ডায়মণ্ডকাটা মল

[সেদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়াছি। রাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি; এমন সময়ে নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ির তিন বধূ ও কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, "নাতজামাই, বুঝিব তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি কোন্‌টি কে।" তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে যে আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।]

১

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল!
উঠিছে পড়িছে কি রে, নামিছে উঠিছে কি রে
রূপ-হর্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতির শান্ত-গৃহে খুলিয়ে অর্গল?
সুন্দরীর উচ্চ হাসি, পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিরল ছুটে কি রে আনন্দচঞ্চল?
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্,
কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল?
মল বলে,—'আমি যার, বধূ সে গো নহে আর,
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল!'

বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে ;
চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল !
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে ? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে ?
মুখর বিরহ বলে, 'চল্ চল্ চল্'—
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল !

২

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !
হ'ল নারে ঘুরাইতে, প্রেম-চাবি ছুঁতে ছুঁতে
না ছুঁইতে বাজে কেন সোহাগের কল ?
ঝিল্লি সাথে নিশিবায় ঝাঁপ্ তালে গীত গায় ;
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল !
রাজহংস কি কহিল, প্রাণ-কর্ণে কি গাহিল,
লজ্জা গেল ;—দময়ন্তী তনু টল্মল্ !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্,
তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল !
মল বলে,—'আমি যার, বধূ সে গো নহে আর,
ভগ্নীভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল !'
'খোকার ঝিনুক্ কই ?' মেজ বউ বলে ওই,
অধরে গরল তার নয়নে অনল !
কুহু-কুহু কুহরিত, অলিপুঞ্জ-মুখরিত,
বধূর যৌবনকুঞ্জ মরি কি শ্যামল !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !

৩

ঝুমু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুম্, বাজে ওই মল !
পদ্মদলে পরবেশি, হারাইয়া দশদিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে কি রে হইয়ে পাগল ?
অতনু কি মৃদুভাবে লুকায় উমার বাসে ?
পাছে ভাঙ্গে তপ, জ্বলে হর-কোপানল !

কেন, কেন ম্রিয়মাণ হেমন্তে পাখীর প্রাণ ?
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল ?
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু, ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমু, বাজে ওই মল !
মল বলে,—'আমি যার, চির-লজ্জা সখী তার ;
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ-হলাহল !
চুম্বিয়ে চরণ তার, জানাই গো বার বার ;
বধূর কেমন পণ, সকলি বিফল !'
ঘোমটা টানি মাথায়, সেজ বউ চলি যায় ;
পদ্ম-দলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল !
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু, ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমু বাজে ওই মল !

৪

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্, বাজে ওই মল !
জল পড়ে ঝর ঝর, শীত তনু থর থর,
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার সঙ্গীত তরল !
শুনে শ্যাম নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছলছল আঁখি রাধা চাহে ধরাতল !
মিলন লজ্জার বুকে, মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরে, 'হেথা হ'তে চল্ সখী চল্ !'
প্রগল্‌ভা হাসিতে চায় ; গুরুজন !—একি দায় !
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল !
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্
মল বলে, 'বল্, ওরে স'রে যেতে বল্ !'
কবি বলে, 'আসে ওই আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু ভরমে বিকল ;
যামিনীতে দেখা হ'লে সুধাব সোহাগ ছলে
তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্বরী, সখি, তোর গলা ধরি,
এমন কি গান গায় ? বল্ সখি বল্ !
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্, ওই বাজে মল !

খোঁপা-খোলা

খোঁপাটি দিয়েছে খুলে ;—এই দোষ ওর ?
খোকারে বলো না কিছু, এ মিনতি মোর !
  দেখ সখি, চুলগুলি
  শ্রীঅঙ্গে পড়েছে ঝুলি,
দোলায়ে অলকাবলি খেলে বায়ু চোর ;
  ভূমিতে লুটায় আসি,
  কেশের ঐশ্বর্যরাশি,
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোর !
  কেন ওরে মিছে বক',
  আমার মিনতি রাখ—
সোহাগিনি, শোভার যে নাহি আজ ওর !
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে—এই দোষ ওর ?
  মধুমাসে ছোটে অলি
  হয়ে মহা কুতূহলী ;
ঠিক যেন তোর ওই চাহনি ডাগোর !
  সারি সারি ব'সে ধীরে,
  অশোক চম্পক শিরে ;
কবির আঁখিতে বহে হরষের লোর !
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর ?
  শ্রাবণে দিক্-সুন্দরী
  বিজুরী লতিকা ধরি
কুসুম তুলিয়া লয় ভরিয়া আঁচোর ;
  আদর সোহাগ করি
  ঘননীল নীলাম্বরী
বরিষা পরায় তারে, দিয়া তারে কোর ।
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর ?

জলভারে ক্লান্ত হয়ে
কাদম্বিনী পড়ে নুয়ে ;
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোর !
আমার মিনতি রাখ,
আজি এলোচুলে থাকো ;
খোকারে বোলো না কিছু, এ মিনতি মোর !
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর ॥

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

গার্হস্থ্য চিত্র

ফুট্‌ফুটে জোছনায়, ধব্‌-ধবে আঙিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি জুঁই শেফালিকাগুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে ;
প্রাচীরেতে সুশোভিতা রাধিকা, ঝুমুকা-লতা,
দুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে।
মৃদু ঝুরুঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝ'রে পড়ে কামিনীর ফুল ;
প্রশান্ত মুখের পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
আলসেতে আঁখি ঢুলু ঢুল্‌।
মৃদু মৃদু ধীর হাতে আঘাতি শিশুর মাথে
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান।
মোহিয়া সুস্বর ভাষে আকুল কি ফুলবাসে
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী তান !

শিয়রেতে জেগে শশী যেন সে সৌন্দর্য-রাশি
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ', মা বলিছে 'আয় চাঁদ',
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামেশি,
স্বর্গে মর্ত্যে প্রভেদ কি আছে॥

অক্ষয়কুমার বড়াল

আদর

[প্রতি শ্লোকের শেষাংশ হুড্ হইতে গৃহীত]

বড় দুষ্টু, না—না, যাদু, অতি শিষ্ট তুমি।
আর ফুলায়ো না ঠোঁট, এই মুখ চুমি।
তোমারে বকিতে পারে হেন সাধ্য কার—
সসাগরা ধরিত্রীর সম্রাট আমার!
ছাড্, ছাড়্ লক্ষ্মীছাড়া, গোঁফগুলো গেল
এই লও রাঙ্গা লাঠি, বসে' বসে' খেল'।

খেল' ভদ্র দিগম্বর, লইয়া খেলনা.
করিব তোমার নামে কবিতা-রচনা।
তুমি নয়নের মণি, বিশ্ব চরাচর
তোমার নয়নপাতে কি শুভ সুন্দর!
আলোকে পুলকে ধরা উঠিছে রাঙ্গিয়া—
ওই যা! বেহালাখানা ফেলিল ভাঙ্গিয়া!

অমরীর কর-চ্যুত তুমি ফুল-ইষু,
নিষ্কলঙ্ক শাপ-ভ্রষ্ট ক্ষুদ্র দেব-শিশু!
কত পুণ্যে পাইয়াছি তোরে, প্রাণাধিক!
রোদনে মুকুতা ঝরে, হাসিতে মাণিক।
স্বর্গ-মর্ত্য ভুলে' থাকি তোরে কোলে নিলে—
দেখ-দেখ, সিকি দুটো ফেলে বুঝি গিলে!

তুমি বসন্তের ফুল, বসন্তের পিক,
তোমার সুবাসে গানে মুগ্ধ দশ দিক্।
তুমি দেবতার শ্বাস—মলয় নির্মল,
তুমি শরতের জ্যোৎস্না—অমরী-অঞ্চল।
ছাড়্—ছাড়্, হুঁকা ছাড়্, কি বিষম টান—
এইবার লঙ্কাকাণ্ড করে হনুমান।

তুমি অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যের আশা,
চপল জীবনে তুমি অচল পিপাসা।
দম্পতির নিত্য-নব প্রেম-অনুরাগ
তোমার সলীল স্পর্শে সতত সজাগ!
ধর—ধর, হতভাগা কিছু নাহি বুঝে,
সিঁড়ি হতে পড়ে বুঝি ঘাড়-মুখ গুঁজে

দেহ পারিজাতে গড়া, চক্ষে ধ্রুবতারা,
চরণে ললিত গতি—মন্দাকিনী-ধারা।
মুখে পূর্ণিমার শশী কলঙ্ক-বিহীন;
অধরে অরুণ-হাসি, ভাষে বাজে বীণ।
পরশে সোহাগ-রাগে রোমাঞ্চ শরীরে—
কি জ্বালা! চাদরখানা দাঁতে করে' ছিঁড়ে!

তোমারে ধরিতে কোলে, করিতে চুম্বন,
বাহু বাড়াইয়া আছে দিগঙ্গনাগণ!
অস্ত যায় রক্ত-রবি—তবু চায় ফিরে,
খেলিতে তোমার কম-কমল-শরীরে!
কত গন্ধ, কত গান দেয় বায়ু আনি'—
কুকুরের কান ধরে' একি টানাটানি!

ধরণীর সর্ব শোভা করি আহরণ
গড়েছে প্রকৃতি তব অপূব গঠন!
এ কুসুমে সুধা দিতে বিধি দয়াময়
নিঙাড়িয়া দিয়াছেন স্বর্গ সমুদয়!
থাকিলে সহস্র প্রাণ দিতাম হেলায়—
ধর—ধর, ঝুঁকিতেছে ভাঙ্গা জানালায়!

আশীর্বাদ করি, বৎস, যেন চিরদিন
এমনি সরল থাক, এমনি নবীন!
বিধাতার আশীর্বাদ, পিতৃবাহু সম,
চিরদিন আগুলিয়া রাখে, প্রিয়তম!
পাপ-তাপ দূর করি চির-পুণ্য-আলো—
আমি বলি, হাত দুটো বেঁধে রাখা ভালো!

ধনে হও যক্ষ-রাজ, দাতাকর্ণ দানে,
বলে হও ভীমার্জুন, বেদব্যাস জ্ঞানে;
স্বদেশ-সহায় হও, হও পুণ্যশ্লোক,
ধরণী তোমার নামে চির-ধন্য হোক্!
ওগো, খাতাখানা গেছে, কালি দেছে ফেলে,
লিখিতে পারি না, তুমি নিয়ে নাহি গেলে॥

অপরাহ্ণে

শুনি নাই কার' কথা, বুঝি নাই কার' ব্যথা—
এত কাব্যে, এত গাথা-গানে।
দেখি নাই কার' মুখ— এত সুখ, এত দুখ,
এত আশা, এত অভিমানে!

এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল!

অযতনে ব্যর্থ হয় সবি!
ধরিয়া তুলিটি শুধু দুটি রেখা টেনে' গেলে
শূন্য হৃদি হয়ে যেত ছবি!
কি কথা বলিতে হবে একবার বলে' গেলে—
লক্ষ্যহারা হয়ে যেত কবি!

কোথা তুমি ফুটিয়াছ ফুল
এ শুষ্ক তরুর!
কোথা তুমি বহিছ তটিনী
এ তপ্ত মরুর!
যূথীর শীতল মৃদু বাস
বায়ু শুধু আনিছে হেথায়
কার মুখ চুমি'!
কে আছ—কোথায় আছ তুমি!

বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যূষে,
ডাকে সে কি বৃথায়—বৃথায়!

ফুটে না কি প্রভাত-আলোক,
সে ডাক কি শূন্যে ভেসে যায়!
জীবনের এই আধখানা,
দরশ-পরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই!
এ কি শুধু ভাবহীন ভাষা!

এ কি শুধু ভাবহীন ভাষা—
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত-পিপাসা!
এই যে আঁখির কাছে কত অশ্রু ফুটে আছে,
কি আশা নিঃশ্বাস পিছে অবিরত যুঝে—
এই বুক-ভরা ব্যথা কেহ নাহি বুঝে?

এই যে নীরব প্রীতি— শারদ জ্যোৎস্নার স্মৃতি,
আপন হৃদয়-ভারে ব্যথিত আপনি—
বাজিছে বাঁশরী দূরে করুণ পূরবী সুরে,
এই আছে, এই নাই—উছলিছে ধ্বনি—
এই যে আকুল শ্বাসে— জগৎ মুদিয়া আসে,
অথচ জানি না নিজে কি দুঃখে বিহ্বল—
কিছু নয়—কিছু নয় তবে এ সকল?

এই সে নদীর কূলে পলে পলে ঘুরি ভুলে'
আগ্রহে তরুর তলে চাহি কার তরে—
গাঁথিয়া ফুলের মালা খেলে না কি কোন বালা,
চাহে না পথিক পানে সন্ধ্যায় কাতরে?

ওই কুটীরের দ্বারে, এ ভাঙ্গা বেড়ার পারে
কেহ কি বসিয়া নাই মোর অপেক্ষায়,
চমকি' উঠিলে বায়ু চমকিয়া চায়?

আসে যায় কত লোক, কাহারো সজল চোখ
পড়িবে না মোর চোখে, হবে না মিলন—
এ জীবন-হেঁয়ালির চরণ-পূরণ !

ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, স্তব্ধ বনভূমি ,
সোনালী মেঘের গায়ে সুরভি শীতল বায়ে,
শিথিল তটিনী-ভঙ্গে লুকালে কি তুমি !
পিক-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল ক্ষেত্রে
মুদ্রিত কমল-পত্রে রয়েছ কি ঘুমি' !
আকুল হৃদয় কাঁদে, কোথা তুমি—তুমি।

ছাড়া-ছাড়া হয়ে কেন বেড়াইছ ভাসি ?
ভাঙ্গিয়া স্বপন-কারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি !
নাহি কথা, নাহি ব্যথা— কি গভীর নীরবতা !
হৃদয়ে হৃদয়ে পড়ে উচ্ছ্বাসি'—উচ্ছ্বাসি' !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপহার

নিভৃত এ চিত্ত-মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা ;
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা ;
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র-গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দমুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ॥

—মানসী

একটিমাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে,
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।
মরুপাহাড়দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল—
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল।

রৌদ্র তখন মাথার 'পরে
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের 'পরে
আকুল ঘ্রাণে নিই নি তাহার
শীতল পরিমল।
রেখেছিলেম লুকিয়ে আমার
একটি আঙুর ফল।

বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠল হুহু
ধূ ধূ বালুর ডাঙা—
থাকতে দিনের আলো
ঘরে ফেরাই ভালো—

তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল,
মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল ॥
—ক্ষণিকা

কোকিল

আজ বিকালে কোকিল ডাকে,
শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলেম যেন
তিন-শো বছর আগে।
সে দিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অশ্রুজলের ছায়া।

পল্লীখানি প্রাণে ভরা,
গোলায় ভরা ধান,
ঘাটে শুনি নারীর কণ্ঠে
হাসির কলতান।
সন্ধ্যাবেলায় ছাদের 'পরে
দখিন হাওয়া বহে,
তারার আলোয় কারা ব'সে
পুরাণ-কথা কহে।

ফুল-বাগানের বেড়া হতে
হেনার গন্ধ ভাসে,
কদম-শাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে।

বধূ তখন বিনিয়ে খোঁপা
চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুল-বনে
কোকিল কোথা ডাকে।

তিন-শো বছর কোথায় গেল,
তবু বুঝি নাকো
আজো কেন ওরে কোকিল,
তেমনি সুরেই ডাকো।
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে,
ফেটেছে সেই ছাদ—
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুনবে সাঁঝের চাঁদ।

শহর থেকে ঘণ্টা বাজে,
সময় নাই রে হায়—
ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ
কিসের ব্যর্থতায়।
আর কি বধূ, গাঁথো মালা,
চোখে কাজল আঁকো?
পুরানো সেই দিনের সুরে
কোকিল কেন ডাকো॥

—খেয়া

শূন্য ছিল মন,
নানা-কোলাহলে-ঢাকা
নানা-আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা-জনতায়-ফাঁকা
কর্মে-অচেতন
শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন এল নূপুরবিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণরেখা
কী লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তুলি।
আমি যে ছিলাম একা
তাও ছিনু ভুলি,
আইল গোধূলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো
কোন্ স্বর্গ হতে
চাঁদখানি লয়ে হেসে
শুক্লসন্ধ্যা এল ভেসে
আঁধারের স্রোতে।
বুঝি সে আপনি মেশে
আপন আলোতে।
এল কোথা হতে।

অকস্মাৎ-বিকশিত পুষ্পের পুলকে
তুলিলাম আঁখি।
আর কেহ কোথা নাই,
সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়ালো তাই
মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।

দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জবিতানে—
কার কথা হেনকালে
কহি গেল কানে
শুনেছি পুরাণে।

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মতো আকাশ বাহিয়া
এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে!
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলনকৌতুকে
এল মোর বুকে!

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
সর্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির
কথাটি না কয়ে।
কোন্ পদ্মবনানীর
কোমলতা লয়ে
পশিল হৃদয়ে?

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম,
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।

এই শুধু বুঝিলাম,
না পাইলে দেখা
রব আমি একা।

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিনরজনী,
এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর,
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধ প্রাণে
কী দিব উত্তর।
অশ্রু আসে দু নয়ানে
নির্বাক অন্তর,
হে সৌম্য-সুন্দর॥
—উৎসর্গ

স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।

গভীরধারা জলের ধারে,
আঁধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে ঐ বিজন পুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

দিনের শেষে মলিন আলোয়
কোন্ নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি
উড়েছে সেই পারের পানে।
ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে
উদাস ধ্বনি উধাও আসে,
বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানে
তান তুলেছে কোন্ নূপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

নিচল জলে নীল নিকষে
সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা,
পারাপারের সময় গেল
খেয়াতরীর নাইকো দেখা।
পশ্চিমে ঐ সৌধছাদে
স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশি
বেদনভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

সারাটা দিন দিনের কাজে
হয় নি কিছুই দেখাশোনা,
কেবল মাথার বোঝা ব'হে
হাটের মাঝে আনাগোনা।

এখন আমায় কে দেয় আনি
কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি ;
সন্ধ্যাদীপের আলোয় ব'সে
ওগো আমার নয়ন ঝুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে ॥

—গীতিমাল্য

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলে নি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হ'ত, খবর আসে—
উঠত হিয়া চমকে।
শুধু যেদিন দখিন-হাওয়ায়
বিরহ-গান মনকে গাওয়ায়
পরান-উনমাদনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে,
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি,
সেদিন আমার লাগে মনে—
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জান যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে।

এ কী গভীর, এ কী মধুর,
এ কী হাসি পরান-বঁধুর,
এ কী নীরব চাহনি,
এ কী ঘন গহন মায়া,
এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
নয়ন-অবগাহনি।
লক্ষ তারের বিশ্ববীণা
এই নীরবে হয়ে লীনা
নিতেছে স্বর কুড়ায়ে,
সপ্তলোকের আলোক-ধারা
এই ছায়াতে হল হারা,
গেল গো তাপ জুড়ায়ে।
সকল রাজার রতন-সজ্জা
লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
বিনা-সাজের কী বেশে।
আমার চির-জীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমেষে॥

—গীতিমাল্য

কে গো তুমি বিদেশী।
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
বাজালো সুর কী দেশী।
নৃত্য তোমার দুলে দুলে,
কুন্তলপাশ পড়ছে খুলে,
কাঁপছে ধরা চরণে,

ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
উত্তরী যে যাচ্ছে উড়ে
ইন্দ্রধনুর বরনে।
আজকে তো আর ঘুমায় না কেউ,
জলের 'পরে লেগেছে ঢেউ,
শাখায় জাগে পাখিতে।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠছে বেজে
ধৈর্য নারি রাখিতে।

মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নিচু
সুর ছুটেছে সবার পিছু,
রয়না কিছুই গোপনে।
ডুবিয়ে দিয়ে সূর্যচন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।
নাটের লীলা হায় গো এ কী,
পুলক জাগে আজকে দেখি
নিদ্রা-ঢাকা পাতালে।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে,
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালে।
লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নিচে
ফুটায়ে ভুঁই-চাঁপারে।
রুদ্ধ ঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পারে।

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যে রে
হৃদয়-গুহার নাগিনী।
নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।
তোমার এই আনন্দ-নাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লও গো তারে ভুলায়ে ;
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,
নাচবে ফণা দুলায়ে।
মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন-সমীরণে,
মিলবে আলোয় আকাশে।
তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,
বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে॥

—গীতিমাল্য

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেছে কোন্‌খানে ?"
"কে জানে ভাই, কে জানে
চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর-ঘেরা

আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে—
সেইখানে ভাই, করব গমন নিশীথে।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন বেশে
কে আছে বা সেইখানে ?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
বুকের কাছে প্রাণের সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,
শুনেছিলাম জ্যোস্নারাতের স্বপনে।
অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন হেসে,
কিসের বিলাস সেইখানে ?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
জগৎজোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে
আর সেখানে ঠাঁই নাহি তো কিছুরি ;
সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে, কেই বা এসে

পথ দেখাবে সেইখানে ?”
“কে জানে গো, কে জানে।
শুনেছি সেই একটি বাণী,
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো,
সে মন্ত্র সেই প্রাণের পারে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল-সাঁঝে গো।”

—গীতিমাল্য

এই দুয়ারটি খোলা।
আমার খেলা খেলবে ব'লে
আপনি হেথায় আস চলে
ওগো আপনভোলা।
ফুলের মালা দোলে গলে,
পুলক লাগে চরণতলে
কাঁচা নবীন ঘাসে।
এসো আমার আপন ঘরে,
ব'সো আমার আসন-'পরে,
লহো আমায় পাশে।
এমনিতরো লীলার বেশে
যখন তুমি দাঁড়াও এসে,
দাও আমারে দোলা।
ওঠে হাসি, নয়ন-বারি,
তোমায় তখন চিনতে নারি
ওগো আপনভোলা।

কত রাতে, কত প্রাতে,
কত গভীর বরষাতে,
কত বসন্তে,
তোমায় আমায় সকৌতুকে
কেটেছে দিন দুঃখে সুখে
কত আনন্দে।
আমার পরশ পাবে ব'লে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ তো জানে না তা
রইল আকাশ অবাক মানি,
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।
মোদের দোঁহার সেই কাহিনী
ধরেছে আজ কোন্ রাগিণী
ফুলের সুগন্ধে?
সেই মিলনের চাওয়া-পাওয়া
গেয়ে বেড়ায় দখিন হাওয়া
কত বসন্তে।

মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে
যেন তোমায় হল মনে
ধরা পড়েছ।
মন বলেছে, "তুমি কে গো,
চেনা মানুষ চিনি নে গো,
কী বেশ ধরেছ?"
রোজ দেখেছি দিনের কাজে
পথের মাঝে ঘরের মাঝে
করছ যাওয়া-আসা;

হঠাৎ কবে এক নিমেষে
তোমার মুখের সামনে এসে
পাইনে খুঁজে ভাষা
সেদিন দেখি, পাখির গানে
কী যে বলে কেউ না জানে ;—
কী গুণ করেছ।
চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ে
অচেনা সেই উঁকি মারে,
ধরা পড়েছ ॥

—গীতিমাল্য

মাধবী

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

সেইমতো আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে ॥

—বলাকা

এবার

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে,
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে ॥

—বলাকা

সন্ধ্যায়

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে,
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে ।
চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নত শিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার ;
ঐ যে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;
ঐ যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়
ঘুমে অলসকায় ;

ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুনধূলি নিল সে বিদায় ;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে ;
তোমার ঐ অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই, প্রভু,
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি ॥

—বলাকা

প্রচ্ছন্না

বিদেশে ঐ সৌধশিখর-'পরে
ক্ষণকালের তরে
পথ হতে যে দেখেছিলেম, ওগো আধেক-দেখা,
মনে হল, তুমি অসীম একা।
দাঁড়িয়েছিলে যেন আমার একটি বিজন ক্ষণে,
আর কিছু নাই সেথায় ত্রিভুবনে।
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ, অরণ্যতল নীচে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে।
মুখ দেখা না যায়,
পিঠের 'পরে বেণীটি লুটায়।
থামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দেখি আধখানি ঐ দেহ,
অসম্পূর্ণ কয়টি রেখায় কী যেন সন্দেহ।
বন্দিনী কি ভোগের কারাগারে,
ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর দিগন্তপারে ?

সোনার বরন শস্যখেতে, কোন্ সে নদীতীরে
পূজারিদের চলার পথে, উচ্চচূড়া দেবতামন্দিরে
তোমার চিরপরিচিত প্রভাত-আলোখানি,
তারি স্মৃতি চক্ষে তোমার জল কি দিল আনি।

কিম্বা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগী,
সেই বহুবল্লভের প্রেমে দ্বিধার দুঃখ হৃদয়ে রয় জাগি,
প্রশ্ন কি তাই শুধাও নক্ষত্রেরে
সপ্তঋষির কাছে তোমার প্রণামখানি সেরে।
হয়তো বৃথাই সাজো,
তৃপ্তিবিহীন চিত্ততলে তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজো;
তাই কি শূন্য আকাশ পানে চাও,
উপেক্ষিত যৌবনেরি ধিক্কার জানাও?

কিম্বা আছ চেয়ে
আসবে সে কোন্ দুঃসাহসী গোপন পন্থা বেয়ে—
বক্ষ তোমার দোলে,
রক্ত নাচে ত্রাসের উতরোলে।
স্তব্ধ আছে তরুশ্রেণী মরণছায়া-ঢাকা,
শূন্যে ওড়ে অদৃশ্য কোন্ পাখা।
আমি পথিক যাব যে কোন্ দূরে;
তুমি রাজার পুরে
মাঝে মাঝে কাজের অবসরে
বাহির হয়ে আসবে হোথায় ঐ অলিন্দ-'পরে,
দেখবে চেয়ে অকারণে স্তব্ধ নেত্রপাতে
গোধূলি-বেলাতে
বনের সবুজ তরঙ্গ পারায়ে
নদীর প্রান্তরেখায় যে পথ গিয়েছে হারায়ে।

তোমার ইচ্ছা চলবে কল্পনাতে
সুদূর পথে আভাসরূপী সেই অজানার সাথে
পান্থ যেজন নিত্য চলে যায়।
আমি পথিক হায়
পিছন-পানে এই বিদেশের সুদূর সৌধশিরে
ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে ফিরে
ছায়ায়-ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে,
যে মুখ তোমার লুকিয়ে ছিল সে মুখ আঁকি মনে॥

—মহুয়া

অমর্ত্ত

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।—
ঐখানে মোর বাসা
যে-মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস!
চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নীচে
যাত্রা আমার নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে।
ফুল-ফোটাবার যে রাগিণী বকুলশাখায় সাধা,
নিষ্কারণে ওড়ার আবেগ চিলের পাখায় বাঁধা,
সেই দিয়েছে রক্তে আমার ঢেউয়ের দোলাদুলি,
স্বপ্নলোকে সেই উড়েছে সুরের পাখনা তুলি।
দায়-ভোলা মোর মন
মন্দে-ভালোয় সাদায়-কালোয় অঙ্কিত প্রাঙ্গণ
ছাড়িয়ে গেছে দূর দিগন্ত-পানে
আপন বাঁশির পথ-ভোলানো তানে।
দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন-ডোর।

শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি,
শুধু কেবল গানেই ভাষা যার,
পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার ;
নিমেষহারা চেয়ে-থাকার দূর অপারের মাঝে
ইঙ্গিত যার বাজে।
যে-দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে ॥

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চারিদিকে চিরকাল ধ'রে,
আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী ব্রতীর দল।
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।
সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা,
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,

আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্‌গদ আকুতি থেকে,
মাধুর্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃতরূপ
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।
নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ
সুখদুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায়।
লেগেছে নিবিড় হর্ষের অনুকম্পন,
এসেছে লজ্জার ধিক্কার, ভয়ের সংকোচ, কলঙ্কের গ্লানি,
জীবন-বহনের প্রতিবাদ।
ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ
দিয়ে গেছে আন্দোলন
প্রাণরস-প্রবাহে।
তার আবেগে বয়ে নিয়ে গেছে সর্বগৃধ্নু চেতনাকে
জগতের সর্বদান-যজ্ঞের প্রাঙ্গণে।
এই চিরচঞ্চল চিন্ময় পল্লবের অশ্রুত মর্মরধ্বনি
উধাও ক'রে দেয় আমার জাগ্রত স্বপ্নকে
চিল-উড়ে-যাওয়া দূরদিগন্তে
জনহীন মধ্যদিনে মৌমাছির গুঞ্জনে মুখর অবকাশে।
হাতধ'রে-বসে-থাকা বাষ্পাকুল নির্বাক ভালোবাসায়
নেমে আসে এদেরই শ্যামল ছায়ার করুণা।
এদেরই মৃদুবীজন এসে লাগে
শয্যাপ্রান্তে নিদ্রিত দয়িতার
নিশ্বাসস্ফুরিত বক্ষের চেলাঞ্চলে।
প্রিয়-প্রত্যাশিত দিনের চিরায়মান উৎকণ্ঠিত প্রহরে
শিহর লাগাতে থাকে এদেরই দোলায়িত কম্পনে।

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।

এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে ;
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।
এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
প্রাণলীলার প্রথম ইন্দ্রজাল আদিযুগের,
অনন্ত পুরাতনের আত্মবিলাস
নব নব যুগলের মায়ারূপের মধ্যে।
এরা স্পন্দিত হয়েছে পুরুষের জয়শঙ্খধ্বনিতে
মর্তলোকে যার আবির্ভাব
মৃত্যুর আলোকে আপন অমৃতকে উদ্‌বারিত করবার জন্যে
দুর্দাম উদ্যমে,
জল-স্থল-আকাশপথে দুর্গম-জয়ের
স্পর্ধিত যার অধ্যবসায়।

আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের
ঝরবার দিন এল জানি।
শুধাই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে—
কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,
জীবনের অলক্ষ্য গভীরে
আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অরণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার ক'রে॥

—পত্রপুট

বিপ্লব

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল
ছিন্ন করে দিল তার ছন্দ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী
হে নর্তিনী,
বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ;
বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী।
সীমন্তের সিঁথি তব, প্রবালে খচিত কণ্ঠহার—
অন্ধকারে মগ্ন হল চৌদিকে বিক্ষিপ্ত অলংকার।
আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ,
ভীষণ রিক্ততা তার
উৎসুক চক্ষুর 'পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার,
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে মুগ্ধহস্তে-গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা,
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হত রসের প্লাবন
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।
যে অভিসারের পথে চেলাঞ্চলখানি
নিতে টানি
কম্পিত প্রদীপশিখা-'পরে
তার চিহ্ন পদপাতে লুপ্ত করি দিলে চিরতরে ;
প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে।

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারি হিংস্র সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে,
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি-সম।
তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে।

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে
তীব্র রস দিতে ঢালি রজনীর অনিদ্র কৌতুকে
যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।
প্রেমেরি সে দানখানি, সে যেন কেতকী
রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,
বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে,
যেখানে উল্কার আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে।

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে—
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে ॥

—সানাই

কোপাই

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
অন্য পারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে শর্ষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল;
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি।
ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।

পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
একদিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-একদিকে নিঃসঙ্গ
সমুদ্রের আহ্বান।

একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।

তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি
কত কালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এপারের সঙ্গে ওপারের কথা চলে সহজে।
শনের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা।
রাস্তা যেখানে থেমেছে তীরে এসে
সেখানে ও পথিককে দেয় পথ ছেড়ে
কলকল স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতের উপর দিয়ে।
অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে,
তীরে আম জাম আমলকির ঘেঁষাঘেঁষি।

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—
তাকে সাধুভাষা বলে না,
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।
ছিপ্‌ছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাৎলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।
শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল
ক্ষীণ হয় তার ধারা,
তলায় বালি চোখে পড়ে,
তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না,
তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন ;
এ দুইয়েই তার শোভা—
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে—
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে—
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে ;

পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায় ॥

—পুনশ্চ

বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পুবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্‌দুর
তারি চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।
নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয় ;
বাতাবি-লেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে ;
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেষারেষি ;
শজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায় ;
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।

তারি এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।
নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো,
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস
আর ঢালুতটে চরে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাই গোরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা
খয়েরি-রঙের-ফুল-কাটা।
দেয়াল বাসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়।
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।
একটি মানুষ পেয়েছি
তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
পাশের কুটিরে সে থাকে,
তার চালে উঠেছে ঝুমকোলতা।
আপন মনে সে গায় যখন
তখনি পাই শুনতে—
গাইতে বলি নে তাকে।
স্বামীটি তার লোক ভালো—

আমার লেখা ভালোবাসে,
ঠাট্টা করলে যথাস্থানে যথোচিত হাসতে জানে,
খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে,
আবার হঠাৎ কোনো-একদিন আলাপ করে
—লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব—
রাত্রি এগারোটার সময় শালবনে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

বাড়ির পিছন দিকটাতে
শাক-সবজির খেত।
বিঘে-দুয়েক জমিতে হয় ধান।
আর আছে আম-কাঁঠালের বাগিচা
আস্‌শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া।
সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুন্ গুন্ গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,
তার স্বামী যায় দেখতে খেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে।
নদীর ওপারে রাস্তা,
রাস্তা ছাড়িয়ে ঘন বন—
সে দিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি,
আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

এই পর্যন্ত।
এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন।
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন ঘননীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।

আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও।
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে ॥

—পুনশ্চ

কোমল গান্ধার

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,
বলত হেসে 'মানে কী'।
মানে কিছুই যায় না বোঝা সেই মানেটাই খাঁটি।
কাজ আছে কর্ম আছে সংসারে,
ভালো মন্দ অনেক রকম আছে—
তাই নিয়ে তার মোটামুটি সবার সঙ্গে চেনাশোনা
পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে
কেমন একটি সুর দিয়েছে চার দিকে।
আপনাকে ও আপনি জানে না।
যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা,
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো—
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।
গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না।

চলায় বলায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান—
কেন যে তার পাই নে কিনারা।
তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার—
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়॥

—পুনশ্চ

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝল্‌মলে মধ্যাহ্ন
উত্তর দক্ষিণের জানালা দিয়ে এসে
জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন।
জানি নে কেন মনে হয়
এই দিন দূর কালের আর কোনো-একটা দিনের মতো।
এ-রকম দিন মানে না কোনো দায়কে,
এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,
বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন
একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা বলে
সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।

প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা—
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।
তেমনি এই-যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে

—পুনশ্চ

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

অহল্যা

১

কেন গো বাঁধিল মোরে বিবাহের ডোরে ?
অসহ বন্ধন !
কিবা সুখে সে সুখিনী পিঞ্জরের বিহগিনী ?
প্রমুক্ত গগন
বিস্তীর্ণ শ্যামল বন হেরি কাঁদে অনুক্ষণ ;
পীড়িত লৌহের দণ্ডে পক্ষপুট তার ।
তবু নিত্য ব্যথামাখা ঝাপটে বাসনা-পাখা ।
বধিতে যুবতী জনে একি কারাগার !

২

নিত্য যদি নব ঋতু না সাজাত তনু
ধরণী তোমার,
মোহিনী বলিয়া তোরে কে দেখিত আঁখি ভ'রে
কহ অনিবার ?
হ'তে কি সুন্দর তুমি পুষ্পময়ী বনভূমি ?
নিত্য নব নব ফুল না ফুটিলে হেসে ?
হে গগন, তব পটে কভু নীল শোভা ফোটে,
বিজুলিজড়িত ঘন কভু আসে ভেসে ।

৩

বিচিত্রতা নাহি যদি প্রেমের সম্ভোগে
সে কি সুখময় ?
নিত্য যদি নবোৎসবে মন্দির নাহিক শোভে,
আঁধার আলয় ।

জলাঞ্জলি দিয়া সাধে বাসনা বিষাদে কাঁদে ;
যৌবনমন্দির মম পূর্ণ তমিস্রায়।
নির্মম পুরুষ-হৃদি সৃজিল বিবাহ-বিধি
দহিতে রমণীগণে শত যাতনায়।

৪

ভাঙিয়া বালির বাঁধ, প্রেম-প্রবাহিণি,
ব'হে যা ছুটিয়া।
মুক্তপথে একাকিনী ওড় চিত্ত-বিহগিনি
পক্ষ বিধুনিয়া।
মিথ্যাকথা—কুল, লাজ ; এস তুমি দেবরাজ !
তৃপ্ত কর ; ক্ষিপ্ত প্রাণ নব-ভোগ-আশে।
যথা নব ফুল ফোটে, নব সমীরণ ছোটে,
এ নব যৌবন লয়ে যাই সেই দেশে ॥

—ফুলশর

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কীর্তন

১

ছিল বসি সে কুসুমকাননে ;
আর অমল অরুণ উজল আভা ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়া সম হে),
ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি, অতুল গরিমা ভাসি ;
তার কপোলে শরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো),
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি—হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা ঘুমায়ে ছিল রে পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।

৩

তার সরল সুঠাম দেহ (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো) ;
যেন যা কিছু কোমল, ললিত, তা দিয়ে রচিয়াছে তাহে কেহ ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ, শরম, স্নেহ।

৪

যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে),
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি, সুমিলিত সমতান ;
যেন সজীব সুরভি, মধুর মলয়,
কোকিলকূজিত গান।

৫

শুধু চাহিল রে মোর পানে (একবার গো),
যেন বাজিল বীণা, মুরজ, মুরলী অমনি অধীর প্রাণে ;
সে গেল কি দিয়া, কি নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে, কে জানে॥

গীতার আবিষ্কার

১

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই করছে দিবারাতি ;
বলছে আমরা ভণ্ড, ভীরু, মিথ্যাবাদী জাতি।

হতাশ ভাবে তক্তার উপর পড়লাম গিয়ে শুয়ে,
দুইটি ধারে সরল রেখায় ছড়িয়ে হস্ত দুয়ে;
ভাবছি এটার মুখের মতন জবাব দেবো কি তা'—
ঠেক্‌লো হাত এক বইয়ের উপর, তুলে দেখি গীতা!
—ওমা! তুলে দেখি গীতা।

২

লাফিয়ে উঠলাম তক্তার উপর 'মাটাম ভাবে' সোজা,
ছটকে পড়লো মাথা থেকে অপমানের বোঝা।
এবার যদি নিন্দা কর, করবো কি তা জানি—
অমনি চাঁদের চোখের সামনে ধরবো গীতাখানি।
এখন বটে অপমানটা করছো মোদের বড়;
তবু একবার, চন্দ্রবদন, গীতাখানি পড়ো—
একবার গীতাখানি পড়ো।

৩

সকাল বেলায় অফিস গিয়ে গাধার মত খাটি,
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা দুখানি চাটি;
বাড়ি ফিরে—বন্ধুবর্গ জড় হলে খালি,
যাঁদের অন্নে ভরণ-পোষণ, তাঁদের পাড়ি গালি;
একা হলে (হায় রে গলায় জোটেও না দড়ি!)
বুঝি বা সে না-ই বুঝি—গীতাখানি পড়ি—
আমার গীতাখানি পড়ি।

৪

দেখি যদি গৌরমূর্তির রক্তবর্ণ আঁখি,
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' বলে ডাকি
পালাই ছুটি উর্ধ্বশ্বাসে, যেন বাঘে খেলে!
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে;

পিতৃপুণ্যে পৌঁছে বাড়ি, ঘরে দিয়া চাবি,
মালা জপি এবং আমার গীতার কথা ভাবি।
আমার গীতার কথা ভাবি।

৫

গীতার জোরে সচ্ছে ঘুঁষি, সচ্ছে কাম্‌টিটে,
গীতার জোরে, পেটে না খাই, সয়ে যাচ্ছে পিঠে।
করি যদ ধাপ্পাবাজি, মিথ্যে মোকর্দমা,
সয়ে যাবে,—গীতার পুণ্যে আছে অনেক জমা;
মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয় এ হেন,
মুর্গীর কোর্মার চেয়ে আমার গীতাই মিষ্টি যেন—
আমার গীতাই মিষ্টি যেন

(কোরাস)

গীতার মত নাইক শাস্ত্র, গীতার পুণ্যে বাঁচি—
বেঁচে থাকুক গীতা আমার—গীতায় মরে আছি ;
বাবা, গীতায় মরে আছি।

মানকুমারী বসু

শীতকালের পত্র

শ্রীমতী ন—

কি লিখিব বিধুমুখি!
তব সুখে আমি সুখী,
জানিছ তা চিরদিন, কি কাজ কথায়

তবে কিনা পৌষমাস,
তাহাতে পশ্চিমে বাস,
এত শীতে চিঠি-ফিটি লেখা বড় দায়।
আমার দুখের কথা
কি লিখিব স্নেহলতা!
দারুণ পাহাড়ে' শীতে ফেটে গেল কায়;
জানিতেছ অতঃপর,
অ-গাউন কলেবর,
পায়ে নাই বুট মোজা, ক্যাপ না মাথায়।
বিধি পাঠাইলা ভুলে
বাঙালী হিন্দুর কুলে,
পাথর লোহায় গড়া যাহাদের নারী;
আমরা তো ননী-দলা,
কাজ নাই খুলে বলা,
মা, পিসি, ঠাকু'মা সম আমরা কি পারি।
পরম গুণের নিধি
শ্রীমতী বামুনদিদি
গরম গরম দুটি দিবেন রাঁধিয়া—
কপালে তা লেখা নাই,
তাই যেতে হয়, ভাই,
নিঠুর রন্ধন-শালে 'অন্নদা' স্মরিয়া!
যদি মোরে ভালবাস,
ত্বরা তুমি হেথা এস!
তোমা বিনে এত শীতে টিকে না পরান;
এ বাহুতে তুমি শক্তি,
এ হৃদয়ে তুমি ভক্তি,
এ শীতে তুমিই মম শাল আলোয়ান।
এস চলি সুবদনে!
লেপ গায়ে দুই জনে
খুলি হৃদি খুলি মুখ জাগি সারারাতি;

ছারপোকা ভরি প্রাণ
শোণিত করিয়া পান
আমাদের মহত্বের করুক সুখ্যাতি

২

আমি তাই ভাবি নিত্য,
কি সুখে ভ্রমিতে তীর্থ
তুমি, ভাই, চলি গেলে হরিদ্বার কাশী ?
কি বলিব কি যে দুঃখ,
তুমিই হলে কি মূর্খ ?
কোটি-তীর্থ-ফল পেতে এখানে যে আসি।
ঘোমটায় মুখ ঢেকে
(চাঁদেতে নীরদ মেখে !)
এখানে হত না সদা লুকাতে অন্দরে ;
ফিরিতাম দুই জনে
শৈলে শৈলে বনে বনে,
নির্ঝরে, তটিনী-তটে, নীরব কন্দরে।
হা ধিক্ ! তোমার চিত্তে
এর চেয়ে কোন্ তীর্থে
আশার সুসার কিবা, কিবা পুণ্য মিলে ?
অনিত্য জগৎ, ভাই,
সুখহীন সর্ব ঠাঁই,
কি হইবে রেলওয়ে ভ্রমিতে লাগিলে ?
নিত্য-সুখ চিরতরে
এখানে বিরাজ করে,
দোলে মানবের পিঠে যশ-পুণ্য-ছালা ;
অদৃষ্টে সৌভাগ্য ফোটে,
নিত্য দুপহরে জোটে
খিচুড়ি পায়সে ভরা খাগড়াই থালা।

বেশি কথা কাজ নাই,
'পয়সা' অনিত্য, ভাই,
'রিটার্ণ টিকিট'খানি ছিঁড়ে ফেলে দাও ;
কাব্য-রস, গব্য রস,
দেহে পুষ্টি, নামে যশ,
আইস, এসব সুখ ভোগ করে যাও।

৩

শুনিলাম, এই মাসে
যাবে তুমি পতি-পাশে
করিতে গৃহিণীপনা—ধিক্ মূর্খতায় !
এত শীতে নারী কেবা
করে পতি-পদ-সেবা,
পৌষ মাসে ঘরকন্না কে করিতে চায় ?
শাস্ত্রের বচন, সতী—
শীতকালে যার পতি
রাঁধেন বাড়েন নিজে প্রফুল্ল অন্তরে ;
সেই ধন্যা নারীকুলে,
লোকে তারে নাহি ভুলে,
চির-সোহাগিনী জায়া শিবদুর্গা-বরে।
ছুতো পেলে মুখ-নাড়া,
মনে মনে 'লক্ষ্মীছাড়া',
সে অনিত্য আবদার দূর করি দাও ;
ত্বরা করি এস চলে
আমারি লেপের তলে,
কিছুদিন নিত্যসুখ ভোগ করে যাও।
পত্রপাঠমাত্র, রাণী,
লয়ে এস মুখখানি,
অধরে সে হাসি এনো, নয়নে সে দিঠি ;

কথা এনো মিঠেকড়া
(অভিমানে সুর চড়া),
আঁচলে বাঁধিয়া এনো সে-ক'খানি চিঠি।
এ শীতে পাহাড়ে' দেশে
একেলা নিরীহ বেশে
নিতান্ত নীরব হয়ে থাকা বড় দায়;
তাই পত্র ডাকে দিয়ে
পথ-চাওয়া আঁখি নিয়ে
রহিলাম লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায়॥

তোমারি মেজদিদি

কামিনী রায়

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ

অন্ধকার মরণের ছায়
কতকাল প্রণয়ী ঘুমায়?
চন্দ্রাপীড়, জাগো এইবার।
বসন্তের বেলা চলে যায়,
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গায়,
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।
মাস বর্ষ হল অবসান,
আশা-বাঁধা ভগন পরান
নয়নেরে করেছে শাসন;
কোনদিন ফেলি অশ্রুজল
করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—
এই তার আছিল যে পণ।

আজি ফুল মলয়জ দিয়া,
শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর হিয়া,
পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে ;
নবীভূত আশারাশি তার
অশ্রু-মানা শোনে নাকো আর—
চন্দ্রাপীড, মেল' আঁখি এবে।

দেখ চেয়ে, সিক্তোৎপল দুটি
তোমা-পানে রহিয়াছে ফুটি,
যেন সেই নেত্রপথ দিয়া
জীবন, তেয়াগি নিজ কায়,
তোমারি অন্তরে যেতে চায়—
তাই হোক, উঠ গো বাঁচিয়া।

প্রণয় যে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড়, ঘুমায়ো না আর—
কানে প্রাণে কে কহিল তার,
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।

মৃত্যু-মোহ অই ভেঙে যায়,
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ দরশন ;
একদৃষ্টে কাদম্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—
'এ তো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।'

নয়ন ফিরাতে ভয় পায়,
এ স্বপন পাছে ভেঙে যায়,
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া।

আঁখিদুটি মুখ চেয়ে থাক্,
জীবন স্বপন হয়ে যাক্,
অতীতের বেদনা ভুলিয়া।

"আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর
জাগরণে আছে মিশি।
আঁধারে মুদিনু আঁখি,
আলোকে মীলিনু তায় ;
মরণের অবসানে
জীবন জনম পায়।"

"জীবন ?—জীবন, প্রিয় ?
নহি স্বপনের মোহে ?
মরণের কোন্ তীরে
অবতীর্ণ আজি দোঁহে ?"

রজনীকান্ত সেন

ফুল

তোমার নাম, পোড়ামুখী, সূর্যমুখী ফুল !
হারে হা অবোধ মেয়ে,
কার পানে আছ চেয়ে,
এখনো এখনো তোর ভাঙিল না ভুল !

সুগন্ধ-সৌন্দর্য-হীনা,
তুই যে ভিখারী দীনা,
তোর যে মোটেই নাই এক কড়া মূল।
জন্মি' ভিখারীর ঘরে
কে এমন আশা করে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে হইবি আকুল।

তোর নাম, পোড়ামুখী, সূর্যমুখী ফুল!
জ্বলন্ত পিপাসা বুকে,
কোন কথা নাই মুখে,
হৃদয়ে হৃদয়ে খেলে তরঙ্গ তুমুল।
নাই কান্না নাই হাসি,
স্থিরদৃষ্টি সর্বগ্রাসী,
কেবল নয়নে ভাসে বাসনা বিপুল।
যাস্‌না কাহারো কাছে,
যা আছে তা মনে আছে,
নীরবে হৃদয়গঙ্গা গাহে কুল্‌ কুল্‌।

পোড়ামুখী সূর্যমুখী, এত কি রে দায়?
তুই একরতি মেয়ে,
কেন তার পানে চেয়ে?
তারে না দেখিলে যেন তোর প্রাণ যায়!
তুই এক কণা তুচ্ছ,
সে যে কতগুণে উচ্চ,
তারে পাবি কাছে যাবি কোন্‌ তুলনায়?
অনন্ত পিপাসা তার,
জ্বালামুখ অনিবার,
সমুদ্র শুষিয়া যায় তার পিপাসায়।

পোড়ামুখী সূর্যমুখী, এত কি রে দায় ?
তারে না পাইলে তোর
এত কি যাতনা ঘোর ?
তার যে হৃদয় ভরা অনলশিখায়।
সে অনলে ঝাঁপ দিতে
এত কি বাসনা চিতে,
পুড়িয়া মরিবি তবু খেদ নাই তায়।
ক্ষুদ্র প্রাণে এত আশা,
তাতে এত ভালবাসা,
একটু ভাঙে না বুক পোড়া নিরাশায় ?

পোড়ামুখী সূর্যমুখী, এত কি রে দায় ?
কি যে তোর নাম ছিল,
কেবা এই নাম দিল,
এ নামে কলঙ্ক ভরা, শুনে লাজ পায়।
সূর্য-পানে আছ চেয়ে,
তাই রে অবোধ মেয়ে
তোর নাম সূর্যমুখী দশ জনে গায়।
এ কলঙ্ক মেয়ে হয়ে
কেমনে আছিস্ সয়ে,
ধন্য প্রণয়িনী তুই এ মর ধরায়।

তোর নাম, পোড়ামুখী সূর্যমুখী ফুল।
সে আছে অমরপুরে,
অতি উচ্চে অতি দূরে,
কত অর্ঘ্য রাজাদের সে যে আদি মূল ;
কেন তুই তারে চাস্,
নিজে নিজ মাথা খাস্,
আশার কি শেষ নাই, হলি কি বাতুল ?

সারাটা জীবন ভ'রে
আহা কি তপস্যা ক'রে
খোয়াইলি একেবারে দেহ মান কুল।

পোড়ামুখী সূর্যমুখী, এত কি রে দায়?
শত ঘৃণা অনাদর,
সদা ভাবে পর পর,
তবু তোর বুক ভরা তাহারি আশায়!
তুই যে ভিখারী দীনা,
তাই তোরে করে ঘৃণা,
আকাঙ্ক্ষা জানাস্ তুই তবু তার পায়!
এত অবহেলা পেয়ে,
তাচ্ছল্য ভ্রূকুটি খেয়ে,
একটু বিরাগ তোর জাগে না হিয়ায়?

পোড়ামুখী সূর্যমুখী কে বলে তোমায়!
এমন নিষ্কাম ব্রত,
অবিচল ধ্যানে রত,
অসীম অনন্ত প্রেম অমর আত্মায়।
কি অতুল ভালবাসা,
অটুট বিশ্বাস আশা,
ঢালিয়া দিয়েছ প্রাণ দেবতার পায়।
জানে সে দেবতা তার
ঘৃণা করে অনিবার,
তবু সে দেবতা তার, মুক্তি মাগে পায়।
সে বিনে এ ভবে আর
কেউ নাই আপনার,
হোক্ না সে যার খুশি যারে মন চায়।

সে তো তার অনুরাগী,
সে জানে তাহার লাগি
নিতি নিতি এসে রবি দেখা দিয়ে যায়।
সোনামুখী সূর্যমুখী অতুল ধরায়॥

প্রেমারঞ্জন

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি ;—
কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায়
মোহন-তূলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব,
যেদিকে ফিরাই আঁখি।
স্ফুটতর ঐ নভোনীলিমায়
উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায়
কুঞ্জভবনে পাখী।
দেহ হৃদয়ে পাই নব বল,
দূরে যায় যত ক্ষুদ্রতা ছল,
কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল
প্রাণে দিয়ে যায় মাখি'!
যেন তোমার পুণ্য পরশ
ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ,
বিবশ হইয়া থাকি॥

—বাণী

প্রমথ চৌধুরী

তাজমহল

সাজাহাঁর শুভকীর্তি, অটল সুন্দর!
অক্ষুণ্ণ অজর দেহ মর্মরে রচিত,
নীলা, পান্না, পোখ্‌রাজে অন্তরে খচিত।
তুমি হাস, কোথা আজ দারা সেকন্দর?

সকলি সদর তব, নাহিক অন্দর,
ব্যক্ত রূপ স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত।
প্রেমের রহস্যে কিন্তু একান্ত বঞ্চিত;
ছায়ামায়া শূন্য তব হৃদয়-কন্দর!

মুমতাজ! তাজ নহে বেদনার মূর্তি।
শিল্প-সৃষ্টি-আনন্দের অকুণ্ঠিত স্ফূর্তি॥

আঁখিতে সুর্মা-রেখা, অধরে তাম্বূল,
হেনায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী, রুমালে স্তাম্বুল,—
বাদ্‌শার ছিলে তুমি খেলার পুতুল॥

—সনেট-পঞ্চাশৎ

প্রিয়ম্বদা দেবী

হবে কি না হবে দেখা দুজনে আবার?
মৌনমুখ নতনেত্র অতিথি আমার,
অপূর্ব মাহেন্দ্রক্ষণে, নিঃশব্দগোপন
গোধূলির মত তব স্বপ্ন-আগমন!

একবার আঁখি তুলে সে কোন্ আলোক
ঢালিলে হৃদয়ে, চিত্তে ভরি ওঠে শোক
বিচ্ছেদে যাহার, অজ্ঞাতে নয়ন ভরে,
নির্বাক ব্যথায় ক্লান্তি আসে কণ্ঠস্বরে!
তুমি গেলে, এল রাত্রি ধরিত্রী আবরি,
শরতের শতদল পড়ে গেল ঝরি
অশ্রুবিগলিত হ্রদে, দ্রুত কুহেলিকা
সহসা করিল বিশ্ব গুপ্ত প্রহেলিকা
ছায়া-যবনিকা টানি', উত্তর পবনে
পাণ্ডুপর্ণ মৃত্যুশয্যা বিছাইল বনে!

থামিল মর্মরগান, বিহগকূজন
মধুপগুঞ্জন গেল ছাড়িয়া বিজন,
নিকুঞ্জতোরণ শীর্ণ শূন্য আলিঙ্গনে
বাঁধিতে নারিল আর সন্ধ্যার অঙ্গনে
পলাতক আলোকের শেষ রশ্মিলেখা,
তরু-অন্তরাল হতে নাহি দিল দেখা
কোন খণ্ড ক্ষীণ চাঁদ আঁধার নিবারি,
কাটিল বিনিদ্র নিশা, নেত্রে অশ্রুবারি,
স্বপ্নহীন; মৃত্যু-সম হিমবায়ু এসে
পরশিল তপ্ত তনু যবে রাত্রিশেষে
মূর্ছাহত করি ধীরে, অজ্ঞাতে তখন
উদিয়া আমার চাঁদ কৌতুকে কখন
প্লাবন করিল কক্ষ আলোকধারায়—
সে বারতা রুদ্ধ আঁখি জানিল না হায়!

৩

নেত্র মুদি করি ধ্যান চন্দ্রালোক-সম
কান্তি তব নিরাময়, করি গো ধারণা

খুলিয়া জাগ্রত আঁখি তপ্তস্বর্ণোপম
বালার্কপ্রভাব হৃদি, দীপ্ত অতুলনা !
মনে মনে করি গো কামনা তুই আমি,
বহুদূর দূরত্বের বিরোধ ভুলিয়া
একেবারে, মুগ্ধ সিন্ধু হয় যথা কামী
আকাশের, পূর্ণিমায় নয়ন মেলিয়া !
মেটে না দুর্লভ আশা, ছায়া লয়ে বুকে
শুধু আছাড়িয়া পড়ে তটান্ত শয়নে,
তরঙ্গ গর্জিয়া মরে, নীলনীর-মুখে
ক্ষুব্ধ ফেন, লুব্ধ হাসি, দুরাশা-চয়নে !
বসুধা লাগে না ভাল, বাসনা আকাশ,
প্রাণবায়ু ব্যর্থ, বিনা ভূমায় আভাস !

৪

মুগ্ধ কভু চাহি, কভু চাহি না আবার—
সমুদ্রের স্ফীতবক্ষ উদ্দাম জোয়ার
যেমন নামিয়া যায়, পরিশ্রান্ত বারি
তরঙ্গবিহীন স্তব্ধ আপনা নিবারি
নিষ্ফল আবেগে, মিলায় তটের কোলে
দিগন্তসীমায়, উর্ধ্বে দূর শূন্যে দোলে
পূর্ণ চাঁদ, উদাসীন তরল হৃদয়ে
প্রতিবিম্ব চূর্ণ হয়ে পড়ে লজ্জা ভয়ে !
ফিরে আসে জীবনের প্রভাত-আলোক,
উষার অলকমুক্ত শিশির-গোলক
মুক্তা হয়ে দেখা দেয় অদৃশ্য অতলে,
সন্ধ্যার সিন্দুর-রাঙা অনুরাগ জলে
বারিধারে, নক্ষত্রের চুম্বনবিলাসে
রোমাঞ্চসিঞ্চিত তনু, নেত্র, মুদে আসে।

৫

কেমনে আনিবে বন্ধু বসন্ত নূতন
আবার জীবনে ? এ যে শরতের দিন

শেষ প্রায়, হেমন্তের হয় আগমন,
মুগ্ধপিক-রুদ্ধকণ্ঠে কুহুধ্বনি ক্ষীণ,
কহে বিদায়ের বাণী, পূর্ণ চিরন্তন
আকাশনীলিমা আজি ধূসরে নিলীন।
হিমহ্রদে কোকনদ বিলুপ্তমণ্ডন,
স্নিগ্ধ শ্যাম দূর্বাদল পাণ্ডুর মলিন!
অশোকের রক্ত স্মৃতি করিয়া খণ্ডন
ক্ষীণ বৃন্ত হতে মৃদু শেফালি বিলীন।
ফুল্ল শুধু শুভ্র কুন্দ যোগীর মতন;
হেরিয়া হিমানী পুষ্প বর্ণগন্ধহীন
মধুপ আসে না কাছে, ভ্রান্ত প্রজাপতি
আসিয়া ফিরিয়া কভু যায় ক্ষিপ্রগতি!

৬

এ দিনে চম্পক কোথা স্বর্ণপরিহাস?
অশোকে উজ্জ্বল উষা, অনল পলাশ
অস্তাচলে, প্রবালের চন্দন-বিলাস
শুষ্ক পত্রে, কোথা সেই আতর-আশ্বাস
গোলাপের, ঘনীভূত যাহা স্তরে স্তরে
তরুণী ইরাণী বধূ রাখে মর্ম ভরে!
ব্যাকুল বকুলাবলি পড়িয়াছে ঝরে,
কদম্বের বিদ্ধ বক্ষ আতঙ্কে শিহরে,
কোকিল নিখিল-ছাড়া, নূপুরগঞ্জন
নাহিক মরাল, গেল ভ্রমরগুঞ্জন,
চটুল সোহাগে মুগ্ধ নাচে না খঞ্জন,
ময়ূর বিরুত ক্লান্ত, কলাপ রঞ্জন
লুক্কায়িত, কাশশুভ্র তুলিছে চামর,
বলাকা উড়িয়া চলে, লুপ্ত নীলাম্বর!

৭

কামিনী ঝরিয়া গেছে যামিনী-বিদায়ে,
মুক্ত দল উড়ে চলে তীব্র শীত বায়ে

হিমশুভ্র, কলহংস মানসের পথে
করেছে প্রয়াণ, কোনমতে মনোরথে
নূতন গড়িতে পারি নাহি সে ক্ষমতা ;
ভগ্ন যাহা তারি 'পরে একান্ত মমতা !
অভ্যস্ত ভুবন ছাড়ি করি না কামনা
ইন্দ্রের নন্দনবন, হায় দ্বিধামনা
বৈকুণ্ঠের পূর্ণ ভোগে, চিরচন্দ্রালোক
অলকায় শ্রান্তি মানি, কৈলাস অশোক
দ্বন্দ্বময় হয় পাছে রুদ্র অনুরাগে,
আশঙ্কা-নিরত বক্ষে তাই নাহি জাগে
সে স্বর্গ-বাসনা, ব্রহ্মলোকে নির্বাণের
সাধনা সম্পূর্ণ আজো হয়নি প্রাণের ॥

—অংশু

প্রভাত অরুণালোকে চেয়ে স্তব্ধ দূর আম্রবনে,
মনে হয় কি রহস্য রেখেছে গোপনে
শিকড়ে শাখায় পত্রে মুকুল-মালায়।
প্রাণের অস্ফুট অর্ঘ্য, পূজার থালায়
এখনো দেয় নি তুলে ধ'রে,
জেগে আছে প্রহরে প্রহরে
প্রতীক্ষিয়া শুভলগ্ন অঙ্গে আর মনে।

অকস্মাৎ একদিন বসন্তের প্রমত্ত পবন
আলিঙ্গনে আন্দোলিয়া বন উপবন,
ফুটাইবে মুকুলের অর্ধস্ফুট হাসি,
স্পর্শের রহস্যমন্ত্রে সৌরভের রাশি
দেবে খুলি, মুকুলে গুটিকা,
তরুশীর্ষে যৌবনের টিকা,
সর্বাঙ্গে ভরিবে তার রসাল প্লাবন।

আমিও তেমনি আছি অন্তরের চিরতরুণিমা
প্রতীক্ষিয়া, স্পর্শে যার সকল ম্লানিমা
দূর হবে একেবারে ছাড়ি দেহ-মন,
ইন্দ্রাণীর তনুদেহে অনন্ত যৌবন।
নিশীথের সে কি নিদ্রাসম,
অথবা সে দিবা দীপ্ত-তম ?
চিত্তলোকে চেতনার জাগ্রত মহিমা ॥

—চম্পা ও পাটল

অতুলপ্রসাদ সেন

মিছে তুই ভাবিস্ মন !
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, আজীবন !

পাখীরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে ;
নাই বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।

ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে ?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি' বিতরণ।

মনদুখ চাপি' মনে হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস্ প্রাণের বেদন।

আজি তোর যার বিরহে নয়নে অশ্রু বহে,
হয়ত তাহার পাবি দেখা গানটি হ'লে সমাপন ॥

—গীতিগুচ্ছ

রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা ?
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা !
তোলা ফুলের খালি বোঁটায় ছোঁয়ার গন্ধ মাখা !

ভেবেছিলাম ভোরে উঠে ভরব ফুল-ডালা,
কারও পায়ে দিব অর্ঘ্য, কারও গলায় মালা ;
কোথা হতে এল রে চোর সকল চোরের আলা।

ছেঁড়া পাপ্‌ড়ি ধ'রে ধ'রে গেলাম বহু দূরে,
পথের মাঝে পথ হারিয়ে ঘরে এলাম ঘুরে ;
কে জানে রে সে অজানা কোন্ অজানা পুরে !

দেখেছ কি সেই চোরারে, শুধাই সবারে ;
কেউ বা বলে খোঁজো তারে বনের মাঝারে ;
কেউ বা বলে পাবে তারে নদীর ওপারে।

চাইত যদি দোরে এসে আমার কুসুমগুলি,
উজাড় ক'রে দিতাম তারে আপন হাতে তুলি'।
পারত কি চ'লে যেতে,—আমায় যেতে ভুলি' ?

—গীতিগুচ্ছ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাহাড়িয়া

জেগে-ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে পাখী,—
একটি পাখী, না-দেখা পাখী, কানে-শোনা পাখী !
উত্তর-পাহাড়ের নিঃশ্বাস-মন্ত্র আগ্‌লে রাখে
কুয়াসার জাদু দিয়ে ,
পাখীকে চিনতে দেয় না, দেখতে দেয় না !

যে দিকে বেড়া দিয়েছে সূর্যমুখী ফুলের গাছ,
সে দিক থেকে সাড়া পেয়ে আসে সুর !
যেখানটায় পাথর ভিজিয়ে ঝরে জল,
সে পথ বেয়ে আসে ভোরে ভোরে গান !

রূপ থেকে স্বতন্তরা, বুকভরা, ঘুম-ভাঙানো ভোরাই দিয়ে
পাই আমি পাখীকে,
পেয়ে যায় তাকে হিমে-নিথর উত্তর আকাশ,
পায় কতদূরের নিস্পন্দ-নীল পর্বত ;
পেয়ে যায় শীত-কাতর একা হরিণ
রাজোত্থানে ধরা !

আমারি মতো পরদেশী যে,
আর যার মধ্যে কোনো স্বপ্ন, কোনো কবিত্ব নেই,
সেই আমার গোবিন্দ খানসামা—
সে শুনেছে ভোরে উঠে
গয়লা-পাড়ায় নেমে চলার পথে ;
রোজই শুধোয় সে পাখীর খবর,
ফাঁদ পাতার মতলব দেয় সূর্যমুখী-বেড়ার ফাঁকে !

ঝরনা যেখানে সরু একগাছি আলোর মালা দিয়ে
বেড়ে নিয়েছে একখানি পাথর,
উষার এই মনের পাখী উড়ে বসে কি সেইখানে ?
রাত থাকতে পায় কি চায়ের পরশ
তার শিশিরে-মাজা নিকষ পাষাণ ?
বরফ-গলা নতুন নদী—উছ্‌লে পড়ে, উল্‌সে চলে—
সে কি ধরে নিয়ে যায় পিয়াসী পাখীর রূপের ছায়া ?

যুগান্তরের শীতের সকাল অকাল-বসন্তের ভোর রাতে
পেয়েছিল যাকে
সেদিনের ঝরনাতলায় নতুন ঝাউবনে,
কোথা হতে এল সে পাখী কে জানে তা ?
আজকের ভোরাই ধ'রে যে পাখী করে আসা-যাওয়া
ঘুম ভাঙানোর বেলায়
অস্বচ্ছকাচমোড়া আমার এই খোপটার বাইরে,

সে কি ঝরনার পাখী, না ঝাউবনের, না উপর-পাহাড়ের,
না ওই পাহাড়তলার চা-বাগিচার নীচের জঙ্গলের ?
সে কি থাকে একলা কোনো পাথরের ফাটলে ;
না সে বাসা নিয়েছে আমাদের সঙ্গে কাচমোড়া ঘরেই ?
ঘরের কোণে কাচের বুদবুদে ধরা নিভন্ত-বাতি,
সে কি জেনেছে পাখীকে ?
কাজল দিয়ে শেষরাতে কেন লিখছে সে
দেয়ালের ভিতর-দিকটায়
রাত-পোহানো পাখীর কালো পাখনার
ইসারা একটু ?

প্রমথনাথ চৌধুরী

আজ নিশি হয়ো না প্রভাত

সেইদিন গিরিরাজ-গৃহে,
দ্বিপ্রহরা নবমীর অর্ধচন্দ্র নিশি মহোৎসবে
মেঘসৃষ্ট সুখস্বপ্নে মগ্ন ছিল শারদীয় নভে ;
পৌরজন সুপ্ত ছিল হর্ষশ্রান্ত দেহে ;
আসন্ন বিচ্ছেদ-ত্রাসে মহিষী মলিনা
একাকিনী জাগি উদাসীনা !

সোহাগিনী মা'র উমা-শশী
মণিদীপ্ত হর্ম্যকক্ষে সুশয়ান মর্মর-পালঙ্কে ;
ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাবেশে, জননীর দুরু দুরু অঙ্কে
পুলক আনিতেছিল চকিতে পরশি,
আচম্বিতে চাহি দেবী পার্বতীর প্রতি
উচ্চারিলা অপূর্ব ভারতী—

"আজ নিশি হয়ো না প্রভাত!"
পাষাণনিলয়-মাঝে মুক্তি লভি মমতা-ভাণ্ডার
অবোধ প্রার্থনাবাণী মহাশূন্যে করিল প্রচার;
করুণ প্রত্যাশা ত্রস্তে ত্যজি অশ্রুপাত
আবেগে করিতেছিল পথ নিরীক্ষণ,
চরাচর বধির যখন!

হিমালয়ে উদিল তপন;
শতধারে রক্তরশ্মি উথলিল পরিহাস সম;
ধেয়ে এল লক্ষ ছটা মাতৃবক্ষে হানিয়া নির্মম,
দেখিবারে বিজয়ার ম্লান আয়োজন।
তনয়ারে তুলি দিয়া বিদায়ের রথে,
ফিরিতে,—মূর্ছিলা রানী পথে।

সেই যুগ এখন কোথায়?
আজি অভিজ্ঞতা-তন্ত্রে নিখিল কি হয়নি শাসিত;
বাধা লভি পদে পদে হয় নাই তৃষা নির্বাসিত;
ভাঙে নাই এতদিনে মায়াস্বপ্ন, হায়
নিত্যনব শতপাকে বেদনা-বন্ধন
কালবৃদ্ধ করে নি ছেদন?

আজো আছে বধিরা রজনী!
নিদ্রিতা দুহিতা অঙ্কে, মাতা আজো চেয়ে আত্মহারা,
ভাবেন,—এ স্নেহালয় ছেড়ে যাবে প্রাতে মোর তারা!
অজ্ঞাতে কম্পিতকণ্ঠে সাধেন জননী;—
প্রভাত হয়ো না নিশি, তুমি গেলে সতী,
নিভে যাবে মোর গৃহ-জ্যোতি;

উঠে তূর্ণ নির্দয় তপন।
কোনদিন নিত্যকর্মে ঘটে নাই ক্ষণিক ব্যাঘাত;
কোথাও কাহারো বক্ষে লাগে নাই একটি আঘাত;
কেহ নাই ঘটাতে এ তুচ্ছ অঘটন;
নিষ্ফল কামনা ফিরি চিরদৈন্য মাঝে,
মর্মে মর্মে মরে শুধু লাজে।

তবু তাই নিখিল-নির্ভর
চিরদিন সঞ্জীবিত, মৃত্যুশীল দীন মর্ত্যোপরে।
আকুল ত্রাসিত সেই শান্তিমন্ত্র মাতৃকণ্ঠস্বরে,
লাঞ্ছিত বঞ্চিত ক্ষুব্ধ দলিত জর্জর,
নাহি জানি' নাহি মানি' আপন ক্ষমতা
উৎসারিছে স্বতঃ ব্যাকুলতা॥
—গীতিকা

ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

ী-সন্ধ্যা

সন্ধ্যা আসে অলক্ষিতে অতি ধীরে ধীরে
নয়নে নিদ্রার মত! নভ, নদী, মাঠ,
তরুর শ্যামল রেখা সাঁঝের তিমিরে
গেছে মিশি। স্তব্ধ হয়ে আকাশ বিরাট
করিছে কাহার ধ্যান। নক্ষত্রের আলো
স্বপ্ন-মগ্ন যোগী-মুখে হাসির মতন
ফুটিয়া উঠিছে ধীরে। জমিয়াছে ভালো
মণ্ডুক ঝিল্লীর কণ্ঠে সান্ধ্য-সংকীর্তন
নভ-প্লাবী। গ্রামখানি করিছে মুখর
শিব-ভক্ত শিবাদল গাল-বাদ্য করি'।
ঊর্ধ্বনেত্রে ভক্তিভরে জুড়ি দুটি কর
পল্লীসতী সন্ধ্যারতি করিছে সুন্দরী।

সহসা অশথ-শিরে মূক মনোরমা
দেবতার আশীর্বাণী ঢালিলা চন্দ্রমা ॥

কনারক

এ কার কনক-রথ বিচিত্র সুন্দর
বিরাজে সাগর-কূলে পূরব প্রান্তরে
গগন-চুম্বিত-চূড় ? এখনো ঘর্ঘর
চতুর্বিংশ চক্র তার বালুকা-চত্বরে
তুলে নাই ; পাদমূলে এখনো ফোটে নি
শিশিরাক্ত পদ্মদল অর্ধ-বিকশিত ;
অঙ্কে রাখি' বেণু বীণা মৃদঙ্গ ললিত
মূর্ছনা তরুণী-কুল এখনো তোলেনি ;
কক্ষে কক্ষে কেলি-পরা রতি-কুশলিনী ;
অরুণ-চালিত মরি দৃপ্ত তুরঙ্গিণী
সমুদ্যত যাত্রা তরে শূন্যে তুলি' খুর—
প্রভাতে আসিবে যেই রথী সুচতুর
শূন্য সিংহাসনে, বুঝি অমনি সে রথ
ছুটিবে ঘর্ঘর-নাদে পূর্ণ-মনোরথ ॥

গোধূলি

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

বাঁশির সুর

আমি জানতেম না যে বাঁশি আমার
বাজবে এমন সুরে ;
এমন গানের শিখা উঠবে কেঁপে
প্রাণের গোপন পুরে !
যতন ক'রে আপন হাতে নয়কো এ তো গড়া ;
বাঁশির হাটে নিইনি বেছে, দিইনি কানা-কড়া ;
জীবন-পথে প'ড়ে-পাওয়া কুড়িয়ে-নেওয়া দৈবে ;
ভয় ছিল তাই এও কি আমার প্রাণের গানটি কইবে !

শুধু খেলার ছলে তুলেছিলেম
ছুঁয়েছিলেম অধরে,
সুরের বান যে ছুটল ডেকে
কোথাও সে আর না ধরে।
চমকে উঠে বাঁশির সুরে পরান হল স্তব্ধ—
এমন ভুবন-ভুলানো সুর আমার বাঁশির শব্দ!
একি আমার আপন অধর ?
লাগছে মনে ধন্দ ;
বাঁশির মাঝে বন্দী সুরের
কাটল কঠিন বন্ধ!
একি আমার অযতনের
হেলাফেলার বাঁশি ?
জীবন মরণ জুড়িয়ে দিল
ছড়িয়ে সুধারাশি!

কে জানে গো কেমন ক'রে মোর অধরে লাগল ?
কোন্ সে পরশমণির ছোঁওয়া মানিক হয়ে জাগল!
কোন্ সে মহামন্ত্র গেল বাঁশির কানে গুঞ্জরি ?
সুরের ফুলে ভারে ভারে উঠল বাঁশি মুঞ্জরি!
কার গুণে যে বাজল বাঁশি
কেই বা তাহা জানবে ?
লক্ষ যুগের লুপ্ত কথা
কেই বা মনে আনবে ?

ফুলের পর্ণপুটের মত টুটল সকল বাধা ;
জনম জনম এ বাঁশি কি আমার সুরেই বাঁধা!
অধরখানির পরশ-রসে
কালের পাষাণ গলল,
লক্ষ যুগের সঞ্চিত রস
ঢেউ খেলিয়ে চলল।

এক জীবনের পুলকরাশির
কতই বা সে মাত্রা!
সৃজন-উষা হতে যেন
আনন্দের এই যাত্রা।

কেবল মনে উঠছে আজি বাজল বাঁশি বাজল,
কোন্ সুদূরের উষার আলোয় পরান আমার সাজল!
এ নয় বাঁশের গড়া বাঁশি
নয়কো জড়ের পুঞ্জ,
সুখের দুখের স্পন্দে জাগা
দেহ-মনের কুঞ্জ।
বিশ্বভুবন সাথে গাঁথা তবু সবার বাড়া,
অধরখানি ছুঁতে ছুঁতে তারায় জাগায় সাড়া।
এ বাঁশির সুর যায় না বরে কাঁপিয়ে হাওয়ার ঢেউ,
ভাবের তনু কোথায় কাঁপে বুঝতে নারে কেউ।
ওগো আমার সাধের বাঁশি
আমার পরান-প্রিয়া,
সকল আকাশ ভরবো আমি
তোমার ও সুর দিয়া।
মোদের বিশ্ব জুড়ে কোথাও রইবে না পাপলেশ,
তোমার সুরের নাই সমাপন আমার প্রাণের শেষ॥

—একতারা

দেবতার আবির্ভাব

ছি ছি! তব মিছে অভিমান;
কিছু তো রাখি নি ঢাকি, একটুও নাহি বাকি
যা ছিল তা সঁপিয়েছে প্রাণ।

এ সাতমহল মোর পুরী,
কক্ষে কক্ষে কত কি যে সাজায়ে রেখেছি নিজে
কি ঐশ্বর্য কত না মাধুরী !

বসন্ত শরৎ বরষায়
নব নব ফুল ফুটে সংগীতের ধারা ছুটে
দিনে রাতে প্রদোষে উষায় ।

হেথা তুমি রানী একেশ্বরী,
লীলা না তিলেক টুটে অবাধ পরান ছুটে
রেখেছি সে আয়োজন করি ।

সুখ চাও আছে সুখ ফুটি
রাঙা গোলাপের ফুলে, কাঁটা বাছি দিব তুলে,
মোহে প্রাণ পড়িবে যে লুটি ।

উদাস করুণা চাহ প্রাণে ?
সদল যূথীর দলে মালা গাঁথি দিব গলে
প্রদোষের পাপিয়ার তানে ।

ঐশ্বর্য মহিমা ভালো লাগে ?
রক্ত হৃদি-পদ্মদলে চরণ রাখিও ছলে,
মনোভৃঙ্গ গুঞ্জে অনুরাগে !

হায়রে অবুঝ নারী-হিয়া !
সব পেয়ে তবু বলো কেন আঁখি ছলছলো,
সবই যেন গেছে ফাঁকি দিয়া !

এ সাতমহল পুরী মাঝে
কোথা কোনো বাধা নাই তোমারি সকল ঠাঁই
যতখানি আলোতে বিরাজে ।

আঁধারের বুকের ভিতরে
পড়ে আছে এক ধার— কেবা খোঁজ রাখে তার—
জীর্ণ ঘর রুদ্ধ চিরতরে ।

নাই বা চাইলি তার পানে ;
এত আলো হাসি গান এত অফুরন্ত প্রাণ
ভুলবি কি আঁধারের টানে ?

অনাদৃত ঢাকা নিজ লাজে,
যুগান্তের ধূলিরাশি তারে ফেলিয়াছে গ্রাসি,
সে তোর লাগিবে কোন্ কাজে ?

কিছু নাই কিছু নাই তথা ;
আঁধারের ভরি বুক এক সে অনাদি দুখ,
চিরমূক তার মহাব্যথা !

ক্লান্ত দীপ নিভে নিভে জ্বলে ;
একটি বরণ-ডালা, অচেনা ফুলের মালা
কে গেঁথেছে ? কে পরিবে গলে ?

এত রত্ন এত ফুলহার
সব কোথা গেল ভেসে, অনাসৃষ্টি সাধ শেষে
লক্ষ্মীছাড়া মালা পরিবার !

ফুল নয়—অশ্রুর তুষার,
যুগান্তের বুক-চেরা মহাব্যথা দিয়ে ঘেরা,
পরশে জগায় হাহাকার ।

ও মালা যে আগুনের শিখা,
সুখ-শান্তি হবে ছাই, মনে হবে শুধু চাই
দিগন্তের ওই মরীচিকা !

তবু চাই তবু ওই মালা !
অশ্রু বহে ক্ষতি নাই একমাত্র ওরে চাই
দোহে প্রাণে মহা-অগ্নি-জ্বালা !

কিছু নাহি অদেয় তোমায়,
এই মহা ব্যাকুলতা ব্যথা লাগি এই ব্যথা
এ যে প্রাণে সহা নাহি যায় !

অযাচিত দেছি সুখভার ;
আজ শুধু দুঃখ তরে প্রাণ তব ঘুরে মরে,
কিন্তু সে যে অসাধ্য আমার।

কে খুলিবে চিররুদ্ধ দ্বার ?
মৌন মূক বাধাখানি শুনে না মিনতি-বাণী,
মানে না করুণ হাহাকার।

যুগ যুগান্তর গেছে কত ;
নব নব পান্থ এসে কেঁদে ফিরে গেছে শেষে
ব্যর্থ কর হানি অবিরত।

যার তরে গাঁথা এই হার,
সে যবে আসিবে শেষে, পরশ করিবে হেসে,
খুলে যাবে চিররুদ্ধ দ্বার।

এতদিন তোমার মাঝারে
তার আবির্ভাবখানি হয় নি হয় নি জানি
তাই ফিরে গেছ বারে বারে।

আজ তব আর্ত ব্যাকুলতা
দেখে মনে লাগে মোর শুভক্ষণ এল তোর
হয়তো বা এসেছে দেবতা।

আয় তবে কাছে আরবার,
ও তব পরশ-রসে রুদ্ধদ্বার যদি খসে,
তোরি কণ্ঠে পরাব এ হার॥

—একতারা

পানিপ্রাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাড়া

চেনা মানুষ বদ্‌লে গেছে, নাই সে চোখের চাওয়া ;
ফুরিয়েছে আজ তাহার 'পরে প্রাণের দাবি-দাওয়া !
স্বপ্ন মাঝে রই গো বেঁচে, বুকের ভিতর শুকিয়ে গেছে,—
নতুন সাগর নতুন সুরে জাগায় জোয়ার-হাওয়া।

ছিঁড়ে দে আজ বেসুরো বীন্, সংসারীদের গান ;
ভুলে যা মন ভোলা দিনের যেচে-সোহাগ-মান ;
পিছন-পানে চাস্‌নে ফিরে, উড়িয়ে দে তুই ছড়িয়ে ছিঁড়ে
নিন্দা-যশের আবছায়াতে আশার খতিয়ান।

বাঁধন যখন লাগত মধুর বেঁধেছিলাম বাসা,
বাঁশির সুরে বাসন্তী মোর করত যাওয়া-আসা,
আমার বাড়ি, আমার ভিটে কতই তখন লাগত মিঠে,
ফুটিয়ে দিত মুখখানি কা'র ঊষার ভালবাসা।

আকাশ-ভাসা অরুণ-আলো দেয় রে আমায় সাড়া,
দুনিয়ার এই ভরা হাটে আজ পেয়েছি ছাড়া ;
অভিমানীর তিরস্কারে ঘর জুড়ে আর রইব না রে,
ঢুকেছে আজ পাঁজর-তলে হাজার তোলাপাড়া।

চিনেছি তাই, জীবন-গাঙে কোন্ তীরে নীর ছোটে,
কোন্ বাঁকে তার চোরা-বালির পাহাড় জেগে ওঠে ;
থাকতে বেলা ভাসল ভেলা, আর না সাজে নোঙর ফেলা,
এই পারে এই ফুলের হারে বিষের কাঁটা ফোটে।

সোনার গড়ি' যে হাত-কড়ি পরেছিলাম হায়,
কে আজ তারে চূর্ণ করে আঘাত-বেদনায়—
ঘনঘটায় তড়িৎ আঁকা, কাঁপায় ধরা পাষাণ-পাখা,
ভাঙল রে মোর ধূলির দেউল ধূলির সীমানায়।

কে আছে গো কোন্ অরূপে, তারার চেয়ে দূর ?
হৃদ্‌গগনে উঠছে একি প্রতিধ্বনির সুর !
গভীর হতে গভীরতরে কে আমারে নীরব করে ?
দিন-যামিনীর কোন্ রাগিণী সুধায় সুমধুর ?

—শতনরী

মৃণু

আকাশ যখন আবীরে ভরিল, অথচ তারকা নাই ;
মেঠো পথ দিয়ে ধূলি উড়াইয়ে ফিরিল পাটল গাই ।
নধর চিকন বাছুরের গায় বিগলিত যেন মোম,
ক্বচিৎ উরুতে কভু বা উদরে শিহরি উঠিছে রোম ।

এমনি সময়ে একেলা বাহির হইল মৃণাল-বালা ;
এখনো তাহার গলায় দুলিছে বাসর-কুসুমমালা ;
চোখের কোনায় অতি সাবধানে নিপুণ তুলিকা ধরি'
ভুবন-ভোলানো রেখা কে টেনেছে পলাশ-বরনে মরি !

ভিন্ গাঁ হইতে নববধূ কেউ শ্বশুর-বাড়িতে এলে—
মৃণু হয় তার প্রাণের দোসর, বাঁচে সে মৃণুরে পেলে ;
কিশোরী বালিকা পাপড়ি মেলিছে, অথচ বালিকা সে—
যারেই শুধাই তারেই মৃণাল সবচেয়ে ভালবাসে ।

চুলটি বাঁধিতে কিলটি তুলিতে চুলবুলে হাত দু'টি—
খোকা-খুকি পেলে ও বুকে আগলি' হাসিয়ে পলায় ছুটি' ।
মৃণুর মুখের হাসিটুকু, তার কোঁকড়া কেশের রাশি—
নিমেষে নিমেষে নবরূপ ধরে, মৃণুরে দেখিতে আসি ।

ঘাসের উপরে বসেছে মৃণাল তালপুকুরের তীরে,
দোলে গোধূলির সোনার নিশান দূর বনানীর শিরে ।
ঢেউয়ের সোহাগে শতদল-বধূ নিরুপায় প্রাণে নাচে,
কোনোটি এখনো মুদিছে চক্ষু, কোনোটি বা মুদিয়াছে ।

মৃণু সে মোদের চাহিয়া চাহিয়া শ্যাম সলিলের পানে,
কি যেন একটা আকুলি-ব্যাকুলি পুষিল আপন প্রাণে ;

মিষ্ট গলায় গাহিয়া উঠিল পল্লীর প্রেম-গীতি—
অথচ মৃণাল বোঝে না কিছুই বঁধুর মধুর প্রীতি।

সরল গানের কথাগুলি লঘু বাণের মতন বিঁধে
চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দেয় ভাবগুলি সাদাসিধে।
লুকায়ে লুকায়ে দেখিনু প্রতিমা তালগাছতলা থেকে,
পিয়াস না মিটে যতবার দেখি চেয়ে চেয়ে দেখে দেখে।

শুষ্ক পাতার খস্ খস্ ধ্বনি—পলাল মৃণাল ধেয়ে—
রক্তিম সাঁঝে মুক্ত চিকুরে পলায় গ্রামের মেয়ে।
সে অনেকদিন দেখা হয়েছিল তালপুকুরের ঘাটে ;
আর আজ হেথা শাক বেচে মৃণু 'সর্ষে-জোড়ে'র হাটে।

অঙ্গে অঙ্গে যৌবনরাগ ছাপায়ে পড়িছে লুটে,
রঙ্গে ভঙ্গে রবির রশ্মি রোমে রোমে ফুটে উঠে ;
ধূলা ঝুলিতেছে রুক্ষ অলকে, আলুথালু কেশপাশ,
মৃণুকে দেখিয়া থমকি চমকি দাঁড়ানু তাহার পাশ,

কি দেখিনু চেয়ে মানসী প্রতিমা, অচল হইল আঁখি,
বুকের শোণিতে আশার ফলকে লইনু চিত্র আঁকি'।
বিধবা-বিবাহ ?   মৃণুকে বিবাহ ?—কাঁপিল হৃদয়-তলে ;
প্রাণ-পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চায় জ্বলন্ত প্রেমানলে।

চলিলাম গৃহে, গ্রাম-পথে ধূলা, সাপ গেছে পার হয়ে,
কোথাও পাখীর নখের ভঙ্গী চোখে পড়ে র'য়ে র'য়ে।
সমাজের ভয় ?   বিধবা-বিবাহ ?   মানিব কি পরাজয় ?
জ্বালিনু মৃণুর রতন-দীপটি জীবন-রজনীময়।

জ্বালাতন হয়ে গ্রামের খোঁটায় ছাড়িয়া গেলাম গ্রাম,
আঁধারে আলোকে, পথে ঘাটে মাঠে, মৃণালকে ঢাকিলাম ;
মুখপানে তার চাহিয়া দেখিনু কি দিব্য জ্যোতি ঢালা !
সমাজের শরে ঢাল সম হয়ে দাঁড়াল মৃণাল-বালা।

ঘর বাঁধিলাম পাহাড়ের গায় সাঁওতালদের সাথে,
পাটল একটি গাভী ক্রয় করি সঁপিনু মৃণুর হাতে ;
মৃণুর স্নেহের লতার তন্তু আঁকড়িল গিরি-শিলা ;
পা ডুবাতে মৃণু স্বচ্ছ নদীতে আনন্দ-লঘু-লীলা।

সোনার শলাকা বুনিত গগনে রেশমী বসন-স্তর,
অস্ত-তপন মুদিত নয়ন মহুয়া-বীথির 'পর।
সকাল হইতে মাঠে খাটিতাম, মৃণু যেত ভাত নিয়ে,
পরীর মতন মেয়েটি আমার অবাক রহিত চেয়ে।

চুড়ির সহিত জড়াইত হাতে মায়ের আঁচলখানি ;
মাঠের মাঝারে কেহ নাহি, শুধু আমরা তিনটি প্রাণী ;
চাহিতাম দূর দিগন্ত পানে—সোনায় ফেলেছে সোনা,
সার্থক ওগো উপত্যকায় কমলার আলিপনা।

খাইতাম ভাত, চাহিতাম ভুলে মৃণুর মুখের দিকে—
কি যেন মন্ত্রে জাদু করেছিল মৃণু মোর মনটিকে ;
মউল ফুলের মধুর গন্ধ, স্তব্ধ দ্বিপ্রহর,
ক্বচিৎ পাখীর করুণ কণ্ঠ পলাশ ফুলের 'পর।

ধরিতাম চাপি' মৃণুর হাতটি, হাসিয়া চোখের কোণে,
চুমু দিত মৃণু মেয়েটির গালে, মোদের স্নেহের ধনে।
মৃণুর প্রাণের নির্মল রস চোখের দুয়ার দিয়া
ঝরিয়া পড়িত মুকুতা-ধারায়—মৃণু সে আমারি প্রিয়া।

এত গুণবতী মাধুরীর নদী, তরুণী হেরি নি আর,—
হাসির চাইতে ভ্রূকুটিতে তার ঝরিত সুধার ধার !
আর একদিন, সেই শেষ দিন, তখন অনেক রাতি,
মেঘের লীলায় শিহরি' মিলায় রৌপ্য-চাঁদের ভাতি ;

ময়ূর-কণ্ঠি চেলীর মতন কুয়াসা গিরির শিরে,
সহসা উঠিয়া বাতায়ন-দ্বার খুলিয়া দিলাম ধীরে ;

হেরিনু মৃণুর বাহুটি বেড়িয়া ঘুমায়ে পড়েছে কেশ,
চুম্বন দিনু কপোলে তাহার, ভুলিনু লজ্জালেশ—

কি এক আবেশ-মুগ্ধ জীবনে হেরিনু কান্ত মুখ,
করপুটখানি ভরিয়া দিলাম বনফুল-যৌতুক ;
ঢলিয়া পড়িনু বক্ষে মৃণুর—জীবন-মরণ মৃণু ;
অধর-বাঁধুলি শোষণ করিয়া নূতন মদিরা পি'নু ;

মনে হল সেই বালক-কালের তাল-পুকুরের ঘাট,
মনে হল সেই বিজুলি-বিভাস 'সর্ষে-জোড়ে'র হাট।
ঢলিয়া পড়িনু অবশ অঙ্গে, জাগিল না মৃণু আর—
স্বপনের রূপ ধরিল আমার জাগরণ-অভিসার।

শেষ করি তবু, শেষ নাহি হয়, অফুরান তার কথা,
অফুরান সেই চোখের ভঙ্গী কালো কটাক্ষ-লতা।
এখনো, এখনো গভীর দুপুরে সেই সে গিরির গায়ে,
একেলা একাকী শালের বনের রৌদ্র-খচিত ছায়ে

হেরি তার মুখ, কণ্ঠ-কাকলী কানটি ভরিয়া যায়—
উত্তর থেকে হুহু হুহু ক'রে আসে এলোমেলো বায় ;
সুদূর মাঠের প্রান্ত উজলি' রূপার তাবিজ প্রায়
পাহাড়ে' নদীর চিকন রূপটি সে মোরে দেখাত হায়।

আজ আমি একা, কাছে নাই তুমি—কই, কোথা প্রাণাধিকে,
এইখানটিতে বেড়াতে যে তুমি এই পথে এই দিকে।
অলকের ফাঁদে রৌদ্র খেলিত, দুলিত মুক্তবেণী,
আসিতে লীলায় উড়িয়ে আঁচল, পেরিয়ে শালের শ্রেণী।
তোমার চুলের ফুলের গন্ধ আকুল করিত মন,
কখনো সোহাগ, কখনো শরম, কখনো কঠিন পণ।

ওই বাজে তার চাবির রিংটি—মুখে হাসি, চোখে লাজ ;
নীল পাহাড়ের পইঠায় বসি' পরো আজি ফুল-সাজ।

আনমনে ওগো ঘুমাইয়া পড়ি, ঘুম যে সুখের বাড়ি,
ঘুম ভেঙে দিয়ে সে ওই পালায়, পিছে ধাই তাড়াতাড়ি—
কই কই কই ? ওই যায় ওই—হায় হায় করে হাওয়া !
ঝলসিয়া যায় প্রাণের ভিতর—হারালে যায় কি পাওয়া ॥

—শতনরী

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

নাগকেশর

চিত্ততলে যে নাগবালা ছড়িয়ে ছিঁড়ে কেশের কেশর কাঁদছে—
অফুরন্ত অশ্রুধারায় সহস্রবার নাসার বেশর বাঁধছে ;
মানিক-হারা পাগল-পারা যে বেদনা বাজছে তাহার বক্ষে,
পলে-পলে পলক বেয়ে অলক ছেয়ে ঝরছে যাহা চক্ষে ;
দুঃখে-ভাঙা বক্ষে যাহা নিশ্বসিয়া সকাল-সাঁঝে টুটছে—
মহাকালের সোপানতলে নাগকেশরের ফুল হয়ে তাই ফুটছে !

মন-পাতালে যে নাগবালা রতন-জ্বালা কক্ষে ব'সে হাসছে—
দীপ্তি যাহার নেত্রপথে শুভ্র-শুচি দৃষ্টি হয়ে আসছে ;
মুক্তামানিক সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে উল্লাসে যে চঞ্চল,
উদ্বেলিত সিন্ধুসম দুলছে যাহার উচ্ছ্বসিত অঞ্চল ;
বিশ্বভুবন পূর্ণ ক'রে যে আনন্দ শঙ্খস্বরে উঠছে—
মহাকালের সোপানতলে নাগকেশরের ফুল হয়ে তাই ফুটছে।

—নাগকেশর

কলঙ্ক

বাতাবিকুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগচোর—
কলঙ্কী মন, চেয়ে দেখ্ আজি সঙ্গী মিলেছে তোর
দিবা অবসান, রবি হ'ল রাঙা,
পশ্চিমাকাশে নট্‌কনা-ভাঙা ;
সঙ্গহীনের যাহা কিছু কাজ সাঙ্গ করেছি মোর,
কুঞ্জদুয়ারে ব'সে আছি একা কুসুমগন্ধে ভোর !

আধফুটন্ত বাতাবিকুসুমে কানন ভরিয়া আছে,—
কি গোপন কথা গুঞ্জরি' অলি ফিরিছে ফুলের কাছে !
ফুটনোন্মুখ ফুলদলগুলি
পুলক-পরশে উঠে দুলিদুলি
গন্ধভিখারী সন্ধ্যার বায় ফুলপরিমল যাচে—
সঙ্কোচে নত পুষ্পবালিকা—অতিথি ফিরে বা পাছে !

বেলা বয়ে যায়, সন্ধ্যার বায় আসি' কহে বার বার,
সন্ধ্যা হয় যে অন্ধ কুসুম—খোলো অন্তর-দ্বার !
মুকুলগন্ধ অন্ধ ব্যথায়
কুঁড়ির বন্ধ টুটিবারে চায়,
লুটাইতে চায় সন্ধ্যার পায় রুদ্ধ আবেগভার,
বিকাইতে চায় চরণের পরে কৌমার সুকুমার।

মন্থরপদে সন্ধ্যা নামিছে কাজলতিমিরে আঁকা,
দুয়ারে অতিথি, অন্তরে ব্যথা—সম্ভব সে কি থাকা ?
গন্ধে পাগল অন্তর যার,
আবরণ মাঝে থাকে সে কি আর,
খুলি' দিল দ্বার, পরান তাহার পরাগে-শিশিরে মাখা ;
কুঞ্জ ঘিরিয়া আঁধারে ছাইল স্বপ্নপাখীর পাখা।

বাতাবিকুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগচোর—
হা রে কলঙ্কী হৃদয় আমার, সঙ্গী মিলেছে তোর।
দূরদিগন্তে দিবা হল সারা ;
অন্তর ভরি ফুটে' উঠে তারা,
নব-ফুটন্ত নেবুর গন্ধে আসিল তন্দ্রাঘোর—
কলঙ্কী প্রেম, মুগ্ধ হৃদয়—একই পরিণাম তোর ॥

—রেখা

সতীশচন্দ্র রায়

দুঃখদেবতার মূর্তি

পশ্চিম দিগন্তে যেথা গভীর সিঁদুর
যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
ভাঙিয়া পড়েছে চুর-চুর—

যেথা ওই ঊর্ধ্বভাগে সন্ধ্যার কালিমা লাগে
মসীর প্রাকার যেথা বনান্ত সুদূর—
যেথা জানি তরঙ্গিণী পডিয়া বনের ছায়ে
লোটায়ে কাঁদিছে রুদ্ধস্বর—
সেখানে বসিয়া আছে,
কষ্টে শ্লথ গ্রীবা 'পরে
স্থির রাখি' মাথাখানি তার—
বেশবাস অযত্নশিথিল
ঢালা বাহু স্ফুরে বার বার!

বিরাট সে পুরুষের ছবি!
বিরাট তাহার দেহ, নভ-কেন্দ্রে উড়ে কেশ,
গভীর সিঁদুর-আভা লভি'!
বয়ান স্ফুরিছে মাঝে, বনান্ত-প্রাকার 'পর
বসেছে সে—পদতলে তামসী জাহ্নবী;
তামসী জাহ্নবী কাঁদে ফুলে ফুলে করি সোর,
গেছে দিন, কোথা গেছে রবি!

সূর্য কোথা গিয়াছে ঘুরিয়া
দুঃখের মু'খানি হের গভীর ব্যথায় ওই
রক্তরাগে যাইছে পুড়িয়া!
শুন, সে একটি গাহে গান—
মনে লয় চরাচর শুনিয়া সে গীতস্বর
হয়েছে হৃদয়ে কম্পমান!

"আমার সহস্র বাহু ভুবনে গেছিল ছুটে
মোর যত বেশবাস নভে পড়েছিল লুটে !
সারাদিন কলনদী ধুয়ে মোর পদতল
কুসুমিত তীর হানি', বহেছিল নিরমল।
ফুল-ফল লতা পাখী আমারে ঘিরিয়া সবে
সারাদিন নেচে নেচে ছুটেছিল কলরবে।
লক্ষ নরনারী-প্রাণ গাহিয়া আনন্দগান
আমারি হৃদয় 'পরে হয়েছিল লুণ্ঠ্যমান।
শত মরকত-মাঠে এলাইয়া মহাকায়
মাথাটি হেলায়ে দিনু পর্বত-পাদপছায় ;
ধরার জীবনরস পশিয়া সর্বাঙ্গে মোর
বিহ্বল করেছে মোরে, সুখমদে ছিনু ভোর !
কোথা ছিল দুঃখ, হায়, লুকায়ে ঘুঘুর মত
সুদূর মরম মাঝে ? —সুখ সে কেমনে হত ?
হায় কি অশুভ খন !
দেবতা কি দুরজন,
দুরদৃষ্ট পড়িল ঝরিয়া
নভতল ভস্মে আবরিয়া !
নয়নে পড়িল মোর ছাই.
আর কিছু দেখিতে না পাই !
চারিধারে ফিরিছে আঁধার,
মাথায় নামিছে গুরুভার !
সাপিনীর ফণাসম তমফণা তুলি'
সহসা কে দাঁড়ায়েছে দশদিক্ খুলি'।
আনন্দশয়ন ছাড়ি' উঠিনু আয়াস ভরে—
থর থর কাঁপে তনু, মাথা ঢুলে ঢুলে পড়ে।
কেবল এ গভীর ব্যথায়
আননে সিঁদুর-রাগ ধায় !
দুরবল পদতলে কাঁদিছে আকুল জল,
হৃদয়ের মাঝে শুধু চেয়ে দেখি অবিরল !

সেথা কোন্ ভস্মগিরি চূর্ণ হয়ে উড়ে যায়,
সব ম্লান হয়ে আসে। ভস্মে সব ভস্ম ছায় ?
কাঁপিতেছে কর পদ, মুহুঃ কাঁপিতেছে শির,
হে রজনি, তব শয্যা ঢালো ঘোরা রজনীর!
একটি মরণ সেথা নিভৃতে বিছায়ে দিব—
এ বিরাট দুর্বলতা বিস্মৃতিরে সমর্পিব!
বনরাজি যদি চায়, যেন সে সংগীত গায়
শিয়রে দাঁড়ায়ে মোর রজনীর কিনারায়!
সে মৃত্যুর শান্তি 'পরে তামসীর চূড়াদেশে
দু'চারিটি স্মৃতিফুল হয়তো আসিবে ভেসে
তোমার স্বকর হতে, মধুর তারকা-রূপে
চারিটি প্রহর ধরি, রজনী সে চুপে চুপে
দাঁড়ায়ে কাঁদিবে একা,—ক্রমে শীর্ণ গণ্ড তার
পাণ্ডুর ললাটে তার চুম্ব রাখি, মেলি দ্বার
বিজয়ী দিবস এসে, টেনে লবে আলো'পর—
নীলাম্বরে ঝরে যাবে জ্যোতি-বৃষ্টি ঝর ঝর!
তারকা চমকি দিয়া মুর্ছি দিয়া চরাচর
জ্যোতির আনন্দ-গান উল্লসিবে নভোপর।"

এই সুরে সন্ধ্যা মরে যায়
কাঁদে বসি বিশ্ববাসী লোক!
মোর প্রাণ ব্যথা-পরিপূর
হইয়ে বিরাট এক শোক
লুটি পড়ে সহস্র ছায়ায়
তারা সনে কাঁদিছে বিধুর ॥

কবির বিকল্প

আমি তব বাগানের ফুলতরু সখা।
রজনী শিশিরে সেঁচি বিমল করিবে তনু,
ঝরিবে আমার শিরে ভ্রষ্ট তারকা!

গভীর নিশীথকালে অপ্সরী অমৃতকণা
ঢুলায়ে কোরকে মোর ফিরিবে অলকা।
সারারাতি সঞ্জীবনরস করি পান
প্রাণ ভরি সঞ্চি লব তব প্রেমগান।

খদ্যোতেরা সারারাতি জ্বালায়ে অধীর বাতি
ইন্দ্রের নয়ন সম রবে চারিধার।
আমার কুসুমকলি তাহাদের অন্ধকারে
নবীন উঠিবে ফুটি, বিন্দু সুষমার ;—
পরানের আশেপাশে ফুল-ফোটা অনুভবি
গম্ভীর দাঁড়ায়ে রব আনন্দে অপার!
প্রভাতে তোমারি ভানু কিরণে ভরিয়া
তুলিবে পরান মোর আকুল করিয়া!

আনন্দে বাহিরে যাবে কবিতা-কুসুম!
স্বরগের নিদ্রাশেষ চক্ষে মোর লেগে রবে
ললাটে রহিবে মোর অপ্সরার চুম।
নরনারী ডালা লয়ে আসিবে তুলিতে ফুল
পড়ে যাবে হরষের কোলাহল ধুম।
পল্লবপরশ সম সম্ভাষি শীতল
তাহাদের চিত্তে দিব শান্তি নিরমল!

তোমার পবন মোরে লুটিবে হরষে,
তব জ্যোতি তব বায়ু তব দান পরমায়ু
ভোগ করি বেড়ে যাব বরষে বরষে!
সহসা দেখিব চাহি—আমি রে অমর-তরু,
আর ত এ শাখা হতে পত্র নাহি খসে!
রজনীর আশীর্বাদ, তারকার প্রীতি,
মানবের প্রেম মোরে ঘিরে নিতি নিতি!

ধরা ঘুরে চন্দ্র ঘুরে দিবা রাত্তি আসে,
গড়ায় গ্রহের দল গগনপ্রাঙ্গণে,
কভু ইন্দ্রধনু উঠে, কভু ধূম্রকেতু ছুটে,
সোহাগ করিছে রাহু রবি চন্দ্র সনে—
আমি রে অমর-তরু—কল্পতরু নাম,
কুসুম ফুটিছে মোর শাখে অবিরাম ॥

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

ব্যাকুলতা

দীর্ঘ দিবস ফুরায়ে যায়,
দীর্ঘ রজনী কাটে,
স্বর্গ হইতে এখনো হায়,
তরী যে এলো না ঘাটে।
অনুকূল-বায় বহিয়া বহিয়া
কোন্ দেশে কবে গিয়াছে চলিয়া,
রবি-শশী-তারা ঢেলে সুধা-ধারা
ফিরিছে আপন বাটে।
স্বর্গ হইতে এখনো হায়
তরী যে এলো না ঘাটে।

ঊর্ধ্বে রহিল দেবতা আমার,
নিম্নে পড়িয়া আমি;
ক্ষুদ্র হৃদির কামনা অপার
জানেন অন্তরযামী।
ঊর্মির পর ঊর্মি আসিয়া
যা ছিল আমার লয় ভাসাইয়া,
রহিতে জীবন হবে না মিলন,
আসিবে না তরী নামি'।
ক্ষুদ্র হৃদির কামনা অপার
জানেন অন্তরযামী!

কুঞ্জ আমার শূন্য করিয়া
পূর্ণ করিনু ডালা ;
পুঞ্জ পুঞ্জ কুসুম তুলিয়া
রেখেছি গাঁথিয়া মালা !
প্রাণেশের দেখা না পাইয়ে হায়,
সাধের মালিকা শুকাইয়ে যায় ;
ধরার ধূলাতে হবে জুড়াইতে
শেষে কি মরম-জ্বালা !
পুঞ্জ পুঞ্জ কুসুম তুলিয়া
কেন বা গাঁথিনু মালা !

লক্ষ্য করিয়া চক্ষু-সমুখে
যতদূর, হায়, চাই—
বক্ষ চাপিয়া রহি ঘোর দুখে,
তরী মোর আসে নাই !
ফুল্ল যৌবন যেতেছে বহিয়া,
শুষ্ক নয়ন ঝরিয়া ঝরিয়া,
আর কতদিন রহিব মলিন,
প্রাণ করে যাই-যাই !
বক্ষ চাপিয়া রহি ঘোর দুখে,
তরী মোর আসে নাই !

—অঞ্জলি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চম্পা

আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর ;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য শুষ্ক বিহ্বল জর্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভূ ঝরিব না মরি' ;
উগ্র মদ্য-সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মূহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি' ;
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব !
সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্যের সৌরভ ॥

চার্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্বাক,
সূর্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত, নির্বাক,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।
হ্রদেব দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্যামলেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল।
তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির।
চলিয়াছে চার্বাক কিশোর,
ভ্রূ কুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;

শিশিরের পদ্মকলি সর্ম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর।
"আজি যদি মঞ্জুভাষা আসে এই পথ দিয়া,
চকিতে আঁচলখানি নেব তার পরশিয়া;
সে যদি জানিতে পারে! সে যদি পালটি চায়
মাগিয়া লইতে ক্ষমা আমি কি পারিব হায়!
সে এলে অবশ তনু, কথা না জুয়ায় আর!
কত যেন অপরাধ,—আঁখি নোয় বারবার!
সময় বহিয়া যায়, চ'লে যায় রূপসী,
রাখিয়া রূপের স্মৃতি ডুবে যায় সে শশী।

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা!
পিতা যদি সর্বশক্তিমান,
পুত্র কেন তাপের অধীন?
পিতা যদি দয়ার নিধান,
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন?
নাহি, নাহি, নাহি হেন জন,
বিধি নাহি—নাহিক বিধান;
কোন্ ধনী পিতার সংসারে
অনাহারে মরেছে সন্তান?
মোরা যে বিশ্বের পরমাণু,
স্নেহ প্রেম মোদেরো প্রবল;
আর যেই ত্রিলোকের পিতা
তারি প্রাণ পাষাণ-নিশ্চল?
দাসীপুত্র যারা জন্মদাস
ভয়ে ভক্তি জানি তাহাদের,

আজন্ম যে হ'তেছে নিরাশ,—
সেও রত তোষামোদে ফের!
ধিক! ধিক! মরণের দাস!
মুখে বল পুত্র অমৃতের!

ছিল দিন,—হাসি আসে এবে;—
নখে চিরি' বক্ষ আপনার,
আমিও করেছি লোহদান
লৌহময় পায়ে দেবতার।

বালকের অখল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন।

ফল তার? পদে পদে বাধা
আজনম, বুঝি আমরণ!
মরণের পরে কিবা আর?
নাহি, নাহি, নাহি কোন জন।"

অকস্মাৎ চাহিল চার্বাক,
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু-ডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে বনদেবী!

মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী
শিরে ধরি' পাষাণ-কলস
আসে ধীরে আশ্রম-বাহিরে
গতি ধীর, মন্থর, অলস।

পর্ণরাশি-মর্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি;
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী।

লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার ;
পরিপূর সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার ।

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে সুপ্ত অভিমান ;
বাহুলতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান ।

চাহিয়া সহসা বালা ডাকিল চার্বাকে
"ওগো ! শোনো শোনো,
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগশিশু এক,
আছে কি এখনো ?"
মন-ভুলে চেয়ে ছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্বাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর ?
বিষম বিপাক !
কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদ্গদ বচন
"সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার সোনার বরণ—
যেয়ো একদিন !
আজ যাবে ?" মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্বাক
ভরসা ও ভয়ে ;
মঞ্জুভাষা কহে, "না, না, আজ ?—আজ থাক্ !"
অধিক বিস্ময়ে !

সহসা সংবরি আপনায়
কহে বালা চাহি মুখপানে,
"শুনিনু মা-হারা মৃগশিশু,
মৃত মৃগী কিরাতের বাণে ;

ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়,—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ ;
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন।

বল, আমি মা হব তাহার।"
"তাই হোক" কহিল চার্বাক,
"আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি।" কহি যুবা হইল নির্বাক।

কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চলে গেল মরালগমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে।

আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এলো চার্বাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে।

ঠেকেছিল মনোতরীখান্
প্রাণনাশা সংশয়-চড়ায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।
যত কিছু ছিল বলিবার
না বলিতে হল যেন বলা,
বোঝা—সোজা হল মনে মনে,
ধুয়ে গেল যত মাটি মলা।

ছিল ঠেকে মনোতরীখান্,—
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে ?
কে গো তুমি দুর্জ্ঞেয় মহান্ ?
কে দেবতা এলে আজি চিতে ?

"এ আনন্দ কে দিল আমায় ?—
আশা-সুখে মন পরিপূর !
এতদিন চিনি নি তোমায় ;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর !"

রাত্রি এল ;—শয্যাতলে জাগিয়া চার্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার ;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার !

সেই একদিন শুধু জীবনে চার্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার ;
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন,—
সে যে আনন্দের দিন,—সে যে প্রত্যাশার ॥

—কুহু ও কেকা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমগাছ

দুখিনীর ছিল শুধু একটি আমের গাছ
নিজ দুয়ারের কাছে তার,
বছর বছর তাতে গাছভরা আম হ'ত
ছেলেরা কুড়াত অনিবার।
একদিন কুপ্রভাতে ছেলেরা দেখিল তার,
দু'জন কুঠার লয়ে করে
চারিদিক ঘুরি ঘুরি দেখিছে গাছের মূল,
বালকেরা শিহরিল ডরে।
ছুটিয়া মায়ের কাছে কাঁদিয়া বলিল গিয়া,
দেখ মাগো, কাহারা আসিয়া
দু'খান কুঠার লয়ে দেখিছে গাছের গোড়া,
লয়ে যাবে বুঝি গো কাটিয়া।

আমাদের চারাগাছ মুকুলেতে ভরে আছে,
এ বছর কত আম হবে!
আমরা খাব না আম, তারা সব নিয়ে যেয়ে
গাছটি কাটিবে কেন তবে?

মলিন বদনে মাতা বলিল, তা শুনিবে না,
তোমরা বাড়িতে এসো ধন,
ধারের দায়েতে কত রাজার রাজত্ব যায়,
মহাজন শুনে না বারণ।

গরিবের ছেলেমেয়ে বাহিরে গেল না আর
খেলাঘর বসিল উঠানে,
কুঠারের ঘা যেমন গাছের উপরে পড়ে
চাহে এ উহার মুখপানে।

খেলাতে বসে কি মন, কানেতে পশিছে সাড়া,
বাজিছে কোমল বুকে কত;
নিষেধ করেছে মাতা, বাহিরে যাবে না আর,
বসে আছে পুতুলের মত।

আর কতখন হায়, গাছ নোয়াইল শির,
শিশুদল চাহিয়া রহিল;
ভূতলে পড়িল তরু, তারি সাথে আঁখি ক'টি
জলভারে নমিয়া পড়িল।

গাছের তলাতে শুধু ভাঙা খেলাঘর আছে,
একটিও প্রাণী নেই সেথা;
পড়ে আছে ভ্রষ্ট নীড়, গেছে উড়ি পাখীগুলি
পথিকের হৃদে দিয়ে ব্যথা।

একি আশা, একি ভ্রম, মায়ার ছলনা একি!
আজো দুটি ছোট ছোট ছেলে
প্রভাতে উঠিয়া ওগো ঘটি ভ'রে জল দেয়
কাটা সেই প্রিয় তরুমূলে॥

শশাঙ্কমোহন সেন

গিয়াছিনু বেড়াইতে ভুবনের পার ;
কষিত কাঞ্চন-মূর্তি দেখিনু তাহাকে—
আফোটা কুসুমকলি, বুকে আপনার
সুধার উন্মাদী গন্ধে বন্দী করি রাখে।

হাসি তার উষা হেন আলোক-নন্দিনী,
পরান পরশে যেন ; ধরা নাহি যায়
তৃষিত অধরপুটে—জীবনপ্লাবিনী
বৈকুণ্ঠপ্রতিভানদী অমিয়া-ধারায়।

মনে আছে, চারিদিকে অলিতন্ত্র সম
গুন্ গুন্ মন্ত্র জপি' আছিনু ঘুরিয়া ;
সৃষ্টি যারে মরে খুঁজি' প্রাণপাত্রে মম
তাই যেন পূর্ণ করি ফিরিনু লইয়া।

এ দেশে জাগিয়া উঠি করি দরশন—
আমারে ধরিতে নারে আমার ভুবন

—বিমানিকা

সরলাবালা সরকার

মৃন্ময়ীর পুরস্কার

দুয়ারে থামিল গাড়ি ; মীনু নামে তাড়াতাড়ি,
অঙ্গন দিয়া চলে।
চলিতে উছট খায়, অঞ্চল লুটায়ে যায়,
ললাটে মুকুতা-বিন্দু ফলে।
নয়নে উছলে হাসি ; মায়ের নিকটে আসি,
"মাগো, দেখ, প্রাইজ কেমন।
প্রথম হয়েছি বলি 'দিদি' দিয়েছেন 'ডলি,'
ঠিক যেন খুকীর মতন!

কালো কালো চোখ দিয়ে জুল জুল আছে চেয়ে,
চুলগুলি ওড়ে ফর্ ফর্।
ঘাগরাটি পরা গায়, ছোট জুতা দুটি পায়,
মাগো দেখ কেমন সুন্দর!"

গৃহকর্মে ব্যস্ত মাতা শুনিয়া মেয়ের কথা,
হাসি' চাহিলেন তার পানে,—
"মীনুরাণী, মা আমার! ও 'ডলি' ছুঁয়ো না আর,
তুলে রেখে দাও ওইখানে।

বিদেশী, নাই ও নিতে।—" মেয়ে চাহে চারিভিতে
ছলছল প্রফুল্ল নয়ন!
মা দেখিয়া কোলে নিয়া, কহে মুখে চুমো দিয়া,
"ডলি নিয়া খেলা কর ধন!"

কোন কথা নাহি বলি ধীরে মীনু গেল চলি
লুকাইল কে জানে কোথায়!
ছোট ভাই 'বেণু' তার খুঁজি ফিরে চারিধার,
দিদি কোথা দেখা নাহি পায়।

সেদিন সাঁঝের বেলা আর তো হল না খেলা
বাবার সাথেতে লুকোচুরি;—
মেনী শুধু ঘরে আসে খুঁজে দেখে চারিপাশে
মিউ মিউ করি ঘুরি ঘুরি।

পরদিন বিদ্যাবাসে ছাত্রীগণ চারিপাশে,
শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদানে রতা;
"আজিকার পাঠ শিখ"; কি তেজস্বী, কি নির্ভীক
বুঝাইয়ে বলেন সে কথা।

মৃন্ময়ী দুয়ারে আসে, দেখিয়া মেয়েরা হাসে,
"দেখ,—মীনু 'প্রাইজ' তাহার
কোলেতে করিয়া 'ডলি' ইস্কুলে এসেছে চলি,
ছাড়িতে পারে না বুঝি আর!"

মীনু কিছু নাহি কহে শুধু নত মুখে রহে,
মুখে উড়ে পড়ে কালো চুল।
শিক্ষয়িত্রী-পাশে গিয়া, বলে তাঁর হাতে দিয়া—
"ফিরে নাও বিদেশী পুতুল।"
... ...
মায়ের নিকটে আসি মৃন্ময়ী দাঁড়াল হাসি,
চোখে আর নাহি জল তার।
মা তাহারে কোলে করি, কচি ঠোঁট দুটি ভরি'
'চুম্বন' দিলেন পুরস্কার।
দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলি' বেণু দিল বাঁশি ফেলি,
লাঠিম পুকুরে ফেলি দিয়া,
কত রাজ্য জয় ক'রে যেন আসিয়াছে ঘরে!
মায়ের আঁচল ধরে গিয়া॥

—অর্ঘ্য

দেবকুমার রায় চৌধুরী

গুণে-রূপে

নির্মল গগন হতে বিধাতার আশীর্বাদ-সম
প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য-কর
ফুটন্ত মল্লিকাসম পবিত্র ও তনু 'পরে আসি'
হাসিতেছে!—মরি কি সুন্দর!
কোথা ছিল এতদিন এত রূপ লুকাইয়া সখী?
দেখি নি তো তোমারে এমন?—
কোথা হতে আজি প্রাতে লভিলে এ রূপ-জ্যোতি তুমি?
—ভ'রে দিল এ নয়ন মন!
গুণে তুমি গরীয়সী,—শুষ্ক প্রাণে সঞ্চারিলে প্রেম;
প্রেমে তুমি হইলে প্রেয়সী;
প্রেয়সী হইয়া তুমি দেবতার শুভাশিস্ লভি'
প্রেমরাজ্যে হয়েছ রূপসী॥

—মাধুরী

সতীশচন্দ্র ঘটক

চটি বিলাপ

(ভট্টাচার্যের চটি-চুরি উপলক্ষে)

১

হে আমার চটি !
কিনিয়াছিলাম তোমারে যে আমি
বাঁধা দিয়া ঘটী।
মনে নাই কি হে তালতলা গিয়া
কিনিনু তোমারে একটাকা দিয়া,
এবে কোথা তুমি যাইলে চলিয়া
মোর 'পরে চটি' ?
কোন্ অপরাধে হইলে নিদয়,
হে আমার চটি !

হে চরণ-যান !
তোমার লাগিয়া খুঁজেছিনু আমি
কত না দোকান ;
কত না জুতারে ঠেলিয়া চরণে,
নির্মিত কত নূতন ধরনে,
তোমাতেই শেষে করিলাম হেসে
এ চরণ দান,
ভুলে কি গিয়েছ সে সকল এবে,
হে চরণ-যান ?

৩

হে পদ-বাহন !
যদিও তোমার মূল্য কেবল
একটি কাহন,

যদিও তোমার দেহ ত্রিভঙ্গ
কমঠ কঠিন শ্রীহীন অঙ্গ
বলে সবে, তবু তোমারি সঙ্গ
করি আবাহন ;
হে পদ-বাহন !

৪

হে চটি-প্রবর !
পাঁচ বছরের ভালবাসাটিরে
দিলে কি কবর ?
তোমারে লইয়ে কত দেশ দেশ
ফিরিয়াছি আমি দীনহীনবেশ,
তোমারে দেখায়ে দু’পয়সা বেশ
পেয়েছি জবর,
তোমারি অটল ধৈর্যের গুণে,
হে চটি-প্রবর !

হে জুতা-রতন !
পারি নি তোমারে কখনো ত আমি
করিতে যতন,
তবু তুমি মোর লাগিয়া সতত
বৃষ্টি ও কাদা মাখিয়াছ কত,
সহিয়াছ কত কণ্টক-ক্ষত
সাধুর মতন ;
তার চেয়ে বেশি কি হয়েছে আজ,
হে জুতা-রতন !

৬

পাদুকে আমার !
কার প্রলোভনে ভুলিলে আমারে,
কোন্ সে চামার ?

যাই হোক, তুমি যারি সনে যাও,
যত কম হাঁট, যত সুখ পাও,
যত তেল মাখ, রৌদ্রে শুকাও,
তবু বিনামার
বেশি সে তোমারে বলিবে না কভু,
পাদুকে আমার।

৭

হে মোর বিনামা!
বিনামা হলেও গরিবের তুমি
সোনা, রূপা, তামা।
ধুতি, ছাতি, ব্যাগ, নস্যের দানি
আর তোমাকেই সম্বল মানি
ছিনু এতদিন, কখনো না জানি
মোজা, কোঁট জামা;
তবুও আমারে ছাড়িলে কি হেতু,
হে মোর বিনামা?

৮

বন্ধু হে মম!
পৃষ্ঠেতে নহ, কিন্তু চরণে
তুমি অনুপম;
তোমার মূরতি সদা মনে জাগে,
রিক্ত চরণে যবে ব্যথা লাগে,
যবে মনে পড়ে কত অনুরাগে
সুন্দরতম
বর্মের মত চর্মে রাখিতে
বন্ধু হে মম।

৯

হে আমার চটি!
পথে-ঘাটে আমি এখনো তোমার
গৌরব রটি;

থাকিলে আমার, শত তালি দিয়া
পরিতাম তোমা, কিন্তু চলিয়া
গেছ যার সনে তোমারে ফেলিয়া
দিবে সে কপটী,
যেমনি খসিবে দেহের বাঁধন,
হে আমার চটি॥

—রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

বিফল

সে রাতি ভুলিনি আজো—স্মৃতিপটে লিখা—
তোমার চরণধ্বনি শুনিবার আশে
জেগে বসে ছিনু মোর বাতায়ন পাশে—
যদি এসে ফিরে যাও, হে অভিসারিকা।
বাহিরে চাঁদিনী রাতি, ঘরে দীপ-শিখা,
আকাঙ্ক্ষার, কল্পনার নির্লজ্জ বিলাসে
বাসর ভরিয়াছিল; পরশ-তিয়াসে
শিহরি উঠিতেছিল কণ্ঠের মালিকা।

যখন ডুবিল চাঁদ, মালাটি শুকালো,
চোখে এল ঘুমঘোর, ক্লান্ত তনুখানি,
তুমি এলে—ভালে দীপ্ত প্রভাতের আলো।

বাসরের দীপ-শিখা কখন্ না জানি
শরমে মরিয়া গেল; কোথায় লুকালো
উদাস ভৈরবী মাঝে কামনার বাণী॥

—সনেট

চিরন্তনী

সে যে জেগেছিল মোর বাঁশরীর সুরে,
আমার নয়নপাতে ফুটেছিল রূপে।
পরশে সঙ্কোচ ছিল, কথা চুপে চুপে,
দৃষ্টি ছিল কল্পলোকে কোথায় সুদূরে।
সেই রজনীটি মোর এই মর্ত্যপুরে
পরিশ্রান্ত মিলনের তীব্র গন্ধধূপে
মিশিল আজিকে কোথা—স্মৃতিঅন্ধকূপে
হারানু কবে না জানি ক্ষণিকা বধূরে।

মুহূর্তের জ্বালা শুধু; যে গিয়াছে যাক্,
অতীতের বাঁধা বীণা রহুক নির্বাক।

আমার মানস-কুঞ্জে আমি জানি তবু
ব্যর্থ হয় নাই সেই অভিসার-রাতি;
মানসী প্রিয়া সে মোর ভোলে নাই কভু,
জ্বালিয়া রেখেছে চিরমিলনের বাতি॥

—সনেট

কিরণচাঁদ দরবেশ

আমি কবি

ভাই রে, আমি একটি কবি!
কাব্যি লিখতে যা কিছু চাই,
আছে আমার সবই।

দোয়াত-পোরা আছে কালি,
কলম আছে এক হালি,

কাগজ আছে মোটা বালি
দিস্তা খানেক জড় ;
প্রাণে বইছে তরুণ রস
(নেহাৎ বেশি নয়ত বয়স),
দোষের মধ্যে গিন্নী নীরস,
কাব্যেতে নয় দড় ।

জ্যোছনা-রাতে চাঁদের হাঁকে
রুদ্ধ বাতায়নের ফাঁকে
চোখ দুটি মোর চেয়ে থাকে
যদিও কাব্যিরসে,
ভয় হয়, চাঁদ দেখে দেখে
বুকটা কখন বসে বেঁকে,
ফুসফুসিটা ওঠে পেকে,
গিন্নীর নোয়া খসে ।

বাড়ি আমার গলির মধ্যে
অতি নিবিড় অবরুদ্ধে,
ঘরে মশা-মাছির যুদ্ধে
ব্যস্ত সকাল-সাঁঝে ;
দুই বেলা না জোটে আহার,
গিন্নীর তাই মুখখানি ভার,
আমার কিন্তু বইছে জোয়ার
প্রাণের ভাঁজে ভাঁজে ।

ছাতে বসে শুনছি ভারি
বাহির পথের কি হুড়মাড়ি,
মটর বাইক সারি সারি
চলছে কলরোলে ;

খাতায় লিখছি গাঁয়ের কথা,
নদীর ধারের নীরবতা,
কত ফুল ফল বৃক্ষ লতা
মনের চোখে দোলে।

শীতে যখন কোর্তা গায়ে,
শুয়ে আছি লেপের ছায়ে ;
বালিস বুকে উপুড় হয়ে
লিখছি ফাগুন মাস ;
বসন্তের কি মস্ত বাহার,
মলয় হাওয়ার গোপন বিহার,
ভোম্‌রা-কুলের ফুলের তেহার
মাঠের নানান্‌ চাষ।

ধান্যবৃক্ষ দাওয়ায় উঠি
কিরূপে হয় ঘরের খুঁটি,
মাঘে আম্র-মুকুল ফুটি
বাগানটি কি তোফা ;
আপন কক্ষে মনের মিশে
যাচ্ছি সে সব কলম পিষে ;
এমনি আমার সজাগ-দিশে,
পুঁথি-গত চোপা।

আষাঢ় মাসে নদীর বাঁকে
গাঁয়ের নারী কলসী কাঁখে
জলের লাগি দাঁড়িয়ে থাকে
আছে আমার জানা ;
জানি তাদের শঙ্কা-শরম,
নিলাজ যুবার ভোয়াজ-ধরম,
তাইতে বেরোয় গরম গরম
কাব্যি-রসের দানা।

যদিও আমি শহর ছেড়ে
যাইনি কভু কিছুর তরে,
তবু জানি কোথায় ওড়ে
রঙ-বেরঙের পাখী ;
কোথায় কোকিল ডাকে কুহু,
বিরহী কয় উহু উহু,
বিদ্যা আমার আছে বহু
হুবহু সব লিখি।

এত যোগাড় এত যন্ত্র,
এত আমার জাগত মন্ত্র,
আমার রসাল কাব্যিতন্ত্র
গভীর এবং পষ্ট ;
তবু যদি কবি ব'লে
না দাও মালা আমার গলে
জানবো তবে দেশের ভালে
আছে বহুৎ কষ্ট ॥

—সুসোমা

সুকুমার রায়

ছায়াবাজী

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি ?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি !
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা,

চিলগুলো যায় দুপুরবেলা আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখছি কত ঘেঁটে—
হাল্কা মেঘের পানসে ছায়া তাও দেখছি চেটে।
কেউ জানে না এ সব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মত ছায়ার পিছুপিছু।
তোমরা ভাবো গাছের ছায়া অমনি লুটায় ভুঁয়ে,
অমনি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে;
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো,
বলছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয় না কাছে দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছটফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাতলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপ্‌রে ব'লে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।
আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে' যদি খায়,
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাহি তায়।
আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে,
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাটকা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দাম করেছি সস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি ॥

—আবোল-তাবোল

আবোল-তাবোল

মেঘ-মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল-বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশার ঝরনা ছোটে,
আকাশকুসুম আপনি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে,
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে
ছুটলে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত।

হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ!
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর॥

—আবোল-তাবোল

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

আবদারের আধঘণ্টা

বেল-ফুল চাই না
জুই-ফুল দাও।
ও গানটা গেয়ো না
এই গান গাও।
কেন ভালবাসলে
বল—বল না;
হাসলে কেন তুমি?
—কথা কব না!

কালকের গল্প
আজ কর শেষ;
আজকের রাতটা
লাগছে না বেশ?
সারাটা বেলা ধরে
বাঁধলুম চুল,

দেখলে না চেয়ে তা
এম্‌নিই ভুল !

জুঁই-ফুল চাই না
বেল-ফুল দাও,
এ গানটা গেয়ো না
ঐ গান গাও !

জুঁই-ফুল নেবো না
দাও বেল-ফুল—
গোলাপকে পার্শীরা
বলে নাকি গুল ?

ওদিকেতে চেয়ো না
চাও এই দিক ;
আলোটা নিভে আসে
দাও করে ঠিক ;
লাগছে চোখে আলো
করে দাও কম ;
ঐ যা, বাতি গেল
নিভে একদম !

হবে নাকো জ্বালতে,
খুব বাহাদুর !
জানা গেছে বুদ্ধি
যায় কতদূর !
বেল-ফুল চাই না
দাও জুঁই-ফুল ,
পার্শীরা গোলাপকে
বলে নাকি গুল ?

জুঁই-বেল চাই না
    চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি তুমি
    পাও কি না পাও !
কাকাতুয়া কিনে দেবে—
    কিনে দিলে খুব !
কথা কেন নেই মুখে
    হয়ে গেলে চুপ ?

ভালবাসো কি না বাসো
    ঠিক বলো না !
চাঁদ ঐ উঠছে
    ছাদে চলো না ।
মুখে চুণ লাগলো
    ফিরে নাও পান ;
মাথা ঘুরে পড়লো
    গেয়ো নাকো গান ;

চাই না জুঁই-বেল,
    চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি তুমি
    পাও কি না পাও ?
চাঁপা ফুল চাই না
    চাই চামেলি ;
সব-তাতে হবে হবে,
    খালি গাফেলি !
আজ রাতে দুজনাতে
    জেগে থাকবো,
কে হারে কে জেতে আমি
    তাই দেখবো ।

ছোট বলে করবে কি
  তুই-তোকারি ?
তাতে যে গো অপমান
  হয় আমারি !

না বলে না কয়ে তুমি
  কেন চুমা খাও ?
বলি নাকো যত কিছু
  আশকারা পাও !
চামেলি সে চাই না
  দাও চাঁপা-ফুল,
মিঠে তার গন্ধ
  গা তুল্ তুল্।

চাঁপা-ফুল চাই না
  দাও বেল-ফুল ;
খোঁপা থেকে ঝরে প'ড়ে
  গেল বিলকুল্ !
কুড়িয়ে সব ক'টা
  পরিয়ে দাও ;
আবার না-ব'লে তুমি
  গালে চুমা খাও !

আমি মরে গেলে তুমি
  খুব কাঁদবে ?
তখন এ বাহুডোরে
  কারে বাঁধবে ?
ওকি, ওকি, চোখ থেকে
  পড়ে কেন জল ?
মরে কেন যাব আমি—
  মিছে করি ছল।

জুঁই বেল চামেলি—
যা খুশি তা দাও,
ও গালেতে চুমা খেলে
এ গালেতে খাও ॥
—নূতন খাতা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বোঝা

কার কৈশোরে কিশোরী হইয়া
আমারে প্রথম ভুলালে প্রিয়া ?
যৌবন-যোগে দেখা দিলে ফিরে
কার কৈশোর কাহারে দিয়া ?
কার যৌবনে ঢেকে এলে তনু ?
আজি তাও পুন কে লয় টানি ?
যা নহে তোমার তাই দিতে মোরে
কেন চিরদিন প্রয়াস, রানী !
আজি নিশিশেষে বসে মুখোমুখি
নব পরিচয় দুজনে লব ।
নূতন করিয়া গুঞ্জন তুলি
মিলাবো নয়ন নয়নে তব ।

আদি যুগ হতে যত কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে ?

যুগসঞ্চিত চুম্বনভারে
 শ্রান্ত আনত অধর তব ;
ভেবেছিলে সখী, তোমার সে ভার
 আমার অধর পাতিয়া লব।
হায় সখী হায়, আমার অধরে
 উছলিয়া পড়ে এ কার তৃষা,
অসহ তাহার বহনের ভার—
 নামাতে যে চাহি অহর্নিশা।

কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
 মোর আঁখি হতে উড়িয়া চলে ?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
 তোমার অচেনা পুষ্পদলে।
কোন্ অশোকের চৈতী ঝরন
 ও-কপোল তলে শুকায়ে উঠে ?
কোন্ পঙ্কের পঙ্কজকলি
 গরবী উরসে ফুটিয়া টুটে ?
কোন্ শেফালির একটি রাতের
 দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে !
কোন্ বকুলের একটি বাদল
 ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে !

এবারের মতো শিহর ভুলিছে
 কোন্ কদম্ব ও-রোমকূপে !
এবারের মতো ফুলানো ফুরায়
 কোন্ চম্পক তোমার রূপে ?
কোন্ কুহকীর কুহু কুহু কুহু
 ভেঙে আসে তব কণ্ঠ-আড়ে !
কোন্ সে চাঁদের মধু-পূর্ণিমা
 ভোর হয়ে যায় ও-তনুপারে !

অজানা মধুপ, তারই তৃষাতরে
বহ সখী কার গন্ধশোভা ?
তাই বার বার কুঞ্জে তোমার
বসে আর ভাঙে পুষ্পসভা।

অমন করিয়া চেয়োনাকো সখী
কাঁপায়ে চোখের সজল পাতা,
দুটি বাহু দিয়া কণ্ঠ বাঁধিয়া
বঞ্চিত বুকে রেখো না মাথা।
তনু হতে তনু, দীপ হতে দীপ,
যে অতনু-শিখা জ্বলিছে চির,
আমার বুকের জতুগৃহে তুমি
সেই দীপ আজও জ্বালায়ে ফির।
আমার বুকের জতুগৃহ-খানি
রচিত না জানি কাহার স্নেহে,
এ স্নেহের ভার এ দীপের হার
ধরি দিব বলো কাহার দেহে ?

আমরা দুজনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে-পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা !
তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনে এ ওর জ্বালা।
তোমার পশরা রূপে রসে গানে
ভরা আছে যেন ফুলের ডালি,
আমার পশরা রয়েছে বোঝাই
ক্ষুধাতৃষ্ণায় অনাদিকালই।

হেঁকে চলো তুমি—চাই সুধা চাই
ঘরে ঘরে ফুটে তৃষিত আঁখি,
আমি হেঁকে চলি—চাই ক্ষুধা চাই—
ভিড় করে আসে সুধার ফাঁকি।
অমৃত-বাহিনী হায় মায়াবিনী,
ছলে বাঁধি মোরে প্রণয়-ডোরে,
আপনার বোঝা সুবহ করিতে
কার সুধা তুই পিয়াস মোরে?
নূতন বোঝায় মাথা ভেরে যায়,
টলে যে চরণ, চলি কি মতে?
অধরে অধরে ধরাধরি ক'রে
মিলনের বোঝা নামাস্ পথে।

অসীম পথের নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি,
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি।
পথ-পাশে বসি ক্ষণেক জিরাই,
ওঠে কলরব মোদের ঘেরি—
চাই সুধা চাই, চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরানো ফেরি!
পুন কি দুরাশে তোরি পাশে পাশে
চলি মহাপথে চিরভুখারী,
হায় মায়াবিনী সুধাপশারিনী
পথিকের পথক্লিষ্টা নারী।

—অনুপূর্বা

জংশন স্টেশনে

মাঘের প্রভাত
উষাস্নান সারি' ছাড়িছে কুহেলি-শাড়ি
পূর্বানদীতটে। চম্পাপীত ক্ষণনগ্ন বুকে
ঘুরায়ে জড়ায়ে নিল জরীর আঁচল,
স্মিতমুখে চলে গেল
আলোকের অন্তরাল-পথে।

ট্রেন মোর থামিল স্টেশনে,—
জংশন স্টেশন ;—
ছাড়িয়া রাতের গদি স্প্রিংময় কোমল,
নামিনু উপলকীর্ণ সুদীর্ঘ অঙ্গনে।
বিনিদ্র রাতের সাথী
গদিকে কি বেসেছিনু ভালো ?
দুর্ঘট ঘর্ঘর-ঘৃষ্ট
রজনীর লৌহপথে যেবা
গতির উৎক্ষেপ মাঝে
স্থিতির আরাম দিল মোরে,
ব্যথা কি বাজিছে বুকে ছাড়িতে তাহারে ?

অথবা—
লাগিছে ভালো নিদ্রাহীন রাত্রিশেষে
যাত্রীময় জংশন স্টেশনে
কঠিন কঙ্করকীর্ণ এ অপরিচয় ?
প্রাঙ্গণের কাঁটাতারে কুসুমাক্ত বিদেশিনী লতা
অদূর প্রান্তর অজানায়,
নৃত্যপর নটেশের ডম্বরুর মতো—

চলেছে সাঁওতালী মেয়ে নাচিয়া গাহিয়া
দোলায়ে কঠিন তনু মুঠিম কটিতে।
উষাস্নাত মাঘের প্রভাত,
গদি-আঁটা ট্রেনের কামরা,
কাঁটাতারে কুসুমাক্ত লতা,
মাঠের সাঁওতালী মেয়ে,
কারে আমি ভালোবাসি ?
ভালো কি বেসেছি কভু কারে ?
বিশ্বমাঝে কে আমার লভিল সে-প্রেম ?
যে-প্রেমের
নাহি অন্ত, তল, সীমা, আদি ও ইত্যাদি ?
সে প্রেম কি কৃপণের মতো
সঞ্চয়ি' রাখিনু নিজ বুকে ?

দিক্‌হস্তী সম গর্জিয়া আসিল ট্রেন ;
থামি' কিছুক্ষণ
শুষ্কমুখে আকণ্ঠ করিল পান
পঙ্কিল সলিল।
ঘড়ির কাঁটায় কহে
এ ট্রেন আমার নহে।
আমার ট্রেনের বার্তা নিঃশব্দ সঙ্কেতে,
হয়তো বহিয়া আসে তড়িতের তার !
সে বার্তা জানে না ওই নীলকণ্ঠ পাখী
তারে বসি' খেতেছে যে দোলা
পরম আরামে।

জংশন স্টেশনে
ওয়েটিংরুমে দেওয়ালে মুকুর আঁটা ;

কত কত প্রতিচ্ছবি ধরেছে সে বুকে !
চাহি' তার পানে
ভাবিলাম—
যারা যারা এল গেল
প্রতিবিম্ব ফেলে গেল
আয়তলোচনা বিলাসিনী,
তারা যদি আজ
ভিড় ক'রে দাঁড়ায় সম্মুখে
কাহারে বিলায়ে দিব আমার সে প্রেম ?

সহসা সম্মুখে দেখি,—
মুকুর হইতে মোর মুখপানে চেয়ে—
দাঁড়ায়ে সে রয়েছে একাকী,
যারে আমি আজনম ভালোবাসিতেছি
না বুঝিয়া না জানিয়া !
ওই তনু মম,
কখন প্রথম পেনু তারে
জননীর জঠর-আঁধারে
নাহি পড়ে মনে।
অনালোক বায়ুশূন্য ক্লেদক্লিন্ন
জটিল অরণ্যমাঝে সুদীর্ঘ রজনী,
সেথা মোরা ফিরিতেছি খুঁজি' পরস্পরে।
সহসা পরশে অনুভবি',
অন্ধ অনুরাগে
জড়ায়ে সে দিল কণ্ঠে মোর
সহস্র স্নায়ুর জালে রচিত জীবনমাল্য।
সেই ক্ষণে
বুকে বুকে মুখে মুখে
লভিলাম চিরপরিচয়।

সেই হ'তে উভয়ের যাত্রা সুরু হল
সুদীর্ঘ পথের।
শৈশবে খেলিনু একসাথে,
যৌবনের প্রগাঢ় মিলনে
ভুলে গেনু—কেবা সে, কে আমি।
আজ মোরা অভিন্ন এমন, এহেন তন্ময়,
নিঃসাড় হইয়া গেছে প্রেম-অনুভূতি।
রূপহীন পিপাসিতে দিয়াছে সে রূপ,—
অজীবনে দিয়াছে জীবন,—
তাই কি এমন ভালোবাসি?
জানি আমি—নহে সে সুন্দর,
তবু মানি না তো,—তা' হ'তে সুন্দর কারে।
শয়নে স্বপনে, সুপ্তি-জাগরণে,
তিলেক ছাড়িলে নাহি বাঁচি!
মৃত্যুময় জানিয়াও
প্রেম মোর অমর করিতে তারে চাহে।
কালো অঙ্গে তার—
সযতনে বুলাইয়া ভালোবাসা
চিরকাল করি প্রসাধন।
লুকায়ে লুকায়ে দেখি তারে
গুরুজন-গঞ্জনা ভাবিয়া।
তার রোগে রুগ্‌ণ আমি,
তার শোকে আমি মুহ্যমান।
হেন অপ্রমিত প্রেমে কে কোথা প্রেমিক?

ওই
দেখাইল মোরে
রূপের স্বরূপ বারে বারে।
বয়সের ক্লান্তিভারে সে যদি আজিকে

ধ্বসিয়া বসিয়া যায়
গ্রামান্ত-প্রান্তরে গরিবের গোরের মতন,
তবে কি তাহারে ছাড়ি' ঘুরিয়া মরিব
পদ্মপলাশিনীদের পিছে পিছে ?
সে প্রেম মোদের নহে।
এ প্রেম এমনই মূঢ়, নিজে অন্ধ হয়ে
অন্ধে করে দিব্যচক্ষুষ্মান্ ;
এমনই মহান্—
আপনার গোপন যৌবনে
জরারে ভূষিত করে ;
চিরসুন্দরের পাশে
কুৎসিতের রচি' দেয় স্থান।
অপ্রমেয় মোদের এ প্রেম।

তবু দু'য়ে হবে ছাড়াছাড়ি !
এই সে জীবনরাতি ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
কাটাই দু'জনে
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,—
এ রজনী হবে ভোর।
মোদের মিলিত কণ্ঠে আকুল মিনতি,
কাতর ক্রন্দন,
অসহ্য যন্ত্রণাময় ছেদন-বেদন,
রুধিতে নারিবে হায় অরুণ মরণরথ।
সে রথের চক্রতলে
হতমান গতপ্রাণ প্রিয়া
যদি প'ড়ে রয় ধূলিধূসরিত,
চৌদিকে কাঁদিতে থাকে জীবনসঙ্গিনীগণ,
তবু রথে চড়ি'
একা মোরে যেতে হবে

ও পারের মধুপুরে ?
মোর প্রেম কখনো তো মানে নি মথুরা

তার চেয়ে—
শঙ্করের মতো সতীদেহ স্কন্ধে তুলি' ল'ব
ভ্রমিয়া বেড়াবো ত্রিভুবন
মহাশোকে অসীম নির্বেদে,
যতদিন দিকে দিকে সতীপীঠ নহে প্রতিষ্ঠিত,
যতদিন ক্রন্দনতপস্যা মম
সে সতীরে না পারে ফিরাতে।
দারুণ সে যজ্ঞপণ্ডদিনে
দেহহারা জীব হবে সতীহারা শিব।

ঘণ্টা বাজে জংশন স্টেশনে।
আমারি ঈপ্সিত ট্রেন
আসিয়া দাঁড়ালো প্রাঙ্গণের প্রান্ত ঘেঁসি'।
চড়িনু নূতন ট্রেনে, নব কামরায় ;
কুশন-কবোষ্ণ গদি স্প্রিংময় কোমল।
উড়ে গেছে নীলকণ্ঠ পাখী,—
কে জানে চলিছে কিনা শূন্য তার-তলে
আমারি ট্রেনের বার্তা অগ্রিম স্টেশনে॥

—অমুপূর্বা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

চাউনি

নদীর পথে জল-কে যেতে আপদ বড় পায়ে পায়ে,
দুষ্টু ছোঁড়া লুকিয়ে আছে শ্যামল বনের ছায়ে ছায়ে !
দুই চোখে তার চাউনি বাঁকা,
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা,
তাল-তমালের ভিড় যেখানে মিশিয়ে গেছে গায়ে গায়ে।
বিপদ ভারি পায়ে পায়ে।

মুখ ফিরিয়ে কম্‌নে যাব, নয়ন যে তার সঙ্গে চলে,
দিনের শেষে যখন মেঘে কোন্‌ এয়োতির সিঁদুর জলে !
চাউনি যেন কাতর ব্যথায়
আমার দুটি পায়ে লতায়,—
হোঁচট খেয়ে মরব কি লো শেষকালে ঐ ঘাটের তলে ?
অবোধ নয়ন সঙ্গে চলে।

তেপান্তরের বাতাস বাজায় মেঠো সুরের মিষ্টি বাঁশি,
রাঙা আলোয় নদীর জলে আল্‌তা-গোলা হাসির রাশি।
কোকিলগুলোর টিটকিরিতে,
সবুজ পাতার গিটকিরিতে
কে যেন দেয় জড়িয়ে গলায় বিনি-সুতোর সোহাগ-ফাঁসি—
বাতাস বাজায় মেঠো বাঁশি।

সই লো, তোরা বলতে পারিস্‌, এমন ক'রে তাকায় কেন ?
কেই বা তারে দিব্যি দিলে বোবার মতো রইতে হেন ?
মনের কথা থাকলে বুকে,
বললে পরেই যায় তো চুকে !
ধুক্‌পুকিয়ে মরি নে আর, হাঁপ ছেড়ে ভাই বাঁচি যেন !
মিথ্যে শুধুই তাকায় কেন ?

—যৌবনের গান

মোহিতলাল মজুমদার

মানস-লক্ষ্মী

আমার মনের গহন বনে
পা' টিপে বেড়ায় কোন্ উদাসিনী
নারী-অপ্সরী সঙ্গোপনে !
ফুলেরি ছায়ায় বসে তার দুই চরণ মেলি'
বিজন-নিভৃতে মাথা হ'তে দেয় ঘোম্‌টা ফেলি,
শুধু একবার হেসে চায় কভু
নয়ন-কোণে,
আমারি মনের গহন বনে !

সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা
—দিবা কি নিশা,
অস্ত-চাঁদের পাণ্ডু কিরণ
দেখায় দিশা।
নিশ্বাসে যদি একবার তার বুকটি দোলে,
কত ফুল-কলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে,
ভুলে যাওয়া কোন ব্যথার সলিলে
মিটায় তৃষা,
সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা
—দিবা কি নিশা !

কত বিরহের বেদনা-তিমির
ঘনায় চুলে,
কত মিলনের রাঙা-উৎসব
অধর-কূলে !
তবু তার সেই আঁখি-পল্লব শিশির-হারা,
উদাস গভীর চাহনিতে ভরা নয়ন-তারা !

কবে যে কেঁদেছে, হেসেছে কখন,—
গিয়েছে ভুলে',
কত যামিনীর জমাট আঁধার
জড়ায় চুলে !

ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী ?—
কত জনমের—কত মরণের
দিবস রাতি !
কতবার তার ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে,
কভু সে আমারি চিতায় বসেছে চরণ-তলে,-
অজানা আঁধারে যতনে জ্বালায়ে
বাসর-বাতি !
ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী ?

আর কি কখনো এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা ?
হৃদয়-সায়রে হয়ে গেছে তার
কলস-ভরা ?
এ আলোকে যবে না হেরি' তাহারে, পরান কাঁদে-
মনো-বাতায়নে গোধূলি-বেলায় বেণী সে বাঁধে !
গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু
সে অপ্সরা,
বাহির-ভুবনে এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা ॥

মৃত্যু ও নচিকেতা

[উদ্দালকি-আরুণির পুত্র বালক নচিকেতা পিতৃসত্য-রক্ষার জন্য যমপুরে গমন করেন। সে সময় যম গৃহে না থাকায় তাঁহাকে তিন রাত্রি অনশনে থাকিতে হয়। অতঃপর যম গৃহে ফিরিয়া তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা করেন, এবং অতিথি-সংকারে বিলম্ব হওয়ায় নচিকেতাকে ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন।]

নচিকেতা। বৈবস্বত! অতিথির করিবে তর্পণ
বরদানে? অন্য বর দিও না আমায়—
আমি চাই নিরখিতে চির-অগোচর
তোমার স্বরূপ-রূপ, অমৃত-বান্ধব!
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান্!
অন্ধ আঁখি জ্বলিতেছে দৃষ্টি-পিপাসায়!
বাণী তব কর্ণে পশে প্রতিধ্বনিসম,
বৈতরণী-জলস্রোতে নাহি কলরব—
বায়ু যেন নহে শব্দবহ!—নাহি হেথা
ছায়াতপ, নেত্রে মোর কুহেলি দুলিছে!
বিশাল তোমার পুরী, দিবানিশাহীন—
তারি মাঝে ধূম্রনীল স্থির স্থাণুসম
কত কাল দাঁড়াইবে, হে মৃত্যু-দেবতা?

[নেপথ্যে পিতৃগণের গান]

হেথা স্নান করি মোরা অমৃত-সাগর জলে—
মর্ত্য-নদীর মুক্তির মোহানায়,
হেথা পান করি সুধা তারকা-তরুর তলে,
কৃষ্ণা-তিথির জ্যোৎস্নার সীমানায়।
এবে তরিয়াছি মোরা অশ্রুজলের লবণ-অম্বুধি,

এ যে নয়নে ঝরিছে সোম-দেবতার স্বপন-কৌমুদী!
বিস্মরণের বীণাখানি বাজে
মোহন মূর্ছনায়!

হেথা ঋতু, হোরা, পল, নৃত্য-চপল নহে,
থির আঁখি 'পরে দুলিছে না আলো-ছায়া!
হেথা দিবা-নিশা দোঁহে মধুরে মিলিয়া রহে—
বিথারি' বদনে গোধূলির ম্লান মায়া!
এবে দিক্-দিগন্ত উদয়-বিলয় হয়েছে অন্তরে!
এ যে সুখদুখহীন মরণানন্দে চেতনা সন্তরে!
বিস্মরণের বীণাখানি বাজে
মোহন মূর্ছনায়!

মৃত্যু। হে বালক! বৃথা নয় তব অনুযোগ—
তবু সৌম্য! আমি মৃত্যু, তুমি মর্ত্য-জন!
এখনো নয়ন দুটি মমতা-মেদুর,
আরক্ত অধরে যেন কাঁপিছে কাকুতি!
পৃথিবীর পাণিস্পর্শে সুন্দর ললাট
সুমসৃণ, নাসিকায় এখনো শ্বসিছে
মর্ত্য-শ্বাস! রূপরসগন্ধভারাতুর
প্রাণের বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিছে গভীর
সুললিত কলভাষে! পিতার আদেশে
আসিয়াছ যমপুরে, কেন এ কামনা?
তপন-আতপ্ত ফুলতনু সুকুমার
উপবাসে পথশ্রমে হয়েছে কাতর—
লহ পাদ্য-অর্ঘ্য এই, ক্ষম অপরাধ
অতিথির বিলম্ব-সংকারে। সুস্থ হও
চাহিও না, নচিকেতা, মৃত্যু-পরিচয়!
যাহা কিছু বরণীয়, শ্রেষ্ঠ, ভূমণ্ডলে,
তাই দিব, সেই বর লহ, প্রিয়তম!

নচিকেতা। ওগো মৃত্যু! কহিয়াছি কামনা আমার—
হেরিব স্বরূপ তব! স্নিগ্ধ কি নির্মম,
করুণ কোমল, কিবা ভীষণ ভয়াল,
হেরিতে বাসনা চিতে!—সহস্র জনম
জন্মিয়া মরেছি আমি, তবু মনে নাই
কেমন তোমার মুখ! আজ প্রাণে মোর
জাগিয়াছে সেই আশা, দেখিব তোমায়!
তোমারে চিনি না, তবু দিবা-বিভাবরী
হেরিয়াছি ওই ছায়া রবি-শশি-করে—
হরিৎ, শ্যামল, পীত, লোহিতের মাঝে
উড়ে তব উত্তরীয়, পদচিহ্ন তব
গণিয়াছি কতবার জীবযাত্রাপথে!
বৈবস্বত! করিও না অবিশ্বাস মোরে,
প্রাণে জাগে নিরন্তর তোমার মূরতি!—
পূরাও কামনা মোর—খোল' আবরণ!

মৃত্যু। কি দেখিবে নচিকেতা?—মৃত্যুর স্বরূপ?
মৃত্যু মহা-ভয়ঙ্কর, জানে সর্বজন;
জীবনের সুখশয্যাতলে দুঃস্বপন
মরণ-কল্পনা!—সেই মৃত্যু দাঁড়াইয়া
তোমার সম্মুখে, আবরিয়া সর্বদেহ
কহিতেছে সুনৃত-বচন, তাই তব
হৃদয় নির্ভয়, সাহস অপরিসীম!—
জগতের লঘুলীলা ভুলায়েছে তোমা,
হে গৌতম, নহি আমি জীবনের মিতা!
আমারে দেখিতে চাও?—প্রদোষ-আঁধারে
দারুণ ঝটিকাবর্তে ছিন্ন ক্ষণপ্রভা
হেরিয়াছ—দাঁড়াইয়া তরণীর 'পরে
তরঙ্গ-দোলায়? মহারণ্যে পথহারা,

সহসা সম্মুখে তব হেরিয়াছ কভু—
ধাবমান অগ্নিকেতু বনস্পতি-শিরে ?
অর্ধরাত্রে, নিদ্রোত্থিত ঘোর কলরবে,
করিয়াছ অনুভব—দুলিছে মেদিনী ?
সেও তুচ্ছ ! তারো চেয়ে কত ভয়ংকর
মৃত্যুর আসন্ন মূর্তি কালান্ত-তিমিরে !
বালক কিশোর তুমি, নবীন বয়স—
ধরণীর স্তন্যরসে স্তিমিত চেতনা,
কি বুঝিবে মরণের রীতি সুকঠোর ?
কহ মোরে, এ কামনা কেমনে পশিল
চিত্তে তব, কীট যথা প্রস্ফুট প্রসূনে !

নচিকেতা। শুনিয়াছি, নর-জ্যেষ্ঠ পিতৃলোকে তুমি—
পশেছিলে মৃত্যুপুরে তুমিই প্রথম,
তাই দেবগণ বসাইয়া সিংহাসনে,
প্রেতরাজ্যে তোমারেই দিল অধিকার।
হে রাজন্ ! কহ মোরে—সে কি বিভীষিকা-
সৃষ্টির প্রথম মৃত্যু !—তুমি দেখেছিলে !
নহ নর-জ্যেষ্ঠ শুধু, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বটে—
তোমারে প্রণমে আজ অমৃত-সমাজ,
আত্মার আত্মীয় তুমি, হে সূর্যতনয় !
মৃত্যু যদি মহাভয়, দ্যুলোক-দুয়ারে
কেন আছ দাঁড়াইয়া ? কেন রাখিয়াছ
সুধাভাণ্ড করতলে ?—বৃথা ভয় তুমি
দেখাও বালকে !
বয়সে নবীন বটে,
তবু, মৃত্যু ! জেনো আমি জনম-স্থবির !
আমারে করেছে বৃদ্ধ তোমারি ভাবনা।
জাতিস্মর নহি—তবু আবাল্য আমার
নয়নে জ্বলিছে কোন দিব্য দীপশিখা !

সে আলোকে জীবনের চারু চিত্রপট
বিবর্ণ মলিন! সে আলোকে নিশিদিন
হেরিয়াছি কার যেন সুগভীর ছায়া!
প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ যাহা—সে যেন স্বপন,
নদীজল প্রতিবিম্ব-সম! সত্য কহি,
হাসিও না! ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয়
মিথ্যা নাহি জানে।

মৃত্যু। অদ্ভুত কাহিনী বটে!
সতেজ সরস বৃন্তে এ শীর্ণ কুসুম
কেমনে ফুটিল? পিতার ভবনে
হের নাই সোম-যাগ? বেদমন্ত্রধ্বনি,
উদ্গাতার উদাত্ত সে উচ্চ সামরব,
অগ্নিস্তুতি, ইন্দ্রস্তব, বৃত্রজয়গাথা
দিল না হৃদয়ে বল?—সোমরস-পানে
দেবতা-দোসর হয় ক্ষীণজীবী নর!
এ সব জানো না বুঝি? করিও না শোক-
লহ দীক্ষা, শিক্ষা কর অগ্নিহোত্র-বিধি
আমার সকাশে! কেমনে করিতে হয়
সে অগ্নি-চয়ন—নির্মাণ করিবে চিতি,
কোন্ মন্ত্রে হবিঃশেষ করিবে গ্রহণ—
শিখাইব সমুদয়; হে সত্য-পিপাসু,
আমি সেই সত্য-মন্ত্র দানিব তোমায়
এইক্ষণে—না চাহিতে দিনু এই বর।
আরবার কহ, বৎস, কি তব প্রার্থনা?

নচিকেতা। ওগো মৃত্যু সুদক্ষিণ! দাক্ষিণ্য-তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা; অগ্নিহোত্র-বিধি
যা' কহিলে বুঝিয়াছি, রহিবে স্মরণে।

সে যে মোর নিত্যকর্ম—জন্মিয়াছি আমি
মহাঋষি-কুলে! জানি সে সাবিত্রী-মন্ত্র
বলহীনে করে বলদান—তবু দেব!
শুধু মন্ত্রে, স্তোত্রগীতে, হবিঃশেষ-পানে
ভরে না আমার চিত্ত; অগ্নি বৈশ্বানর
জ্বলিছেন অহরহ অন্তর-আলয়ে!
আমি চাই উত্তরিতে জন্ম-জলধির
নিস্তরঙ্গ বেলাভূমে—আলোক-আঁধার,
উদয়াস্ত অতিক্রমি', পঁহুছিতে সেই
জ্যোতির্ময় দেশে—যেথা নাই দুঃস্বপন,
যেথা দেবগণ নিয়ত অমৃত-পানে
জ্যোতিষ্মান্, যথাকাম করে বিচরণ!
ব্রহ্মবাক্য-পূত হয়ে যেথা সোমরস,
বিনা যাগযজ্ঞবিধি, বিনা আহরণ
ক্ষরিছে নিয়ত! বৈবস্বত! সেই লোকে
শাশ্বত অমৃত-পদ দিবে না আমায়?
দেখাও স্বরূপ তব! জানি, যেই জন
হেরিয়াছে ওই রূপ, ছিঁড়ি' মোহপাশ
যায় সে যে ধ্রুবলোকে—যথা বৎসতরী
ছিঁড়িয়া বন্ধন-রজ্জু ধায় নিরুদ্দেশে!
জানি না কেমন তুমি, তবু মনে হয়
তুমি মনোহর। বাহিরিয়া গোচারণে,
প্রথম প্রাবৃটে যবে নবমেঘোদয়
হেরিয়াছি নদীপারে, চন্দ্রভাগা-তীরে—
চাহি' তার অভিরাম সুনীল বয়ানে
অকারণ অশ্রুবেগে হয়েছি কাতর,
মুহূর্তে জাগর-স্বপ্নে হারায়েছি জ্ঞান!
কোথায় সে পদে পৃথ্বী, রুক্ষ ক্ষেত্রতল,
গবীদের হাম্বারব নাহি পশে কানে,
মধ্যন্দিন সবনের কথা ভুলে গেনু!

হেরি' সেই ঊর্ধ্বাকাশ নবঘনশ্যাম
ভুলে গেনু কেবা আমি, কোথায় বসতি,
কি নাম আমার! জন্ম-মৃত্যু-ইতিহাস
নিমেষে পাইল লয়! যেন সৃষ্টি-প্রাতে
ফিরে গেনু—বাজিল সহসা বক্ষে মোর
আত্মীয়ের আদিম বিরহ!—মেঘ নয়!
যেন ওই আকাশের বিমল দর্পণে
দোলে নীল স্মৃতিখানি! শুধাই তোমায়,
সে কি তব প্রতিচ্ছায়া? তোমারি আভাস?

মৃত্যু। নচিকেতা! মৃত্যু নীল নহে, নাহি তার
বর্ণ-রূপ! জানো না কি, করে সে হরণ
নেত্র হতে সর্বশোভা?—সে যে অন্ধকার!

নচিকেতা। তাই বটে! দিবা, নিশা—দুই ভগিনীর
একজন স্বর্ণসূত্রে করিছে বয়ন
ধরার বরণ-বাস আলোক-দুকূলে!
অপরা সে, অস্তাচল-শিখর-শায়িনী,
জেগে থাকে নির্নিমেষ—নিত্য খুলে দেয়
অসংখ্য সে তারকার সূচীমুখ দিয়ে
দিবসের সুদীর্ঘ সীবন!—অন্ধকার!
সান্দ্র স্তব্ধ সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অন্ধকার!—
বুঝিয়াছি, তারি তলে তোমার আসন।

মনে পড়ে, একবার আমি, রিষ্টিশেন—
দোঁহে মিলে গিয়েছিনু পর্বত-ভ্রমণে;
শালবনে সূর্য অস্ত যায়—বহুক্ষণ
দাঁড়াইনু দুইজনে অরণ্য-সীমায়,
মালভূমি 'পরে। দূর পশ্চিমের পানে
উঠিয়াছে অভ্রভেদী চতুঃশৈলচূড়া।

তুষারধবল—যেন স্তম্ভ-চতুষ্টয়
ধরে আছে আকাশের নীল চন্দ্রাতপ!
তারি তলে আলুন্ঠিতা মুমূর্ষু উষার
হেরিলাম মৃত্যুশয্যা! পূর্বাচল হতে
ছুটিয়া এসেছে সে যে সারাটি আকাশ
সবিতার আগে আগে—দেয় নাই ধরা।
এতক্ষণে, প্রণয়ীর প্রগাঢ় চুম্বনে
খুলে গেল কালো কেশ, রক্ত চেলাম্বর!
আর সে কুমারী নহে, নহে সে অহনা,
কন্যা জ্যোতির্ময়ী!—বধূবেশী সন্ধ্যা সে যে
মৃত্যু-স্বয়ম্বরা! তখনি সে অন্ধকারে
মুছে গেল রক্তস্রোত, তবুও মানসে
বহুক্ষণ নেহারিনু শোণিত উৎসব!
মনে হল, পশ্চিমের যজ্ঞ-বেদিকায়
দেবতারা করে যাগ—দীর্ঘ অগ্নিষ্টোম,
উষা তায় নিত্যবলি, সবিতা-ঋত্বিক্
হোম করে আপনার পরান-বধূরে!
এ রহস্য বুঝি না যে! তবু কহ শুনি,
সন্ধ্যা-রক্তরাগ, পশুর শোণিত-পঙ্ক—
সে কি, মৃত্যু! তোমারি ও আঁধার ললাটে
লোহিত তিলক?

মৃত্যু। জানো দেখি এত কথা,
তবু কৌতূহল? হে বালক! বুঝিলাম
বিজ্ঞ তুমি, বহুদর্শী, সহজ-প্রবীণ!
তবুও চপল চিত্ত সংশয়-আকুল?

নচিকেতা। তাই বটে—মূঢ় আমি! তাই প্রাণে-মনে
এখনো বিরোধ। প্রাণ বলে, নহে নহে—
এক নহে মৃত্যু আর মরণ-দেবতা।

মৃত্যু—সে যে সুনিশ্চিত দেহ-পরিণাম,
তাহারি শাসনতরে দণ্ডধর তুমি ;
মৃত্যু হয় কালে কালে, তুমি মহাকাল !
মনে তবু জাগে সদা সভয় ভাবনা,
তোমারেই স্মরে নর আয়ুশেষ-কালে।
গতাসুর শূন্যদৃষ্টি অক্ষি-তারকায়,
শমিতার সমুদ্যত অসির ফলকে,
হেরে জীব মরণের মূরতি করাল—
একি মোহ ! জীবনের একি প্রবঞ্চনা !
তথাপি তোমারে আমি করিয়াছি ধ্যান
চেতনা-গহনে, তুমি নিঃশব্দ সঞ্চারে
স্বপন-শিয়রে মোর দাঁড়ায়েছ আসি'
সুনির্জনে—আসে যথা রাত্রি তমস্বিনী
শব্দহীন কলস্বনে, গগন-অঙ্গনে,
দুকূল প্লাবিয়া, অতিক্ষুদ্র বীচিমালা
তরঙ্গিয়া ধরে শিরে ফেনপুষ্পসম
নিযুত নক্ষত্ররাজি, স্তব্ধ মনোহর !
করি' সন্ধ্যা সমাপন, কুটীর ছাড়িয়া
পশিয়াছি কতদিন দেবদারু-বনে ;
বিরাট ন্যগ্রোধ এক আছে দাঁড়াইয়া,
প্রসারিয়া শাখা-বাহু শতস্তম্ভময়—
সে বিশাল পত্রঘন আতপত্র-তলে
কাননের অন্ধকার রহিয়াছে যেন
বিশ্বের রজনী মাঝে আরেক রজনী !
সেইখানে মাথা রাখি' বাহু-উপাধানে,
ওগো মৃত্যু ! হেরিয়াছি তোমার স্বপন
অন্ধকার ভ'রয়াছে অন্তর-বাহির,
স্তব্ধ চরাচর, শুধু শোনা যায় দূরে—
গভীর গর্জন-স্বনে পর্বত-নির্ঝরে

ঝরে বারিধারা—যেন বায়ুহীন ব্যোম
শিহরি উঠিছে তার 'ওম্ ওম্' রবে!
সেই ক্ষণে মনে হল, আত্মার নিশীথে
সহসা জ্বলিয়া ওঠে প্রভাত-প্রদীপ!
জন্মান্ত-তিমির টুটি' কে আসি' দাঁড়ালে
আমার নয়ন-আগে? সে কি তুমি নও?
কহ, দেব! কহ মোরে, ঘুচাও ভাবনা।

মৃত্যু। ঋষির তনয় তুমি, বাল-ব্রহ্মচারী—
এ বয়সে করিয়াছ কঠিন সাধনা,
মানস-নিগ্রহ; তাই কৃচ্ছ্র-তপস্যায়
নিপীড়িত কামনার ক্ষোভ সুগভীর
করিয়াছে অন্যমনা, বিষয়-বিরাগী।
নচিকেতা! ধরণীর বিপুল সম্পদ
হেরিয়াছ? জন্ম, মৃত্যু—দুই সীমান্তের
অন্তরালে আছে সুখ, দেবতা-দুর্লভ!
দেহের রহস্য নয় সহজ-সন্ধান!
অল্পভোগী দরিদ্রের দীন কল্পনায়
ক্ষুদ্র বটে জীবনের কামনা-পরিধি—
অতৃপ্ত-ক্ষুধার ব্যাধি, নিত্য-উপবাস
করে তারে মর্ত্ত্যসুখে ঘোর উদাসীন;
তাই তার সর্ব-দুঃখ, দুরাশার আশা,
সফল করিতে চায় মৃত্যু-পরপারে—
তুমিও কোরো না সেই বৈরাগ্য-সাধনা;
তরুণ তাপস তুমি, ভোগ-আয়তন
ফুল্লতনু যৌবন-উন্মুখ!—দুই চক্ষু
নীলোৎপল—ঢল ঢল, পীযুষ-পিয়াসী!
উদার তোমার মন, প্রসন্ন ইন্দ্রিয়—
ভুঞ্জিবে সকল সুখ তুমি মহীতলে।

মহাভূমি, হস্তী, অশ্ব, হিরণ্য প্রচুর
দিব তোমা—পরমায়ু সহস্র-শরৎ,
দেহে কান্তি, বক্ষে বীর্য, বল বাহুযুগে ;
দিব নারী অগণন—মোহিনী অপ্সরা,
রথারূঢ়া বাদিত্রবাদিনী ! কর ভোগ
সমুদয়, রতি আর প্রমোদ-কৌতুকে !
অমৃত ?—সে ব্যাধিতের বিকার-জল্পনা !
দেহের বিনাশ হয় কাল পূর্ণ হলে,
তারপর আবার জনম ; শস্যসম
জন্মিয়া পাকিয়া ঝরে, জন্মে পুনরায়
পৃথ্বী'পরে মর্ত্যজন, বর্ষঋতুক্রমে !
আমি শুধু করি উৎপাটন প্রাণ তার
মুঞ্জা হতে ঈষিকার মত। নচিকেতা !
দেহীর সহজ ধর্ম জানে সর্বজন,
নাহি পন্থা অন্যতর, জন্মান্তে আবার
জন্মিতে হইবে ধ্রুব !--কর পরিহার
বিফল বাসনা। জীবনের শ্রেষ্ঠ বর
করিতেছি অঙ্গীকার—বিত্ত আর আয়ু,
তার চেয়ে বড় কিবা, দেখ বিচারিয়া !

নচিকেতা। বিত্তে নহে তর্পণীয় চিত্ত পুরুষের !—
ওগো মৃত্যু ! জীবনের ঐশ্বর্য-আড়ালে
তুমি কেন চিরদিন আছ দাঁড়াইয়া ?
ধরার অমরাবতী, রুধি' বাতায়ন,
চিতাধূম নিবারিতে পারে ?—উৎসবের
আনন্দ-বাঁশরী, মিলনের মঞ্জুগাথা
কেন বা গুমরি' ধরে বিদায়ের সুর ?
ধরিয়াছ নানা ভোগ সম্মুখে আমার—
আছে সুখ, তৃপ্তি কোথা ? এই মোর দেহ
জরিবে না গুপ্তচর জরা সে তোমার ?

অন্তক তোমার নাম—তুমি কহিয়াছ,
প্রাণীদের প্রাণ-ধন কর উৎপাটন,
শস্য হতে ঈষিকার প্রায়!—কহ তবে,
কতকাল ভুঞ্জিব সে ভোগ সুদুর্লভ?
সহস্র-শরৎ আয়ু? তার বেশি নয়?
যম বুঝি বাঁধা আছে নিয়ম-শৃঙ্খলে?—
তাই তুমি নিয়তির কঠিন নিগড
ঢাকিতেছ ফুলদল দিয়া?—ধিক্ মৃত্যু!
ধিক্ প্রতারণা!—দেহ-অন্তে এক পথ!
নাহি পন্থা অন্যতর?—শুনে হাসি পায়!
বৈবস্বত! নচিকেতা জানে তোমা চেয়ে!
জানিয়াছি সেই সত্য—নহে বহুদিন,
শুনি নাই, হেরিয়াছি স্বচক্ষে আমার,
এখনো রোমাঞ্চ হয় সে কথা স্মরিলে!
শুন মৃত্যু! সে কাহিনী কহিব তোমায়।

পিতামহ বাজশ্রবা বানপ্রস্থ শেষে
প্রায়োপবেশন করি' ত্যজিলেন তনু
বিপাশার তীরে। কৃষ্ণা-দ্বাদশীর তিথি,
রজনী তৃতীয় যাম, দক্ষিণাগ্নি শিখা
শুভশংসী—পরশিল স্তূপকাষ্ঠ-মূলে,
জ্বলিয়া উঠিল চিতা। নদী পূর্বমুখী—
মিশিয়াছে একেবারে দিক্-চক্রবালে।
দাঁড়ায়ে অনতিদূরে আমি চেয়ে ছিনু
অন্যমনে, অন্ধকার আকাশের পটে।
হোথায় সে মহাকায় কৃষ্ণ তুরঙ্গমে
পিতৃলোকে পিতৃগণ দেন সাজাইয়া
তারার-মুকুতা-হারে! সহসা হেরিনু
ভূমিতলে—চিতা হ'তে হতেছে উদয়
সুবৃহৎ শশিকলা, তরণীর প্রায়,

পূর্বাকাশে! সেই ক্ষণে বিস্ময়বিহ্বল
হেরিলাম সে কি দৃশ্য স্বপ্ন-অগোচর—
দেহ-অন্তে পুণ্যবান্ বৃদ্ধ বাজশ্রবা
আরোহি' আলোক-যানে যান দেবলোকে!
ক্ষণ পরে চিতা ছাড়ি' কিছু উর্ধ্বে উঠি'
শোভিল সে চন্দ্রকলা সুদূর আকাশে
নদীসীমা-শেষে,—দিব্যচক্ষে হেরিলাম
আত্মার অমৃত-পন্থা মৃত্যু-পরিণামে!
ওগো মৃত্যু! পারিবে না ভুলাতে আমায়—
এ বিশ্বাস ত্যজিবে না মূর্খ নচিকেতা!

মৃত্যু। হে ব্রাহ্মণ, ত্যজিও না বিশ্বাস তোমার—
নহ মূর্খ! তোমা চেয়ে জ্ঞান-গরীয়ান
আছে নাকি আর কেহ সপ্তসিন্ধু-দেশে!
বালক! তোমার চিত্তে সত্য উদিয়াছে
অকলুষা পূর্ণশ্রদ্ধা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার!
তুমি ভাগ্যবান্, প্রসন্ন তোমার 'পরে
আত্মা প্রেমময়! তাই ললাটে তোমার
জ্বলিয়া উঠেছে হেন শুভ্র জ্যোতিশ্ছটা!
প্রবচন, বহুশ্রুত, সুমহতী মেধা—
কিছুই পারে না তাঁরে লাভ করিবারে;
আপনি যাহারে তিনি করেন বরণ,
সেই লভে!—ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয়!
লহ বর, যাহা ইষ্ট, ইপ্সিত তোমার।

নচিকেতা। এইবার নয়নের মিটাও পিপাসা—
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান্!

মৃত্যু। কোথা আবরণ, নচিকেতা?—নেত্র হতে
আপনি খসিয়া যাবে সূক্ষ্ম মায়াজাল;

মৃত্যুর রহস্য-কথা শুনিতে শুনিতে
শ্রবণ-উৎসুক চিত্ত হবে নির্বিকার,
মুহূর্তে সংশয়মুক্ত নেহারিবে তুমি
আমার স্বরূপ-রূপ অন্তরে বাহিরে !

শুন নচিকেতা !—হৃদয় দুর্বল যার,
মলিন, সংকীর্ণমনা, স্বভাবকৃপণ—
সেই নর যূপবদ্ধ পশুর সমান
মৃত্যুর আঘাত সহে জীবযজ্ঞভূমে।
ভয় তারে ক্ষুদ্র করে, মর্ত্য-মরু মাঝে
তৃষায় হারায় দিশা মৃগ-তৃষ্ণিকায় !
বার বার পড়ি' মৃত্যুমুখে, হয় তার
নিত্য অধোগতি ; দুই বদ্ধ করতলে
ধরিয়া রাখিতে চায় সর্বস্ব আপন,
তাই মূঢ় অতিলোভে হারায় সকলি !
মৃত্যু তার মহাভয় !—আমারে হেরিলে,
সংকুচিয়া সর্বদেহ, শশকের মত
রহে চক্ষু বুজি'—ভাবে বুঝি হেন মতে
এড়াইবে হিংস্র ক্রুর ব্যাধের সন্ধান !
সে জন চাহে না এই রূপ নেহারিতে—
তোমা-সম, নচিকেতা ! নয়ন বিস্ফারি'

নচিকেতা। এখনো হেরি নি তোমা—তবু মনে হয়,
সরিছে কুহেলিজাল, ধূম্রনীল দেহ
ঈষৎ দুলিছে !—রজনীর শেষ যামে,
বাঁধিছে উষার রথে শুক্লা-পয়স্বিনী
অশ্বিনীকুমার বুঝি ? আর কিছুক্ষণে
উদিবে আঁখিতে মোর হিরণ্ময়ী বিভা
দিগন্তপ্লাবিনী !

মৃত্যু। এইবার কহি শুন
আমার স্বরূপ—হে ব্রাহ্মণ! কহি তোমা
সেই বাণী, নিহিত যা গহন গুহায়!
কহিয়াছি কিছু আগে অগ্নিহোত্র-বিধি—
সেই অগ্নি জ্বলিছেন দিব্যজ্ঞানরূপী
তোমারি অন্তরে!—ওই দেহ চিতি তার,
প্রাণ হবিঃ, আমি তার সুচির-আহুতি!
বলবান্, আত্মাবান্, প্রজ্ঞাবান্ যেই—
আপনারে আপনি সে দেয় বলিদান
জগতের যজ্ঞ-যূপে, মহোল্লাসে মাতি'!
বিশ্বপ্রাণে বিলাইয়া নিজ প্রাণধন
ভুলে' যায় হর্ষ-শোক—চির-উপরতি
লভে বীর, সুমহান্ আত্মার আলয়ে।—
আমি যজ্ঞ, আমি সেই অপরূপ হোম!
যেই অগ্নি সেই সোম!—কহি আরবার,
ওই দেহ সোমের কলস! যজমান
করে সোমযাগ—করে পান আপনি সে
আপনারে, আনন্দই হবিঃশেষ তার!
সে আনন্দ—সেই মৃত্যু—অমৃত-সোপান।
এই যজ্ঞ করেছিনু আমি, নচিকেতা,
তারি ফলে লভিয়াছি ধ্রুব অধিকার
যমলোকে; এই যজ্ঞ করে যেই জন
মৃত্যুজয়ী হয় সেই নিঃশেষে মরিয়া!—
করি স্নান যজ্ঞশেষে, সর্বগ্লানিহারা,
আশ্বিনের অভ্রসম, শুভ্র সুনির্মল,
মিশে' যায় মহানভোনীলে!

নচিকেতা। ওগো মৃত্যু!
কোথা আমি? তুমি কোথা?—নয়নে আমার
নাহি আর কায়া-ছায়া। দৃষ্টি সৃষ্টিহারা
ডুবে যায় বর্ণহীন আলোক-পাথারে।
কর্ণে জাগে স্তব্ধতার মহামৌন-বাণী।
দেহ হল স্পন্দহীন!—রোমাঞ্চ, পুলক,
স্বেদ, কম্প, শিহরণ—কিছু নাই আর।
বীতরাগ, বীতশোক, বীতমন্যু আমি।
ভয় নাই, নাই আশা।—এই কণ্ঠে মোর
ধ্বনিবে না কভু আর স্তুতি, আরাধনা,
যাচনা, মিনতি!—এই মৃত্যু?—ধন্য আমি!—
বৈবস্বত। এতক্ষণে তোমার প্রসাদে
মরিলাম চিরতরে আমি নচিকেতা।

মৃত্যু। ধন্য তুমি!—শ্রুতিমাত্রে নিমেষে ঘুচিল
দেহপাশ!—সিদ্ধি যেন ভাবনা-রূপিণী!
কালের সায়রে বুঝি তুমি ফুটেছিলে
অমৃত-পরাগ-ভরা মর্ত্য-শতদল!—
আপন আবেগে তাই আপনি ঝরিলে।
মানিলে না যমের শাসন, পিতৃলোক
তব যোগ্য নহে!—আলো ভালো লাগিল না,
জীবনের অন্ধকার দুয়ার খুলিয়া
এলে তাই মৃত্যুপুরে, স্বপ্নাতুর-আঁখি,
সত্যের সন্ধানে! স্বপ্নশেষে এইবার
সুষুপ্তি-সাগর,—উদিবে তাহারি কূলে
সেই জ্যোতির্লোক—চন্দ্রতারকার ভাতি
ম্লান যেথা, দ্যুতিহারা বিদ্যুৎ-বল্লরী।
অগ্নি যেথা চিত্রবৎ—নিষ্প্রভ, মলিন।

হে ব্রাহ্মণ! হেরিলাম তোমার মাঝারে,
দেহজয়ী, কালজয়ী, মৃত্যুজয়ী সেই
পুরাণ-পুরুষে!—যাঁর মহা-মহিমায়
ঊর্ধ্ব হতে মহানিম্নে পশিছে আলোক,
নিম্ন হতে ঊর্ধ্বে উঠে আহুতির ধূম—
স্বর্গে-মর্ত্যে রহিয়াছে নিত্য-পরিচয়।
অমৃতের পুত্র তুমি, হে মর্ত্য-বান্ধব!
মৃত্যুপুরী তীর্থ আজ তোমার পরশে,
তোমারি প্রসাদে আমি চির-জ্যোতিষ্মান্!

নরেন্দ্র দেব

ফাল্গুনী

শীতের শিশিরসিক্ত ম্রিয়মাণ তৃণপত্র দলি
কে তুমি সহসা এলে চলি
শ্লথ জীর্ণ অন্তরের ম্লান অন্তঃপুরে?
অভিনব যৌবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে
জাগাইয়া অপূর্ব বিস্ময়
নিখিল হৃদয়
মাতাল করিয়া দিলে এ কোন্ উল্লাসে?
তোমার কুন্তল-গন্ধ মকরন্দ-সুরভি নিঃশ্বাসে
তোমারে চিনেছি আমি আজ—
তরুণের স্বপ্নরাজ্যে তুমি যে গো চির-যুবরাজ।
মধু-মাধবীর সখা, মরমীর পরানের প্রিয়,
উগ্র-উত্তরের আজ ছিন্ন করি হিম-উত্তরীয়
পরিহাস-লঘু-হাস্তে দুলাইয়া দক্ষিণ সমীর,
হে কিশোর বীর,
এলে তুমি অনন্ত-নবীন—
প্রকৃতির প্রহেলিকা মরণের কোলে, যুগে যুগে জরামৃত্যুহীন।

তোমার অধর-স্পর্শে ধরণী উঠিল ধন্য হয়ে,
আজি তার ভাণ্ডারের সকল সম্পদ নিঃশেষে যেন বা সঙ্গে লয়ে
চলেছে সে প্রণয়ীর প্রেম-অভিসারে
চলে সে যেমন বারে বারে
তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়া,
মিলন-ব্যাকুলা তার হিয়া—
জননীর গৌরবের লাগি
পুলকে শিহরি উঠে জাগি।
জনে জনে—ভুবনে যাহারা এতকাল
ছিল শুধু বুভুক্ষু কাঙাল
আপন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়
মিলনের বাধাবিঘ্ন, বিচ্ছেদের তীব্র যাতনায়
অসাড় হিমের ক্রোড়ে অচেতনে ছিল পড়ি যারা
বিরল পল্লব-পুষ্প, জীবনের আভরণ হারা
ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ নিকুঞ্জের মঞ্জু তরুলতা—
পাশরি মর্মর-গীতি বনান্তের অন্তরের কথা
ছিল যারা বেদনায় বিষাদে আনত
দাবদগ্ধ কাননের কাঙালের মত—
তোমার শুনিয়া শঙ্খ-রব
হে বিজয়ী বাসন্তী-বাসব,
তারা যে উঠেছে আজ অকস্মাৎ সঞ্জীবিত হয়ে,
সুখ-স্বপ্ন সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য-পসরা শিরে লয়ে,
দিকে দিকে ফুল্ল হাস্যে বিকশিয়া উঠিয়াছে ফুল,
কলি ও মুকুল—
চূতমঞ্জরীর সনে
কাননে কাননে
সুবাসের বিলাসে আকুল।
অশোক-পলাশবনে কুসুমিয়া কুসুমের মেলা
রঙিন রঞ্জন যেন আবীরে খেলিছে হোলিখেলা
বনে বনে—বরনের বিচিত্র বিপুল হেলা-ফেলা।

আনন্দের তীব্র পিপাসায়
সার্থকতা-সুখ-সাধ সম্ভোগের শাশ্বত-নেশায়
উন্মত্ত হয়েছে যেন কেশর-পরাগ-রঙ্গী-রেণু।
কুসুম-কিঞ্জল্ক-কানে শুনাইয়া পীরিতির বেণু
পাগল করেছ তুমি নিকুঞ্জের সারা পুষ্পবন ;
গন্ধভারে সুমন্দ পবন
যেন অর্ধনিমীলিত জড়িত নয়নে
ফুলের অধর-সীধু আস্বাদিছে কুসুম-শয়নে !

জানি জানি, মন্মথের মন্ত্রদূত তুমি ;
তোমার বাসন্তী-বাস, উত্তরীয়প্রান্তখানি চুমি
সসম্ভ্রমে নুয়ে
ও চারু চরণপদ্ম ছুঁয়ে
শান্ত হয় অশান্ত অন্তর !
হে চিরসুন্দর,
মিলনের যজ্ঞসূত্রে যোগী তুমি করেছ মানবে,
লালসার তৃষাতুর দুরন্ত দানবে
হিমানী-শৃঙ্খল খুলি মুক্ত করি দিয়াছ হে আজ !
ওগো ঋতুরাজ,
বর্ষে বর্ষে স্পর্শে তব প্রকৃতির বেপথু-অন্তর
হয়ে ওঠে মিলনের আনন্দে মুখর।
ধরণী নূতন করি সাজে পুন বিবাহের বধূ !
সেদিনের উৎসব-অঙ্গনে উৎসারিয়া জীবনের মধু
তুমি এসে দাঁড়াও হাসিয়া অকস্মাৎ—
তোমারে করিয়া প্রণিপাত
ভ্রমর গুঞ্জরি গাহে বরণের গান,
পিককণ্ঠে ওঠে হুলুধ্বনি
মর্ম-শিহরণী—
চরাচরে সৃজনের ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে ওঠে প্রাণ !

সেদিন বাসন্তী রাতে
হসন্তিকা জ্যোছনাতে
পূর্ণ করি পূর্ণিমার আকাশের কোল
তরুণী তারার দলে
চলে চন্দ্রাতপতলে
লীলায় লহর-লাস্যে হাস্যময়ী দোল।
দোলে প্রিয়, দোলে তার প্রাণ-প্রিয়তম
আনন্দ-হিল্লোলে অনুপম!
দোলে বুকে দুলালী যে প্রিয়া
দোলে বিশ্বে নিখিলের হিয়া,
বাসনার রক্তরাগে রাঙা হয়ে ওঠে যত প্রাণ।
জগৎ ছাপিয়া শুধু উঠে সেই মিলনের গান-
কালিন্দীর কলঙ্ক-কিনারে
নির্বিচারে
একদিন যে দুটি পরান
পরম-প্রিয়ের বুকে দিয়েছিল সঁপি আপনারে
তুচ্ছ করি বাধা-বন্ধ নিষেধের সকল বিধান।

* *

ফাল্গুনের হে নব ফাল্গুনী—
আজও তাই শুনি
প্রসূন-গাণ্ডীবে তব মুহুর্মুহু কোদণ্ড-টঙ্কার,
সম্ভোগের সঙ্গীত-ঝঙ্কার
দিগন্ত ছাপিয়া উঠে যবে
মদনের আনন্দ-উৎসবে॥

কালিদাস রায়

ভাদুরাণী এস ঘরে

নিভায়ে তপন ভাদর গগন ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে,
সঘনে গরজি বিজলি চমকে ভ্রূকুটি হানে সে রেগে।
হেরি বাদলের ক্ষণিক ক্ষান্তি পাখী কলতান ধরে,
এ হেন বাদরে আদরিণী মেয়ে ভাদুরাণী এস ঘরে।

টোপর পানায় পুকুর ভরেছে, কোনোখানে নাই ভাঙা,
জলা ব'লে মনে হয় ডাঙাগুলো, জলে মনে হয় ডাঙা;
ভুলে ভরা সব, কোথায় ফেলিতে কোথায় চরণ পড়ে,
এ হেন দুপুরে থেক নাকো দূরে, ভাদুরাণী এস ঘরে।

ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে,
কাঁকড়া-শামুক-মাছ-ব্যাঙে ভরা নালী গেছে এঁকে-বেঁকে;
আজি পাট-ক্ষেতে হাতী ডুবে যায়। মন যে কেমন করে!
কাঁদিছে দাদুরী,—আদরিণী মেয়ে ভাদুরাণী এস ঘরে।

বনপথ-তল হয়েছে পিছল, ডুবেছে ঘাটের সিঁড়ি,
গোরুগুলি বাঁধা গোহালে গোহালে, কৃষাণ আসিছে ফিরি।
বাদলা বাতাসে ভূতের মতন ঝাউগাছগুলি নড়ে,
কি বিপদ আনে কখন কে জানে!—ভাদুরাণী এস ঘরে।

কুকুর ধুঁকিছে ঢেঁকিশালে শুয়ে, ময়না ঝিমায় শিকে,
কুণ্ডলী রচি উঠে ঘন ধূম চাল ফুঁড়ে চারিদিকে।
বাবুইএর বাসা তালগাছ হতে ছিঁড়িয়া পড়েছে ঝড়ে,
জুঁইবন হায় কাদায় লুটায়,—ভাদুরাণী এস ঘরে।

হাত পেতে আছে ছেলেরা, ভাজিছে মা তাদের তালবড়া,
বালিকারা মিলি আড়াআড়ি করি গাহিছে তোমার ছড়া।
ঘরের সাঙায় কপোত ঘুমায়, বসে না চালের 'পরে,
নীড়ের বাহিরে কেউ নেই আজ, ভাদুরাণী এস ঘরে।

আসিয়াছে ঢল, খেয়াঘাটে গোটা প্রহরে জমিছে পাড়ি,
পাল তুলে শত নৌকা চলেছে, কোথা কোন্ দেশে বাড়ি।
উচাটন মন তোমা সারাখন চারিদিকে খুঁজে মরে,
কোথা ডামাডোল বেধেছে কে জানে! ভাদুরাণী এস ঘরে ॥

—আহরণ

পল্লীর ঘাটে

একরাশি এঁটো বাসনের মাঝে একলা পা দুটি মেলে,
খিড়কির ঘাটে নূতন বৌটি নয়নের জল ফেলে।
বাসনের ভার সামলানো দায়, নামিতে পিছল ঘাটে
পাথর-বাটিটি পড়ে ভেঙে গেছে ঠেকিয়া তালের কাঠে।
দশ পয়সার পাথরবাটিটি দু'বছর আগে কেনা,
তায় কোণ-ভাঙা তুচ্ছ জিনিস, দামী কেউ বলিবে না।
দুইটি টুকরা জোড়া দিয়ে বধূ অঞ্জলি-পুটে ধরি'
ঝাপসা চক্ষে চেয়ে আছে আহা মুখখানি নত করি।
হেরিছে অভাগী জমা লাঞ্ছনা বাটির মুকুরপুটে,
অম্ল খাবার বাটিটি ক্রমেই লোনা জলে ভ'রে উঠে।
ভাবে বসে হায় লাগে নাকি জোড়া কোন মন্ত্রের বলে!
কোন গুণী এসে সহসা যদি বা জুড়ে দেয় কৌশলে।
শ্বশুরবাড়িতে আসিবার আগে কেন লয় নাই শিখে
কি দিয়ে জুড়িলে জোড়া যায় ভাঙা পাথরের বাটিটিকে।
দেবতায় ডাকে অভ্যাস-বশে, দেবতা বাঁচাবে যেন;
বাটিটা ভাঙিল, পড়িয়া তাহার মাথা ভাঙিল না কেন?

বড় অভিমানে দেবতার পানে চেয়ে অভাগিনী কাঁদে,
"বল ভগবান্, হাত কেঁপে গেল কোন্ গূঢ় অপরাধে?"
একবার ভাবে, নূতন একটি কিনে এনে এরি মত,
কোণা ভেঙে যদি চালানোই যেত, তাহলে কেমন হত?

কোথায় পয়সা ? কে বা দেবে এনে ? কোথায় মিলিবে বাটি ?
সময়ই বা কই ? সকলি স্বপ্ন, ভাঙাটাই শুধু খাঁটি।
পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিতে কেমন লাগিছে ভয় ;
একবার ভাবে, বাপের বাড়িতে পালালে কেমন হয় ?
কোন্ পথে যাবে ? কারে সাথে পাবে ? না না, তা অসম্ভব ;
ভাঙা বাটি ঘেরি ভাবনা-জনতা তোলে শুধু কলরব।

হাঁসগুলি ঘেঁসে ঘাটপানে আসে ঘনাইয়া মমতায় ;
পাখীরা নীরব, বাঁশবনে বেজি করুণ নয়নে চায়।
ভুলো লেজ নেড়ে জানায় বেদনা, জিভ ঝুলে পড়ে তার ;
থম থম করে দুপুরবেলায় খিড়কিপুকুর ধার।
ফুলের গরবে মাথা উঁচু ক'রে ছিল যে কলমি-লতা
মুষড়িয়া প'ড়ে ঝলসিয়া যেন জানায় সে কাতরতা।

সবাই ব্যথিত ; মা বলিয়া বালা ডাকে যারে ঘুরি-ফিরি,
সে-ই শুধু তার হৃদয় চিরিতে শানায় রসনা-ছুরি।
পাথরের বাটি ভেঙে যায়, যদি একটু চরণ টলে—
পাথরের হৃদি ভাঙে না গলে না বধূর নয়নজলে ॥

—আহরণ

সুশীলকুমার দে

প্রাক্তনী

ছায়ার কায়াটি ধরিয়া, মায়ার রথে
কতবার তুমি এসেছ গিয়েছ ফিরে,
মৌনী মনের আঁধার-আড়াল পথে
বেদনা-বাহিনী বাসনার তীরে-তীরে ;

চিনি চিনি করি' চকিতে চিনেছি যারে,
চিনিয়া আবার হারায়ে খুঁজেছি তারে,
স্বপ্নের সেই কনক-কণিকাটিরে।

হে মোর ক্ষণিকা রূপহীন-রূপে গড়া,
তবুও লুকাতে পারনি গোপন প্রাণে,
বারে বারে তাই জীবনে দিয়েছ ধরা
শত-জনমের জাড়ালের মাঝখানে ;
মানস-মৃণালে কামনার মঞ্জরী,
তিলে-তিলে তব তনুটি উঠেছে গড়ি',
ফুটেছে আবার আমার মুখের পানে।

বরমাল্যটি পরায়ে স্বয়ম্বরে
কতবার তুমি হয়েছ সুখের সাথী,
অশ্রুধারায় ঝরেছ আমার তরে
কাটায়ে একেলা দীর্ঘ দুখের রাতি ;
মধু-পরিহাসে কত না সকালে সাঁঝে
চোখে জলভার দেখেছি হাসির মাঝে,
কত-না লীলায় লীলায়িত রূপ-ভাতি।

দিয়েছ দীপ্ত চরণ-অলক্তকে
গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রাণ-মন মোর ভরি' ;
তুচ্ছ করিল কল্পনা-স্বর্গকে
আমার ধরণী তোমারে বক্ষে ধরি'।
নিষ্কলঙ্ক শঙ্খ তোমার হাতে
বাজিল আবার শুভ কঙ্কণ সাথে,
জ্বলিল প্রদীপ স্নেহ-রসে থরথরি'।

কতবার এলে তপোভঙ্গের তরে
জিনিয়া লইতে মোরে জীবনের মাঝে ;
কত তপোবনে একান্ত অন্তরে
আমারি ধেয়ানে জাগিলে তাপসী-সাজে ;

কতবার কেন এলে আর গেলে চলি'
ক্ষণতরে মোরে বাহুবন্ধনে ছলি' ?—
দ-ব্যথা তাই ত বক্ষে বাজে।

পথহারা তাই যুগে যুগে বারে-বারে
ফিরেছি ঘুরিয়া বেদনের নিবেদনে
ধূসর ঊষর মর্ম-মরুর পারে,
কখনো গহন মনের বিজন বনে।
ধ্যানের নয়নে উঠিয়াছ তাই জাগি' ;
বরেছি হাসিয়া মৃত্যুরে তোমা' লাগি' ;
কেঁদেছি বসিয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে।

জনমে জনমে, হে আমার প্রাক্তনী,
কত খেলা কত দেহে-দেহে সঞ্চরি',
সব সুখ-দুখ স্মৃতি-আশা মন্থনি'
তনুর পাত্রে অতনু সুষমা ভরি' ;
সে কায়ার মায়া জড়াল আমারে বুকে,
যমেরে তাড়াল,—কতবার হাসিমুখে
বসিল চিতায় আমার চরণ ধরি'।

কতবার সেই দেহটি বেঁধেছি বুকে,
চোখের আড়ালে কেঁদেছি বিরহ-ছলে,
সুধাসুমধুর-বেদনা-বিধুর সুখে
তন্ময় হয়ে ফিরেছি এ ধরাতলে ;
স্কন্ধে সে-দেহ ধরিয়া ভুবন সারা
প্রলয়-পাগল ছুটেছি সকল-হারা,—
কখনো ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে।

হারায়ে হারায়ে ফিরে ফিরে পাই যারে
মরণের স্রোতে জন্ম-বিবর্তনে,
চির-পিপাসায় তারি প্রেম বারে বারে
অমৃতায়মান মরণের অমরণে ;

হারামুখখানি তাই বুঝি অমলিন
লুকায়ে আবার দেখা দেয় চিরদিন,
দ্বিগুণ সরস হৃদয়ের চুম্বনে।

ওগো প্রাক্তনী, চিরকাল সাথে থাকি'
এসেছ আবার সব স্মৃতি অবগাহি'—
অনেক কালের ভুলেছ সে-যাত্রা কি?
চিরপুরাতন মোরে আর মনে নাহি?
আনিয়াছি তাই আমি তব অনুরাগী
এ জনমে শুধু এই গান তোমা' লাগি'
বিপুল পথের বিচিত্রকথা-বাহী॥

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাদল-রাতের প্রলাপ

সেদিন যখন বাদল-রাতে
কণ্ঠ ফুলের মালার সাথে
জড়িয়ে নিয়েছিলাম বাহুডোরে,
তোমার দুটি কানের দুলে
ভ্রমরসম কৃষ্ণ চুলে
কি ছিল যে কইতে নারি তোরে!
হাওয়ার সনে বাদল খেলে
অন্ধ নিশির আঁধার ঠেলে
বৃষ্টি ঝরে শব্দে রিমি-ঝিমি,
কোথায় দূরে বনের বুকে
আর্দ্র পাতা দোলায় সুখে
বজ্র ডাকায় গমক দ্রিমি-দ্রিমি,—

সেদিনে সেই বাদল-রাতে
কণ্ঠ তোমার মালার সাথে
জড়িয়ে নিয়েছিলাম বাহুডোরে,
তোমার দুটি কানের দুলে
ভ্রমরসম কৃষ্ণ চুলে
কি ছিল যে কইতে নারি তোরে।

জানি না ওই দেহের মাঝে
কোথায় যে এক বাঁশি বাজে,
কোথায় যে এক কমল বিকসিত,
সেই বাঁশরীর ছন্দ-সুরে
সারা জীবন বেড়ায় ঘুরে,
খোঁজে কমল কোথায় অলখিত,
চুম্বনে আর আলিঙ্গনে,
চোখে চোখে মিলন সনে,
তোমার দেওয়া কিম্বা চাওয়ার লাজে,
ফাগুন-সাঁঝে, জ্যো'স্না-রাতে,
গহন ঘন বাদল সাথে
ধরতে চাহি কোথায় বাঁশি বাজে!
কোথায় সে যে গোপনতম,
মৃগনাভিমৃগের সম
নিজেই নিজের জান না উদ্দেশ?
শুকিয়ে ওঠে গলার মালা,
গোপন কর চোখের জ্বালা,
কোথায় যেন মিলায় বাঁশির রেশ।

কোথায় বালা? কোথায় বাজে?
ওই কি যুগল বুকের খাঁজে?
কিম্বা কালো আঁখির-তারা-তলে?

কিম্বা জোড়া ভুরুর টানে ?
হংসী-গ্রীবা-রেখার গানে ?
কিম্বা প্রাণের যেথায় বাতি জ্বলে ?
কোথায় বালা ? কোথায় বাজে ?
গোপনতম হিয়ার মাঝে ?
কিম্বা দীঘল চুলের সুরভিতে ?
কিম্বা কমল-অধর-ফাঁকে ?
শ্রোণীভারের কোমল বাঁকে ?
কিম্বা মরালসম চলার গীতে ?
কোথায় বালা ? কোথায় বাজে ?
ধরতে তারে পারি না যে—
সবার শেষে শূন্য থাকে বাকি,
একদা যা নিবিড়তম
হঠাৎ সবি স্বপ্নসম
কোন্ চালাকির যেন দারুণ ফাঁকি।

দারুণ ফাঁকি ? যদি বা হয়,
এই নিমেষে সত্য সে নয় ;
যতক্ষণ ওই ঠোঁটে হাসি টানা,
যতক্ষণ ওই বুকের তলে
একটা মিলন-বাতি জ্বলে,
একটা বীণার বাজছে তা না না না
যতক্ষণ ওই গণ্ড দুটি
গোলাপ হয়ে উঠছে ফুটি
চপল চোখের গহন চাহনিতে,
নীরস মম বুকের মাঝে
একটি গোপন কথা বাজে
জীবনখানি ভরছে কাহিনীতে,—
দারুণ ফাঁকি ? কভুও নয় !
কোন্ যে কবির হতেছে জয়,

গহন মরুর উষর বুকের 'পরে
নন্দনেরি গন্ধ ওঠে
জাদুকরের স্পর্শে ফোটে
পারিজাতের স্তবক থরে থরে।

আমরা কি রে যন্ত্রসম ?
গোপনতম গভীরতম
দুটি দিনের গানের মতো সুখে
গোপন তাহার চরণ ফেলে
সোনার বরন স্বপন মেলে
অলক্ষিতে ভরে মোদের বুক এ,
একটি আনন দুইটি আঁখি
বিশ্বে সকল ফেলে ঢাকি,
রঙীন করে জীবন-তরী বাওয়া,
একটি সহজ জয়োল্লাসে
জটিল সহজ হয়ে আসে
পাল ভরে যে দিগন্তরের হাওয়া,
দুইটি দিনে অরিন্দম
আবার মিলায় স্বপ্নসম
রাখতে ধ'রে পারে না কেউ টানে,
কোথায় কে যে যন্ত্রী ব'সে
খেলছে পরিহাসের রসে
কেউ কি জানে ? কেউ কি তাহা জানে

কাজ কি সে সব জানাজানি।
এই যে মধুর কানাকানি
বাদল রাতের ওই যে রিমি-ঝিমি,
অমানিশার অন্ধকারে
সুদূর ভিজে বনের পারে
বজ্র-রবের গমক দ্রিমি-দ্রিমি,

শিথিল তনু অবশ হিয়া,
　　প্রিয়ের বুকে এই যে প্রিয়া,
　　　　এই যে প্রয়াস উজাড় ক'রে দিতে,
অতিক্রমি' মাটির কায়া
　　কোথায় যে এক বাঁশির মায়া
　　　　ভরছে সবি একটা মোহন গীতে।
এই যে খেলা দুটি হিয়ার
　　প্রণয় এবং শরম প্রিয়ার—
　　　　নয় রে মরু নয় রে মরীচিকা ;
হাজার ফাঁকি ভ্রান্তি মাঝে,
　　জীবনব্যাপী ব্যর্থ কাজে
　　　　একটি সহজ জয়ের শুভ টীকা ॥

—ইন্দ্রধনু

হেমেন্দ্রলাল রায়

সাগরিকা

ছোট নাওখানি ভাসায়ে দিয়েছি
　　　　নীল সাগরের জলে,
ঘুরে ঘুরে সে যে মনের খেয়ালে
　　　　মানিক কুড়ায়ে চলে।
নীল সে সাগর—ঢেউয়ে ঢেউয়ে যায়
　　　　মুরছিয়া পড়ে মায়া,
তারি মাঝখানে মোর তরীখানি
　　　　এতটুকু রচে ছায়া !

কত লোকে বলে—যা কুড়ালি ওরে
　　　　ওগুলো মানিক নয়,
শুক্তির মাঝে নেই—নেই তোর
　　　　মুক্তার পরিচয়।

মুক্তা বলিয়া যা কুড়াই তার
হয়ত সকলি ঝুটা,
হয়ত কেবলি ঝিনুকের হাড়ে
ভরিয়াছি দুটি মুঠা !

ঐ যে সাগর—নীলার সাগর—
সেও কি কেবলি ফাঁকি ?
হোক ফাঁকি—তবু দু আঁখি বাড়ায়ে
তারি পানে চেয়ে থাকি।
এ মায়া তাহার মরীচিকা কি না
সে কথা কিছু না জানি,
আমি জানি শুধু—ঘর ছাড়ায়েছে
আমারে ও হাতছানি !

হাতছানি দিয়ে ডাকে সাগরিকা—
সাগরতলের বালা,
গলায় যাহার জড়ানো রয়েছে
নীল মুকুতার মালা,
যার কেশপাশ সুরভিয়া চলে
নীল আকাশের বাও,
তারি ইশারায় আমি ভাসায়েছি
অকূলে আমার নাও !

ঝিনুকের ন্যায় ক্যাপা দরিয়ায়
সাগরিকা দেয় পাড়ি—
তারি পথ চেয়ে নাও চলে বেয়ে,
সে-চলা কেমনে ছাড়ি ॥

—মায়াকাজল

প্রতিদিন সন্ধ্যাকাশে রক্তিম চিতায়
আমার জীবন হতে খ'সে পুড়ে যায়
একে একে কত না দিবস ; প্রতি সাঁঝে
উছল আঁধার মোর শ্রবণের মাঝে
চুপি চুপি বলে যায়,—কোথা গেল ডুবে
কোন্ মৌন সিন্ধু মাঝে, অতলের কূপে
ক্ষুদ্র জীবনের তব মণিমাল্য হতে
একটি রতন ; মুগ্ধ নয়নের পথে
দেখি যেন ভেসে যায় সুদূর আকাশে
একটি পরম ক্ষণ সুদীর্ঘ নিশ্বাসে।

অন্তরে চাহিয়া দেখি,—এ ত আগুয়ান,
দিনে দিনে চ'লে চ'লে বাড়িছে পরান ;
আবার ভাবিয়া মরি,—এ ত পিছে যাওয়া,
এ ত শুধু দিনে দিনে মরণেরে পাওয়া ॥

—অরুণিমা

রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পথ

দূর্বা দিলে সবজে শাড়ি
পরিয়ে এসে তায়,
শিউলি এসে সাদার জরি
সাজায় শাড়ির গায়

অপ্‌রাজিতা উজল নীলে
ওড়নাটি তার রাঙিয়ে দিলে ;
হিজল বলে হেসে, তোমার
আলতা পরাই পায়।

কোকিল বলে, কণ্ঠ খোলো ;
ঝিল্লি বলে, ধরো,
এই যে কাঁকন, এই যে ঘুঙুর,
এই যে ঝুমুর, পরো।
নীহার বলে কেঁপে কেঁপে,
আর কেন ছাই নয়ন ছেপে ?
পথ বলে, হায়, পথিক-পায়ের
পরশ সে কোথায় ॥

—আলেয়া

নিদ্রা-হারা

রূপার থালে জালিয়ে থুয়ে
কর্পূরেরি বাতি,
কাহার লাগি নিদ্রা-হারা
তুমি নীরব রাতি ?
নীলাম্বরীর আঁচল 'পরে
সাজাও নারী, কাহার তরে
অমন ক'রে থরে থরে
মোতির মালা গাঁথি ?

ওই সুদূরের ছায়াপথে
ওই অসীমের গায়
আসছে কি সে তোমার প্রিয়
নূপুর-পরা পায় ?

সেই নূপুরের আভাস পেয়ে
আছ বুঝি আকুল চেয়ে ?
ব্যাকুল বুকের কাঁপন লেগে
বাতাস কাঁপে হায় !

রূপার থালে জালিয়ে থুয়ে
কর্পূরেরি বাতি,
কাহার লাগি নিদ্রা-হারা
তুমি নীরব রাতি ?
সাদা মেঘের মতন, দূরে
উত্তরী ও কাহার উড়ে ?
নীহার-ভরা নয়ন তোমার
হর্ষাবেগে কাঁদি ॥

—আলেয়া

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মায়াময়ী

রাজার ছেলে ডাকিল, শোন, পাতালপুর-রাজার মেয়ে !
ঊর্মিমালা মর্মরিয়া চতুর্দিকে উঠিল গেয়ে।
আকুল সুর আকাশে ওঠে, বাতাসে কাঁপে, পাতালে নামে,
মাতাল বাঁশি বিরামহারা বাজিয়া চলে, নাহিক থামে।

সোনালী সাঁঝে গোলাপী আলো, মেঘেতে রাঙা লেগেছে ঘোর,
অপরিচিতা এ-ধরা কেন পড়ে নি ধরা নয়নে মোর ?
কাননে মধু, কুসুমে মধু, ভুবন মধুমাধুরীময়,
মানস-মধু খুঁজিয়া ফিরি কোন্ গুহাতে গোপন রয় ?

আমার ধরা অনিন্দ্য সে, আনন্দ যে ধরে না আর,
তুমি না এলে কেমনে বল বহিবে হেন পুলকভার ?
সুরের জ্বালা সহিতে নারি সকল তনু দহন করে,
গহন বনে বহ্নিশিখা, গোপন মনে আগুন ধরে।

সাগর-নীল স্বপন চোখে, দিঠির তলে আলোক-ছায়া,
তারকা-মণি-খচিত কেশ রচিছে কালো রজনী-মায়া,
কুমুদ-কম গৌর তনু, মরালী-সম গরবী গ্রীবা,
মুকুতা-সম সুমসৃণ অঙ্গে ঝরে জ্যোৎস্না-বিভা।

আঙুল চাঁপা, মৃণাল বাহু, বিম্বাধরে মোহন হাসি,
উরসে আসি মুরছি পড়ে লীলার ভরে সলিলরাশি,
সবুজ-সোনা বসন বোনা কোমল-শ্যাম শৈবালেতে,
তরঙ্গেরা বিলুণ্ঠিত অঙ্গ-সুধা-স্পর্শ পেতে।

অশ্রুজলে মুকুতা ঝলে, হাসিতে ঝরে মানিক-রাশি,
সমীর-শ্বাসে আসে কি দেহ-কমল-মধু-সুরভি ভাসি ?
আকাশে চাঁদ উঠিল হাসি, সাগরে বুঝি জোয়ার এল,
ভাসিল বেলা, বনের ভূমি, সকল কূল ভাসিয়া গেল।

পাতালপুরবাসিনী বালা, ডাকিছে বাঁশি ব্যাকুল স্বরে,
আমার বাঁশি বাজিলে, বল, কেমনে তুমি রহিবে ঘরে ?
গহন-তলে গভীর জলে স্বপন-সম সহসা মেশো,
হে নাগরাজ-কন্যা তুমি অতল হতে উঠিয়া এস।

সুখ-আকুল বেদনা কাঁদে উচ্ছ্বসিত বুকের মাঝে,
জলের ছল-ছল-ধ্বনি কনকপীত বেলায় বাজে।
হিল্লোলিত সলিল-গায়ে লাবণ্যেরি বন্যা জাগে,
সাগররাজ-কন্যা জাগো, ব্যাকুল বাঁশি কাতরে মাগে।

স্তব্ধ নীরে মীনের নারী, ফণিনী ফণা তুলিয়া ধরে,
সুরের ঘোরে স্বপ্নাতুরা দু-চোখে নাহি পলক পড়ে।
শীতল-মণি-শয়ন হতে—ডাকিছে বাঁশি—কন্যা জাগো,
কেমনে তুমি তন্দ্রাময়ী, চেতনাহারা ঘুমায়ে থাকো ?

আমার দেশে আসিতে শেষে সহসা ফিরি চলিয়া গেলে,
তোমার লাগি পৃথিবী কাঁদে, কাঁদি যে আমি রাজার ছেলে।
আকাশে আলো-প্লাবন আসে, সাগরজলে জোয়ার এল,
পেলে না সাড়া, এলে না তুমি, মধুর তিথি বহিয়া গেল।

সিন্ধু জাগে, সে কারে মাগে, ঊর্ধ্ব বাহু, আত্মহারা,
তীরের কাছে তমালবনে পাই যে জাগরণীর সাড়া!
সাগর-বারি রুষিয়া ওঠে, ফুঁসিয়া ওঠে, ফুলিয়া ওঠে,
আবেশ-সুখে ঢুলিয়া পড়ে, আবেগ-ভরে দুলিয়া ওঠে।

সুনীল-মণি-শয্যা ছাড়ি অতল হতে উঠিয়া এস,
উল্লসিত ঢেউয়ের 'পরে পারের পানে ছুটিয়া এস ;
সাগররাজ-কন্যা জাগো! এমন শশী অস্তে গেলে
ধরণী হবে মাধুরী-হীনা—বাজায় বাঁশি রাজার ছেলে।

রবে না যামি, রব না আমি, রবে না হেন বসুন্ধরা,
রবে না জলে আলোক-মায়া, রবে না বায়ু গন্ধভরা ;
আমার বাঁশি বাজিয়া যাবে, বাজিবে শুধু তোমার তরে
জন্ম হতে জন্মে পুন, যুগ হতে যে যুগান্তরে।

হে ঈপ্সিতা, ধরণীভীতা, চকিতা, চির-দয়িতা অয়ি,
অতল হতে উঠিয়া এস, হে সুন্দরী, স্বপ্নময়ী!
জন্ম হতে জন্ম পরে আবার আমি আসিব ফিরি,
আমার বাঁশি বাজিবে নিতি স্বপন-গীতে তোমারে ঘিরি ॥

সুধীরকুমার চৌধুরী

প্রথম দেখা

সবই জানো, সব শুনেছ, জানি না কি ?
একটি কথা শুনতে কেবল আছে বাকি।
বলব চোখের জলে ভাসি',
তোমায় আমি ভালোবাসি,
দেব্‌তারে মোর ডাকতে গিয়ে তোমায় ডাকি।
কালকেও যা শুনেছ তা সত্য বটে,
কালকে আঁকা পড়ল যে রূপ চিত্তপটে,
আজকে ত তার রঙের লেখা
একটুও আর যায় না দেখা।
নূতন রঙে প্রাণের পাতে যারে আঁকি,
বাসছি ভালো তারেও যে,
বলব না, তা মন কি বোঝে!
কেমন ক'রে কোন্ প্রাণে তায় দেব ফাঁকি ?

প্রথম দেখা কৈশোরেরই প্রান্তদেশে,
হরেছিলে পরান-মন এক নিমেষে।
আজকে হেরি ভোরে উঠে,
পরান-মন নিলে লুটে
নূতন ক'রে নূতনতর এ কোন্ বেশে!
কত রসে, কত যে ঐশ্বর্যভারে
দেহের ডালি উঠল ভরে বারে বারে।
প্রতি উষার আলোর কোলে
একটি ক'রে পাপড়ি খোলে,
তার পরিচয় শেষ ক'রে নিই দিনের শেষে।
হে চির-রহস্যময়ী,
আমার প্রাণের অর্ঘ্য বহি
তোমায় খুঁজি যৌবনের এ প্রান্তে এসে!

তোমার সবই যেমন ছিল তেমনি আছে ?
আমি ত আর নেই সে আমি আমার কাছে !
প্রতিটি দিন নূতন প্রান্তে
হয় যে দেখা নিজের সাথে,
নূতন আলোর রঙ ঝরে কোন্ রঙিন কাচে।
নিজের মাঝে তাকিয়ে আজ পেলাম যারে,
ধরায় এল এই সে প্রথম একেবারে।
আজ ভোরে তার শুভক্ষণে
প্রথম দেখা তোমার সনে,
তাই বুকে তার প্রখর তালে রক্ত নাচে।
কাল শুনেছ ভালোবাসে
কার কাছে তা জানে না সে,
তার কথাটি শুনলে তবেই সেও বাঁচে ॥

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিড়ম্বনা

তোমার গলে দিইছি মালা
সেই ত আমার লজ্জা,
অগ্নিমরু-মরীচিকায়
হায় রে বাসরশয্যা !

ফোটা ফুলের দলে দলে
কাঁটার জ্বালা তীক্ষ্ণ,
তোমার সিঁথেয় দিলাম চিতার
ছাই—সধবার চিহ্ন।

বিয়ের চেলী রঙিন হ'ল
দীর্ণ বুকের রক্তে,
ধূপের ধোঁয়া করলে আঁধার
দীপান্বিতা নক্তে।

হায় রে যুগল প্রাণের মিলন
হায় বরণের অর্ঘ্য,
মুগ্ধ আঁখির স্নিগ্ধ জ্যোতি
হায় হৃদয়ের স্বর্গ!

হায় রে আমার মনের মানিক
হায় হৃদয়ের রত্ন,
কলুষহরা জলুষভরা
কি জানি তার যত্ন।

ওরে আমার পাথার-জলের
জ্যোৎস্না-মাখা ঢেউটি,
বিজন আঁধার ঘরের কোণে
যত্নে-জ্বালা দেউটি!

ওরে আমার ফুলবাগিচার
ফুলের সেরা পদ্ম,
ওরে আমার চাঁদনী রাতের
জ্যোৎস্না অনবদ্য!

ওরে আমার মুকুল বনের
বকুল বুকের গন্ধ,
ওরে আমার নিশিভোরের
উতোর হাওয়া মন্দ!

ওরে আমার সাগর-বেলায়
কুড়িয়ে-পাওয়া শুক্তি,
স্বপন-ছোঁয়ার মোহন মায়া
অরূপ রতন মুক্তি।

তোমার রূপে মুগ্ধ আঁখির
সে কি ব্যাকুল দৃষ্টি,
মন-চাতকের আকুল তৃষায়
বচনসুধার বৃষ্টি!

নখের ডগায় বহ্নিশিখায়
জ্বলছে রূপের দীপ্তি,
বাহুর পাশে বক্ষে বেঁধে
কি সে গভীর তৃপ্তি!

অধর 'পরে অধর-পরশ
ক্ষেপায় শিরা মজ্জা,
অথির বুকের থির সাগরে
হায় রে শেষের শয্যা

—মধুমালতী

ভাগ্যলক্ষ্মী

তুমি এলে উৎসবের আনন্দমুখর এক রঙিন সন্ধ্যায়
সন্ধ্যা-মণি রজনীগন্ধায়
আবরিয়া তনুখানি; লীলায়িত আনন্দের খনি,
আমার নয়ন-আগে দাঁড়ালে যখনি
ভরিয়া সুবর্ণ-ঝাঁপি কল্যাণের পঞ্চশস্য দিয়া,
তখনি কাঁপিল মোর হিয়া
অজানিত আশঙ্কায়।
মর্মের সহস্র তন্ত্রী ব্যথিয়া উঠিল বেদনায়।

তুমি এলে, তারি সাথে এল প্রিয়ে, সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাত।
তরুণ অরুণ-দীপ্ত যৌবনের নির্মল প্রভাত
দীর্ঘশ্বাসে হয়ে এল ম্লান ;
আমার সমস্ত প্রাণ
বক্ষপঞ্জরের দ্বারে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গম সম
তোমারি সকাশে, প্রিয়তম,
ছুটে যেতে লুটে প'ল বারবার,
দেখা তবু পেল না তোমার !

বসন্তের শুভ আগমনে
যে ফুল ফুটিয়াছিল মর্মতলে নিকুঞ্জকাননে,
কুঁড়ির মাঝারে তার ফুটিবার বেদনা গভীর ;
সারাদিন ব'য়ে গেল দখিনা-সমীর,
ব্যর্থ হ'ল আসা-যাওয়া তার।
হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার
মর্ম-ছেঁড়া করুণ-কাহিনী, ব্যক্ত হ'ল ভ্রমরগুঞ্জনে,
ভুঞ্জি' মধু ক্ষণে ক্ষণে
প্রলুব্ধ করিয়া ফুলে বাড়াইল বিরহের ব্যথা ;
হৃদয়-মাধবী-লতা
এতটুকু পেল না আশ্রয় ;
কলি বুঝি ফুটিবার নয়।
বসন্ত বিদায় নিল শুষ্ক কলি দীর্ণ কিশলয়ে,
হৃদয়শোণিতে লেখা স্মৃতি-রেখা রাখি' দিগ্বলয়ে।

তুমি এলে, সঙ্গে করে নিয়ে এলে অফুরন্ত হাসির সম্ভার,
নিমেষে উল্লসি' ওঠা সমুদ্রের তরঙ্গ অপার ;
দুলিয়া ফুলিয়া উঠি' ধেয়ে এলে কল কল কল
রৌদ্রতপ্ত বালুতটতল
ব্যগ্র বাহু আলিঙ্গনে ঘিরি
ক্লেদসিক্ত ম্লান দেহে মুহূর্তে পাথারে গেলে ফিরি',

বুকে নিয়ে আঘাত নির্মম।
প্রাণের অধিক প্রিয়তম,
একান্ত নিকটে এসে হয়ে গেছ নিতান্ত সুদূর ;
নিয়ে এলে হাসিরাশি, রেখে গেলে ক্রন্দনের সুর
অনন্ত এ সমুদ্র-বেলায়।
শ্রান্ত দীর্ঘ অবেলায়
শুধু শুনি বেদনার বাঁশি ;
রজনীর অন্ধকার ঢেকে দেয় দিবসের হাসি।

তুমি এলে শিরে বহি পরিপূর্ণ পূজার থালিকা ;
যে নব-মালিকা
নিরালায় বসি তুমি সযতনে রচিলে সুন্দরী,
আপনার লাবণ্যমাধুরী
প্রতি পুষ্পে মাখাইয়া তার, দিলে মোর গলে,
তখন কি জানিতে সরলে,
কোরকে কোরকে তার কীট জাগে অতি ভয়ঙ্কর ?
বিদীর্ণ করিয়া নিরন্তর
ফুল্ল কুসুমের মালা, মধুগন্ধ নিশ্বাসে নাশিয়া
সন্তপ্ত করিবে শুধু হিয়া ?
এনেছিলে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অন্তরের শেষ নিবেদন,
সঙ্গে করে ফিরে গেলে মর্ম-ছেঁড়া গভীর বেদন॥

কৃষ্ণদয়াল বসু

রবীন্দ্রনাথ

সেদিন স্বপনে দেখিনু গোপনে কবিরে গভীর রাতে
শ্রাবণ-পূর্ণিমাতে,
চিরদিনকার বীণাখানি তাঁর হাতে।

শুধালেম—"কবিগুরু,
অজানার পথে যাত্রা তোমার এবার হ'ল কি শুরু?"
কহিলেন কবি—নিখিলের কানে কানে
বাজিল সে বাণী বীণার করুণ তানে,
ভেসে গেল সুর সুদূর পথের শেষে
দিগন্তে যেথা মেশে অনন্ত এসে—
"আমি কবি, আমি র'ব না, তবুও জেনো চিরদিন র'ব
আমি রবি, চির-গগনে-গগনে আমি-যে নিত্য নব ॥"

কাঁদিয়া কহিনু—"আকাশে আকাশে আঁকা সে আলোর ছবি,
জানি তুমি সেই রবি,
চিরদিনকার তুমি বীণকার, কবি!
তবু মন মানে না যে,
তোমার বিরহ সে-যে দুঃসহ অহরহ বুকে বাজে।"
কহিলেন কবি—"আবার আসিব ফিরে
এই ধরণীর অশ্রুনদীর তীরে।
ম্লান মূক মুখে ফুটায়ে তুলিতে ভাষা,
ব্যথাতুর বুকে জাগায়ে তুলিতে আশা,
আমি কবি, আমি যুগে যুগে হেথা নূতন জন্ম ল'ব।
আমি রবি, নিতি উদয়ে বিলয়ে নিত্য নবীন র'ব ॥

শিশুর স্বপনে, কিশোরের মনে, চির-তরুণের বুকে,
জননীর হাসিমুখে
চির-দিনযামী জেগে র'ব আমি সুখে।
নীরবে আসিব নেমে
বিরহে-মিলনে হাসি-ক্রন্দনে স্নেহে-করুণায় প্রেমে।
বন্ধুর পথে চলে যাব কোন্ দূরে,
ফিরে দেখা হলে চিনিবে কি বন্ধুরে?

মনে ছিল আশা, ভালোবাসা পাই আরো।
ভুলে যেয়ো, যদি আমারে ভুলিতে পারো।
আমি কবি, আমি মরিতে চাহি নি এ কাহিনী কারে ক'ব।
আমি রবি, নিতি নূতন প্রভাতে উজলিব নব নভ ॥

আশা তাই মনে আবার স্বপনে কবিরে দেখিবে রাতে
শারদ-পূর্ণিমাতে,
কভু মধুমাসে কুসুম-সুবাসে প্রাতে।
নিখিল-বীণার তানে
শুনিবে কবির যে-বাণী গভীর বেজে ওঠে গানে গানে।
প্রেমের আসনে বরণ করেছ যারে
মরণ কি তারে হরণ করিতে পারে ;
চির-স্মরণের অশ্রু-সাগর পারে
সে-যে তরী বেয়ে আসিবেই বারে বারে।
আমি সেই কবি, আঁধারে আলোকে চিরদিন সাথে র'ব।
আমি সেই রবি, নব নব লোকে নিত্য পুনর্নব ॥"

কৃষ্ণধন দে

নিশির ডাক

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,
—খোল বধূ, দ্বার খোল !
রাত্রিটা দেখ, ঘুমন্ত চোখে কি যেন কাহিনী বলে,
অশ্রু তাহার করে ঝিক্ ঝিক্ নিথর গাঙের জলে ;
দ্বাদশীর চাঁদ ঢলে পশ্চিমে শিরীষসারির ফাঁকে,
দূরে বালুচর চাঁদের আলোয় হাতছানি দিয়ে ডাকে ;

চারিদিক নিঃঝুম্,
অজানা পাখীর ডানার ঝাপটে আকাশের ভাঙে ঘুম!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,
—খোল বধূ, দ্বার খোল!
বাতাসে ভাসিয়া এল বুঝি কার ব্যথাভরা নিশ্বাস,
কার এলোচুলে এখনো কাঁদিছে হারানো মালার বাস,
কে যেন খুলিয়া ফেলেছে নূপুর, হাতের কাঁকন ছুটি,
আঁধারের বুকে কে গো অভিমানে মাটিতে পড়েছে লুটি!
কৃষ্ণচূড়ার তলে
ঝরাফুলে কার মিশেছে সিঁদুর শিশির-অশ্রুজলে!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,
—খোল বধূ, দ্বার খোল!
নিশীথ-বাতাস পথ ভুলে যায় বেউড় বাঁশের ঝাড়ে,
থেকে থেকে তার আকুল কাকুতি কাঁদিছে অন্ধকারে;
কোথা কতদূরে মাঠের ও-পারে জ্বলে আলেয়ার আলো,
দীঘির কিনারে দেবদারুসারি হয়ে গেছে আরো কালো;
চারিদিক নির্জন,
থম্‌থমে রাতে ঝম্ ঝম্ করে শ্মশানে তালের বন!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড হ'ল,
—খোল বধূ, দ্বার খোল!
ঐ শোন, দূরে দিশাহারা পথে কে যেন কাঁদিয়া ওঠে,
কার নীরক্ত তৃষাতুর ঠোঁটে বেদনার বাণী ফোটে!
মাঠে মাঠে ঘোরে কোন্-সে পাগল ঘূর্ণি-হাওয়ার সাথে,
সোঁদালের বনে দেয় করতালি তন্দ্রা-নিশুতি রাতে!
ধরা সম্বিৎ-হারা,
কালপুরুষের অসির ফলকে কেঁপে ওঠে নীল তারা।

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,
—খোল বধূ, দ্বার খোল !
আড়ি পেতে কারা চুপি চুপি যেন ফেলিতেছে নিশ্বাস,
ঝিল্লী-নূপুরে ধরা পড়ে যায় কুতূহলী উল্লাস !
বকুলবীথিতে কাদের সিঁথিতে জোনাকি-মানিক জ্বলে,
সাড়া পেয়ে কারা বনের আড়ালে মুখ ঢেকে ছুটে চলে !
নিশীথিনী-অন্তরে
কৌতুকভরা কলহাসি শুধু জাগে বনমর্মরে !

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড হ'ল,
—খোল বধূ, দ্বার খোল !
সপ্ত-ঋষির শিয়রে কাঁদিছে বন্দিনী ধ্রুবতারা,
কার পথ চাহি অনিমেষ আঁখি আজো ফেরে দিশাহারা
আকাশ-গঙ্গা মথি' চলে কোন্ অপ্সরী সাহসিকা,
লীলার ছন্দে খসে মণিহার ছড়ায়ে উল্কাশিখা !
কোন্-সে অলকাপুরে
রতন-নূপুর পড়েছে ছড়ায়ে গগন-পথটি জুড়ে' !

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড হ'ল,
—খোল বধূ, দ্বার খোল !
বিবশা ধরণী, উতলা রজনী, মহুয়া ফুটেছে বনে,
আজিকার রাতে ঘুমায়ো না বধূ, পুরাতন গৃহকোণে ;
ফাগুনোৎসবে আনিয়াছি লিপি, তোমারি আমন্ত্রণ,
রূপময়ী নিশা ডাকিছে তোমার রূপময় যৌবন !
সাড়া দাও একবার,
চাঁপার গন্ধ হয়েছে নিবিড়, খোল বধূ, খোল দ্বার ॥

—ব্যথার পরাগ

নজরুল ইস্‌লাম

চৈতী হাওয়া

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে—পাই নি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার।
আজকে তোমার জন্মদিন—
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাত্‌ড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়ার অকূল অন্ধকার!
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া হার!

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির রাঙ্‌লে মুখ,
নিটোল ঢেউএর ভাঙলে বুক—
কোন্‌ পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্‌ দেবতার কোন্‌ সে পাষাণতল?

অস্তখেয়ার হারামাণিক-বোঝাই-করা না'
আসছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয় পারের গাঁ।
ঘাটে আমি রই ব'সে,
আমার মানিক কই গো সে?
পারাবারের ঢেউ-দোলানী হানছে বুকে ঘা!
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল পা!

বইছে আবার চৈতী-হাওয়া, গুম্‌রে ওঠে মন,
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন।
তেম্‌নি আবার মহুয়া-মউ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা বউ
পান ক'রে ওই ঢুলছে নেশায়, দুলছে মহুল বন।
ফুল-শৌখিন দখিন হাওয়ায় কানন উচাটন!

পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি জুঁই,
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপ্‌নি যেত নুইঁ'।
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাপ হয়ে ফুটত গাল!
থলকমলী আউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই'!
বকুল-শাখা ব্যাকুল হত, টল্‌মলাত ভুঁই!

চৈতী রাতির গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর!
ভুঁই-তারকা সুন্দরী
সজ্‌নে ফুলের দল ঝরি'
থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন-খোঁপার পর,
ঝাঁঝাল হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙাটির স্বর!

পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই,
বলতে, 'আমি অম্‌নি চাই!'
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে ঠোঁটে দিতাম মউ,
হিজল শাখায় ডাকত পাখী "বউ গো কথা কউ!"

ডাকত ডাহুক জল-পায়রা, নাচত ভরা বিল,
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আসমানে গাঙচিল!
হঠাৎ জলে রাখতে পা,
কাজলা দীঘির শিউরে গা—
কাঁটা দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল-ঝিল।
ডাগর চোখে লাগত তোমার সাগরদীঘির নীল!

উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়ালো ঘুম্‌তি নদীর ঘুমুর-পরা পায়!
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউএর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে হায়
মাঠের বাঁশি বন-উদাসী ভীমপলাশী গায়!

বউল আজি বাউল হ'ল আমরা তফাতে!
আম-মুকুলের গুঁজি-কাঠি দাও কি খোঁপাতে?
ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজ কি-আর প্রিয়ে?
প্রজাপতির ডানাঝরা সোনার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে?

বউল ঝ'রে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের পীড়ায় টস্‌টসে বুক ঝুরছে গোলাপজাম!
কামরাঙারা রাঙ্‌ল ফের
পীডন পেতে ঐ মুখের,
স্মরণ ক'রে চিবুক তোমার, বুকে তোমার ঠাম—
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায় কে দেবে দাম!

করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হতে তোর,
ভেবেছিলাম গাঁথব মালা—পাই নে খুঁজে ডোর!
সেই চাহনি নীল-কমল
ভরল আমার মানস-জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম্মমূলে মোর!
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাতনরী হার লোর!

তরী আমার কোন্ কিনারায় পাই নে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কম্‌লা নেবুর ফুল।
পাহাড়তলীর শাল-বনায়
বিষের মত নীল ঘনায়।
সাঁঝ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার-চাঁদ-ইহুদী-দুল!
হায় গো আমার ভিন্ গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল।

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চইত—তোমার দেখা নেই!
কণ্ঠে কাঁদে একটা স্বর—
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর?
তেম্‌নি ক'রে জাগছ কি রাত আমার আশাতেই?
কুড়িয়ে পাওয়া বেলায় খুঁজি হারিয়ে যাওয়া খেই?

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',
এই তরীতে হয়ত তোমার পড়বে রাঙা পা!
আবার তোমার সুখ-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পারাবারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'॥

—ছায়ানট

বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ-জাগার সাথী
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি!
আজ হতে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি
আজ হতে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।…

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি।"
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।—

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে ?
কে করে ব্যজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে ?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে
সারারাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে!
জাগিয়া একাকী জ্বালা ক'রে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হত যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়ার! তোমার শাখার পল্লবমর্মর
মনে হত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারি যে শাড়ির আঁচলখানি।
—তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড়-আদর-ছাওয়া!

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি,—তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।
হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশখানি,
বাতায়নে ঠেকি' ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি'।

বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন!
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, "কর বিদায়ের আয়োজন

—আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে!
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন?
জানি—মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি!

হয়ত তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই ক'রে,
ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে?
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোম্‌তাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-ম'ল,
—বলো তাহে কার ক্ষতি?
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী!..

হয়ত তোমার শাখায় কখনো বসে নি আসিয়া পাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্রগুঞ্জে কোকিল ওঠে নি ডাকি।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
জেগেছ নিশীথে, জাগে নি ক' সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
—সব আগে আমি আসি'
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ, গিয়াছি গো ভালবাসি!
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা—
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর, হোক বা না হোক দেখা।...

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না

—নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।
শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই আজিকে যাবার আগে—
ঐ পল্লব-জাফরি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে—দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি'?
হাওয়ায়, না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি'?

তোমার পাতায় হরিৎ আঁচলে চাঁদিনী ঘুমাবে যবে,
মূর্ছিতা হবে সুখের আবেশে—সে আলোর উৎসবে
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর?
তোমার নিশাস শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে?
খড়্খড়ি খুলি চেয়ে রবে দূর অস্ত অলখ-লোকে?
—অথবা এমনি করি'
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধেয়ানে সারা দিনমান ভরি'?

মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, উর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে'!
তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে!···

ভুল ক'রে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি।
যদি ভুল ক'রে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি'
বন্ধ করিয়া দিও পুন তায়!···তোমার জাফরি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে, মাটিতে পেলে না যাকে॥

জীবনানন্দ দাশ

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মত যেন হায়
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে ; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীতরাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার :
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ ;—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ,—মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মত আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ—
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে ;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে।
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নীচে লাল লাল ফল
পড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে;
যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল
আকাশের তল;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর পরে;
আমরা দেখেছি যারা সুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পরে
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে; আমরা বুঝেছি যারা পথঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে গেছে স্থির:
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর;
আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি, আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়; যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজন লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখী-পাখালির ডাক
শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক॥

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই : বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত
তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে-আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমাকে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
ধান-সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা :
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিং-এর মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন সাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে-আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার ;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার ;
এ-পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর ॥

বনফুল

অবিনাশ

অবিনাশ মৌলিক
লৌকিক
নাম তার,
আসলে সে মানব-আত্মার
শোভন বিকাশ।
—এম্ এ পাস।
দর্শন-শাস্ত্রেরে করিয়া ধর্ষণ
সপ্তাহেতে তিন দিন করেন বর্ষণ
বক্তৃতা মুষলধারে!
ছাত্রদল কাতারে কাতারে
সেই ধারাপাত
মুখস্থ করিয়া সারারাত
নানাভাবে হইয়াছে কাবু;
মুগুর ভাঁজিছে কেহ,—কেহ খায় সাবু!
অবিনাশ প্রফেসর কলেজের।
বহুবিধ 'নলেজে'র
তীব্র তাড়নায়
হায়,
কখনো 'নেকটাই' পরে, কখনো খদ্দর,
অথচ ভদ্দর।
নয় সে সংসারী,—এখনও কুমার;
প্রণয়-চুমার
কেতাবি বর্ণনা ছাড়া অন্য জ্ঞান মোটে নাই
ভাগ্যে তার জোটে নাই
রোগা বা নধর কোনো অধর পরশ।

তবুও যে লোকটা সরস
কারণ তাহার,
সুলতা নাম্নী নাকি কোন মহিলার
হয়েছিল সঙ্গলাভ,
কিন্তু যেই হল love,
বাহির হইল তথ্য—
সুলতা যে বাগ্‌দত্ত !
হবু-স্বামী কি-এক মিস্টার,
বিলাত-প্রবাসী এক আধ-ব্যারিস্টার।
অবিনাশ দূষিল না আপনার ভাগ্যে,
কেবল কহিল হেসে—যাক্‌ গে !
সেই হতে রসজ্ঞান তার
অলঙ্কার।

একদা এ অবিনাশ
শেষ করি প্রাতরাশ,
'পত্রিকা' প্রভৃতি নানা দৈনিক লইয়া,
সাংবাদিক রোমন্থনে মশগুল হইয়া
ছিলেন যখন,
ঠিক আসিল তখন
পত্র একখানি।
তার বাণী
নহে ভাবনীয়।
অবিনাশ স্বীয়
চক্ষুকে বিশ্বাস করা অনুচিত কিনা
ভাবিতেছিলেন ; ইতিমধ্যে কিন্তু মনোবীণা
অকস্মাৎ তুলিল যে তুমুল ঝঙ্কার
বারম্বার !

নেবুতলা লেন,
সেথাকার স্নেহলতা সেন
লিখেছেন,
"হে দেবতা, আশাপথ চেয়ে তব, চিত্ত যে উতলা,
তুমি মম পরান-পুতলা
বহু জনমের!
তোমারে চিনেছি আমি—সয়েছিও ঢের!
সখা, এইবার
বিবাহ আমার
নাহি হ'লে
হয় জলে নয় স্থলে
তেয়াগি' পরান
রাখিব এ প্রেমের সম্মান।"
প্রফেসর অবিনাশ রহিলেন যদ্যপিও কুঁচকাইয়া ভুরু
হৃদয়ের মাঝে কিন্তু হ'ল তাঁর শুরু
দুরু দুরু!
ভাবিলেনও গর্বভরে
"স্থূলতার স্বয়ম্বরে
হয়েছিল মর্মচ্ছেদ,
স্নেহলতা আজি মোর মিটাল সে খেদ!
কিন্তু কেন?"—এই বলি মুছিল সে কপালের স্বেদ!
তারপর বহুক্ষণ বহু ধীরে ধীরে
সিগারেট-ধূম দিয়ে ঘিরে,
মনোরম চিন্তাটিরে
নানারূপে দিল সে প্রশ্রয়!
বিবেক আসিয়া তারে কয়—
"বাড়াবাড়ি ভালো নয়!
স্নেহলতা স্থূলতারই জাতি,
আবার খাইবে শেষে লাথি!"

৩

বিবেক-বকুনি-ভীত অবিনাশ হায়,
লিখিল ত্বরায়,
"আরে রে খবরদার,
চিঠিপত্র আর
লিখো না আমায়!
লেখো যদি, বাধ্য হব তোমার বাবায়
জানাতে সে কথা।"
—কিন্তু বড ব্যথা,
চিঠিখানি ডাকে দিয়ে পেল বড় ব্যথা
পিয়াসী এ অবিনাশ (যদিও সে পণ্ডিতপ্রবর)।
ভুলিতে করিছে চেষ্টা, হেনকালে খবর জবর!
নেবুতলা লেন,
সেথাকার হারাধন সেন,
আত্মহত্যা করেছেন
কন্যা তাঁর।
পুরাতন মামুলি প্রথার
পুনরভিনয় করি'
পড়েছেন সরি'
বে-দরদী দুনিয়ার কবল হইতে হায়
এক ঝটকায়!

৪

শুনি এ বারতা
অবিনাশ কি যে হ'ল বলিতে পার তা?
বলিতে পারি না আমি,
শুধু দেখি দিবাযামী,
চতুর্দিকে কুণ্ডলিছে সিগারেট-ধূম,
তার মাঝে ব'সে আছে অবিনাশ—শুম্।

অনুতাপ-তাপে
(সিদ্ধ ভাপে
মাংসের মতন)
অবিনাশ-মন
হ'ল বিগলিত।
হারাধন সেন তাঁর পূর্ব-পরিচিত !
কতবার গৃহে তাঁর
শুনেছে সে বেহালা, সেতার,
সে স্নেহলতার ;
করিয়া চা পান
মূর্ত করি তুলিয়াছে রাশিয়া, জাপান
চায়ের টেবিল 'পরে
শুধু বাক্যভরে !
হারাধন, নিরীহ সে, বুঝিত না অতশত কিছু।
শুধু ক'রে মাথা নিচু
গুম্ফ গুছাইত,
আর সায় দিত।
হায় সে বেচারা,
কন্যাশোকে বিনা-দোষে কেঁদে কেঁদে সারা !
"কি ক'রে তাঁহার কাছে দেখাইব মুখ,"
এই ভেবে অবিনাশ মূক !
(আহা যেন আহত শামুক !)

তারপর বহু দিন গেছে কেটে !
ছিল যারা বেঁটে
হয়েছে তাহারা লম্বা বয়স বাড়িয়া
অবিনাশ কলেজ ছাড়িয়া

প্রথমত রেখেছিল টিকি।
(গভীর শোক কি
গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরূপে
মূর্ধা'পরে চুপে চুপে
উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসের মত
ধরেছিল অত
মোটা ঘন কালো দেহ ?
—সে কথা বলিতে নারে কেহ।)
কিছুদিন টিকি লয়ে মহা হৈ চৈ !
কোশাকুশি, ধূপধুনা বাতাসা ও খৈ,
স্তূপে স্তূপে
হাজির হইল যেন টিকিটির মোসায়েব রূপে !
কত না নিরীহ ফুল হাসিতে হাসিতে
চড়িল সে টিকির ফাঁসিতে !
টিকিওয়ালা বহু পুরোহিত
অবিনাশে দলে পেয়ে হারাল সম্বিৎ।
সবে তারে ঘিরে,
দীর্ণ করি বিংশ শতাব্দীরে,
চীৎকার করিল শুরু নানাবিধ সুরে
অবিনাশ-পুরে !
বর্ষার দাদুরী যথা ঘোলা জল পেয়ে
ওঠে গান গেয়ে !
কিন্তু শেষে চমকিল অবিনাশ-পিলে,
যবে সবে মিলে
কহিল আসিয়া তারে—"দাদা,
দাও কিছু চাঁদা !"
একবার দিয়া তাও পেল না নিস্তার !
নিত্য নব আবির্ভাব চাঁদার খাতার

ধর্মজগতের
—প্রার্থী নগদের !
দেখি হুলুস্থুল
অবিনাশ চুপে চুপে টিকিটিরে করিল নির্মূল !
বিচলিত হিয়া
অন্য কোন্ পন্থা দিয়া
স্নেহলতা-শোকাবেগ করিবে নির্বাণ,
ভাবিতে ভাবিতে, মনে হ'ল—গান !
কণ্ঠ তার করিয়া সজল
নির্ঘাৎ সে গাহিত গজল,
কিন্তু হায়, একি—ইস্,
সহসা হইল তার 'ল্যারিন্জাইটিস্' !
কোথা গান ?—কণ্ঠ-বাঁশি
ছাড়িছে কেবল কাশি
বেসুর—বেতালা,
হায় একি জ্বালা।
—দিল শিস্।
মিটিল না আকুলতা, কণ্ঠ তার করে নিস্-পিস্
অস্ফুট আবেগ ভরে।
অকাতরে
করিল সে অর্থব্যয় চিকিৎসার তরে ;
কিন্তু হায়—সকলি বৃথায়।
প্রাণ যবে করে গাই গাই,
কণ্ঠ শুধু করে সাঁই সাঁই !
শেষে অবরুদ্ধ শোক তার জ'মে
ক্রমে ক্রমে
যেই রূপে দেখা দিল সে অতি ভীষণ !
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
আশ্রয় করিয়া
খাইতে লাগিল মুর্গি উদর ভরিয়া।

'ধর্মকর্ম-কাগজেতে প্রবন্ধের ভারে,
সম্পাদকটারে
জর্জরিত করি',
হঠাৎ পড়িল সরি'
পণ্ডিচেরি।
শুনিতেছি, আজকাল খাইতেছে শেরি ;
কাপড় পরে না আর,—ঢিলা ঢিলা পায়জামা পরে
বাহিরে ও ঘরে।
রটাইছে বন্ধুর মহলে,
মৃত স্নেহলতা নাকি নানা ছলে-বলে
আসে রাতে, আপাদমস্তক তার চাদরেতে মুড়ি',
এসে পায় দেয় সুড়সুড়ি ॥

ট্র্যাজেডি-বৃক্ষের আর একটি ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

'বাসে' চ'ড়ে বীণা রায়
চলেছেন বেহালায়,
পড়িতেছে টিপি টিপি বৃষ্টি ;
আর কে চলেছে সাথে ?
লক্ষ্য নাইকো তাতে
—পুস্তকে নিবদ্ধ দৃষ্টি !
(চলেছে গোবর্ধন মিত্র।)

নয়নের কিনারায়
এলো যবে বীণা রায়
ঝুমকো ঝুলায়ে দুটি কর্ণে ;

চরণে নাগরা পরা,
শাড়িটি ঘাগরা-করা,
সুর্মা মাখানো আঁখি-পর্ণে।
(দেখিল গোবর্ধন মিত্র।)

এলো-খোঁপা চুলগুলি,
হাতে শুধু সরু রুলি,
কণ্ঠে চিকণ চারু হার গো।
গালেতে লাগে নি চুন,
কিম্বা ধরে নি ঘুণ,
পাউডার, ওটা পাউডার গো
(বুঝিল গোবর্ধন মিত্র।)

বয়স কত বা হবে
সে কথা কেই বা কবে,
দেখিতে নেহাৎ রোগা তন্বী,
তবু ওই দেহ ঘিরে
দেখা যায় শিখাটিরে
ভিতরে জ্বলিছে যার বহ্নি!
(তাতিল গোবর্ধন মিত্র।)

বদনের সদরেতে,
রাঙা রাঙা অধরেতে
ভদ্র হাসিটি আছে তৈরী,
চোখে যেন আছে ভাষা,
বুকে যেন আছে আশা,
স্বাস্থ্যটা শুধু তার বৈরী।
(গলিছে গোবর্ধন মিত্র।)

ভাষাহীন সে ভাষার
সীমাহীন সে আশার
মূর্তি দিবে সে কোন্ শিল্পী ?
নহে এ তো সাধারণ
দোকানের পুরাতন
চিরপরিচিত বাসি 'জিল্‌পি'।
(আকুল গোবর্ধন মিত্র।)

এ যে বাঙালীর মেয়ে,
নব 'কালচার' পেয়ে
চপ ও স্বক্তো একসঙ্গে।
দাঁতগুলো চকচকে,
ঠোঁটে রঙ টকটকে,
ধন্য করিছে এই বঙ্গে।
(মুগ্ধ গোবর্ধন মিত্র।)

সহসা কাটিল তাল,
ছিঁড়িল স্বপন-জাল,
মহাকাল করিলেন রঙ্গ।
'বাসে' 'বাসে' কলিশন
হয়ে গেল কি ভাষণ,
চট্ ক'রে হল রসভঙ্গ।
—(ব্যাকুল গোবর্ধন মিত্র।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখ বুজে বীণা রায়
শুয়ে আছে বিছানায়
মেডিক্যাল কলেজের কক্ষে

'বেশি কিছু নাই ভয়'
ডাক্তার এসে কয়
যন্ত্র লাগায়ে তার বক্ষে।
(পার্শ্বে গোবর্ধন মিত্র।)

তিন দিন, তিন রাত
শুয়ে থাকে দিনরাত
পুলকিয়া সকলের মন গো।
ভাল হ'ল বীণা রায়,
ফিরে গেল বেহালায়,
ট্রামেতে করিয়া আরোহণ গো।
(সঙ্গে গোবর্ধন মিত্র।)

দুটি মাস না কাটিতে
বেহালার সে বাটীতে
বাজিয়া উঠিল নানা বাজনা;
বীণা রায় করে বিয়ে
সারা দেহমন দিয়ে
শুধিবারে সমাজের খাজনা!
(বর সে গোবর্ধন মিত্র।)

উপসংহার

গোবর্ধন মিত্র মোর বাল্যসহচর।
বিবাহের দু বছর পর
সেদিন তাহার সাথে দেখা হ'ল হেদুয়ার ধারে।
নানাবিধ গল্প হ'ল; অবশেষে কহিলাম তারে—
"চা খাবি তো চল্,
দেখ্ তো এ আধুলিটা ভালো না অচল;
ওটাই সম্বল!"

ম্লান হেসে
কহিল সে—
"মেকি কিনা
বলিতে পারি না।
মেকি ধরা শক্ত ভাই,—যদি পারিতাম
তাহ'লে কি বিয়ে করিতাম ?"
ধরি তার হাত
শুধানু—"অর্থাৎ ?
এটা কি বলিস্।"
সে কহিল—"স্ত্রীর মোর বয়স চল্লিশ !
১৯০৯ সনে
সে মোর বাবার সনে
করেছিল 'এনট্রান্স' পাস।
বিয়ে ক'রে শেষে দেখি—আরে সর্বনাশ !"
কিছুক্ষণ পরে গবু কহিল আবার—
"এখন কেবল ভাই সান্ত্বনা আমার
এই দেখ্—" বলিয়া সে একখানি রুমাল খুলিয়া
সম্মুখেতে ধরিল তুলিয়া,
এবং কহিল পুন—"এমব্রয়ডারি ভাল করে,
—ওইতেই আছি ভরপুর।"
দেখিলাম, রুমালেতে আঁকা এক কুব্জ ময়ুর ॥

সজনীকান্ত দাস

রাজহংস

আমি শুধু পেয়েছি জানিতে,
দিবসের খররৌদ্র অপরাহ্ণে ম্লান হয়ে আসে ;
সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে উড়ে যায়
দাবদগ্ধ দিবসের ভস্ম-অবশেষ।

জানিয়াছি, তার পরে ধীরে নামে অন্তহীন নিশা,
গ্রাস করে চরাচর মুখহীন কবন্ধ-বিস্তারে।
অনন্ত নিঃসীম শূন্যে তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ
ফুলিয়া ফুঁসিয়া ওঠে, নিঃশব্দের বুকে দেয় হানা,
দিকে দিকে লোলজিহ্ব তিমিরের চলে অভিযান।
তমসার কালো নীরে যত তারা-গ্রহ-উপগ্রহ
দোলে তরণীর মত, প্রদীপের মিটি মিটি আলো
তিমির-তরঙ্গাঘাতে কম্পমান ভয়ার্ত শিখায় ;
ভয় হয় ক্ষণে ক্ষণে, কখন মিলিয়া বুঝি যায় !

কত যে নিবিয়া গেছে মহাকাল-বিপুল-প্রবাহে—
কত মানুষের প্রাণ, মানবের সন্ধ্যা ও দিবস
কোটি কোটি হ'ল লয় বিন্দু বিন্দু ধূলিকণারূপে
কাল-কালিন্দীর তীরে।
হয়তো হতেছে সৃষ্টি মহাকাল-কালিন্দী-সঙ্গমে
নবতর দ্বীপ কোনো ; ধূলিকণা সেথা গিয়া লাগে—
এক দুই লক্ষ কোটি ও অর্বুদ ধূলিকণা।

এর মাঝে হায় হায়, মোরা গনিতেছি গাঢ় স্নেহে—
দিবসের খররৌদ্র অপরাহ্ণে হয়ে আসে ম্লান,
কখন জেগেছে উষা তিমিরের কালো উপকূলে,
ভাসিয়াছে চরাচর মধ্যাহ্নের তপন-প্রভায়—
আঁখিতে লেগেছে রঙ, দুই আঁখি ভরিয়াছে জলে,—
ভালবাসিয়াছি, আর বুকে কারে লইয়াছি টানি।

উড়িয়াছে রাজহংস মেঘাবৃত সুনীল আকাশে
দুই পক্ষ বিস্তারিয়া শূন্যে করি স্থিতির নির্ভর—

গতির নির্ভর করি আকাশের লঘু বায়ুস্তরে,
কবে সে করেছে যাত্রা, ছাড়িয়াছে মাটির আশ্রয়,
কবে উত্তরিবে গিয়া তারো নাহি জানে সে ঠিকানা
টলমল গাঢ়নীল হিমবক্ষ মানসের তীরে।
উপলমুখর সেই মেঘচুম্বী পাহাড়ের কোলে
নীড়ের আশ্রয় তার।

ধরণীর রাজহংস আকাশের নীলাম্বু-বিস্তারে
কত ক্ষুদ্র গ্রহ-তারা-উপগ্রহ মাঝে
আছে কি না-আছে জাগে অনন্ত সংশয়,
তবু সে একান্ত সত্য—সত্য তার গতির প্রবাহে;
গ্রহ-তারা তার চেয়ে নহে সত্য বেশি,
অতি মিথ্যা ক্ষয়শীল বস্তুর প্রবাহ—
প্রাণহীন জ্যোতি।

ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক—
উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে;
নিম্নে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ
ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমিরনীরে।
ধরিতে পারে না তারে, উর্ধ্বে তার বিরাট প্রয়াণ।
উচ্চে নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
চলিবে অনন্তকাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
কোটি কোটি গ্রহ-চন্দ্র কোটি তারা পাইবে বিলয়,
লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন॥

—রাজহংস

গৃহীর প্রভাত-চিন্তা

হব সন্ন্যাসী, হব সন্ন্যাসী—
ইন্দ্রিয়জয়ী ব্রহ্মচারী, সর্বত্যাগী বৈরাগী,
ক্রোধের কারণ যত হোক, আমি কই রাগি !
প্রভাতে ভাবি যে বসি পড়িব পড়িব খসি
এই সংসারবৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র মত ;
মানিব না বাধা মায়ার কান্না, লব সন্ন্যাস-ব্রত।
আমি আপিল করিব না ;
বাহানা-মাফিক গৃহিণীর গহনা
সাধের নিদ্রা রাত্রে বাঁচাতে তাহাও গড়িব না।
সকালে উঠিয়া ঝাঁকা হাতে লয়ে ছুটিব না বাজারে,
আমি ট্যাক্স দিব না কর্পোরেশনে, বিজাতীয় রাজারে।
প্রতি রবিবারে ধোপার পিছনে হইবে না ছুটিতে,
হবে নাকো যেতে শ্বশুরগৃহেতে প্রত্যেক ছুটিতে।
পরের শ্রাদ্ধে, দেশের কারণে আর নাহি দিব চাঁদা ;
দুঃখ হবে না কোলে নিতে ছেলে কালো-রোগা-নাকখাঁদা।
সর্দি মুছায়ে বিলাস-বস্ত্র নোংরা হবে না আর,
মাসের শেষেতে যার-তার কাছে লইতে হবে না ধার।
দাড়ি-গোঁফে দিব অবাধে বাড়িতে,
ডাকিব না প্রাতে নাপিত বাড়িতে,
দুধে জল হেতু গোয়ালার সাথে হবে না ঝগড়া-ঝাঁটি ;
'পড়্ পড়্' ব'লে ছেলের মাথায় মারিতে হবে না চাঁটি।
কিবা ভয় আর বাড়ন্ত যদি গিন্নীর ভাণ্ডার ;
তীর্থে তীর্থে হব না ত্যক্ত হস্তেতে পাণ্ডার।
অশৌচ নাহিকো, অসুখের কালে ডাক্তারে ফিস্ গোনা,
ছেলের পিলেটা সারাবার তরে খুঁজিতে হবে না টোনা।
দুর্জয় শীতে ঘামিতে হবে না চোর-ডাকাতের ভয়ে,
অপমান আর কিছু নাহি হবে মামলায় পরাজয়ে ;

মেয়ে-বিয়ে নিয়ে ছেলের বাপের পায়ে পায়ে তেল দিয়ে
ফিরিব না আর—না হবে ভাবিতে পূজার তত্ত্ব নিয়ে ;
বাসন মাজার ফ্যাসাদ নাহিকো চাকর পালিয়ে গেলে,
পাড়াপড়শীর নালিশ নাহিকো পাজী যদি হয় ছেলে।
সাহেবের লাথি বাপান্তি গাল হবে না শুনিতে আর,
ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীর ফরমাসে ছেড়ে যাব সংসার।
অসহ্য সব—নিশ্চয়ই আমি হয়ে যাব সন্ন্যাসী,
ভাবিতেছি বসে ; পত্নী নিকটে আসিয়া যে কন হাসি—
"তুমি হেথা বসে, এদিকে যে চা-টা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হ'ল।
বুদ্ধি হ'ল না বয়স যদিও এক কুড়ি আর ষোল।"
চা'র ক্ষুধা আর গৃহিণীর তাড়া জুড়াইয়া দিল মোরে ;
আজি শুনি কথা, ভাবা যাবে ফের আগামী কল্য ভোরে॥

—অঙ্গুষ্ঠ

সতীশ রায়

তৃণফুল

ভ্রমরেরা কই তাহার দুয়ারে সাধে ?
তরুণী-আঙুল মালায় তারে না বাঁধে।
মধু-বিন্দুটি নাহি তার দলপুটে,
সৌরভ যাচি' বায়ু ত পায়ে না লুটে !
    গোপন মরমে অফুট ভাষার গান,
    শিশিরে ঝলকি' আলোকে মেলেছে প্রাণ !
    আঁখি-জলে-ভেজা হাসিমাখা মুখখানি !
    হাসিকান্না সে শরৎ-রাণীর বাণী।
        হোক না সে হায় যত ছোট তৃণফুল,
        প্রভাতের আলো তার বুকে খায় দুল !
        তার গীতি-কণা আকুতি, মিনতি, আশা ;
        তার ইতিহাস একটু মধুর হাসা॥

মণীশ ঘটক

একমাত্র

বলেছিলাম,
আমার জীবনে একমাত্র নারী তুমি।
যখন মানুষ ও-কথা কয়,
তখন কি সে চোখ রাখতে পারে
কেউ মুখ লুকিয়ে হাসছে কি না!
তুমি হেসেছিলে, না গো?

বোসেদের লীলার কথা তোমার মনে হ'ল,
এ সব গোপন ব্যাপার ত চাপা থাকে না,
শোন তাহলে।
বন্ধুর পাহাড়ের দেশে,
পাইন বনের চোখে যখন নামে সন্ধ্যার শীতল আশ্বাস;
যখন ফার্নের দলে শেষ হাতছানি হয় সমাধা,
শেষ চাওয়া চেয়ে পাহাড়ী ফুল ঘুমে পড়ে ঢুলে—
তখন পাহাড়ী পাখী ফেরে নীড়ে,
তপ্তবুকের সান্নিধ্যে;
তেমনি এক সন্ধ্যার শীতল বিফলতা
তপ্তবুকে বহন করে চলে গেছে বোসেদের লীলা।
ভালো তাকে বাসি নি,—
সে কি হয় গো!

তোমারি মামাতো বোন বিভা,—
ডায়ারি পড়েছ বুঝি? তাহলে ত জানো!
মধুমাসে,
অশোকে কিংশুকে ফুল্ল বনতলে

দখিনা হাওয়ার দৌত্যে চলে দোললীলা ;
উৎসবের সাড়া জাগে দিক থেকে দিগন্তরে।
সন্ধ্যা মদালসা—
উত্তপ্ত আলিঙ্গনের মতো দেহ ঘিরে নামে।
বিভা এনেছিল বহন করে এই উৎসবের বারতা তার সর্বদেহে,
অপূর্বসুন্দরী পূর্ণযৌবনা বিভা !
তার নিমীলিত নয়নের ঈষৎ স্ফুরণে,
রক্তিম অধরের মৃদু শিহরণে, স্তনতট-চুম্বী চাঁপার মালার
আলোড়নে ছিল যে আমন্ত্রণ,
তাকে অস্বীকার করব ?
সে কি হয় গো !

শোন নি সিলেটের শর্বরীর কথা।
আগের চেনা নয়, পুজোর ছুটির পর কলকাতা ফিরতি
জাহাজে দেখা, পদ্মার বুকে।
মাঝ-গাঙে, দিনশেষে, অকস্মাৎ এলো ঝড়।
মনে হ'ল,
আকাশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের লড়াই বাধলো—
গুরু গুরু নির্ঘোষ—ঘোর হু-হুঙ্কার !
চললো বিদ্যুতের ছোরা-খেলা আকাশের বুক চিরে চিরে !
ধর্ষিতা প্রকৃতি অসহায় ধারাবর্ষণে করলো আত্ম-নিমজ্জন !
জাহাজ ডোবে ডোবে !
যাত্রীরা করেছে ভিড় ডেকে, কে আগে উঠিবে জলিবোটে,
কে আগে বাঁধবে গলায় বয়া,
তারি তদ্বিরে।

খালি কেবিনে আমি একা,
ভাবছি এবারকার মতো পূর্ণচ্ছেদ পড়লো তাহলে !

সেই অপ্রকৃতিস্থা প্রকৃতির শঙ্কা বেদনা ভীতি
রূপ-পরিগ্রহ ক'রে এলো সেই কেবিনে
শ্যামাঙ্গিনী শর্বরী !
একমাথা কালো চুলের নীচে কালো মেয়ের জলভরা চোখে
জেগে উঠলো সন্ধ্যার অসহায় অনুচ্চারিত আর্তনাদ—
বুকে সাড়া পড়বে না ?
সে কি হয় গো !

ঋতুতে ঋতুতে সমস্ত সত্তা
দিয়েছে সাড়া অনাহত ধ্বনির সাথে তাল মিলিয়ে—
আমার প্রাণবান, জীবন্ত সত্তা ।
ভালবাসি প্রত্যেকটি পরমক্ষণ, জীবনপথের প্রতি সঙ্গিনীকে
ভালবাসি—ভালবাসি তাদের স্মৃতিকে !
জানো,—
একদিন অনন্ত সমুদ্রের বিশালতার বুকে জাগলো পৃথিবী,
সমুদ্রের মতো বিশাল নিঃসঙ্গতা বুকে বয়ে ;
এলো সেখানে মানুষ, সৃষ্টির প্রথম মানুষ ;
স্তব্ধ বনানীর গুরুভার মূক সাহচর্যে ক্লিষ্ট !
সেদিন অকুণ্ঠিতা উষার মতো
যে নারী উদয় হয়েছিল মানুষের গগনে, সৃষ্টির প্রথমা নারী,
বহন ক'রে এনেছিল কী সে ?
মানুষের বলিষ্ঠ বুকে,
পুষ্ট মাংসপেশীতে,
স্বপ্নময় নয়নে জেগেছিল কী আলোড়ন ? শুধু প্রেম ?
আমার জগতে
তমোনাশিনী উষার মতো তোমার অভ্যুদয়,
প্রাণসঞ্চার তোমার নয়নোন্মীলনে,
জীবন্ত সত্তায় তুমি পরম সত্য,

একমাত্র নারী !
আমি কি দেখতে যাচ্ছি তুমি হাসছো কি না ?
হাসো না গো ॥

—শিলালিপি

অনূঢ়া

এই ফাল্গুনের তেইশে আমারো পূরবে তেইশ ।
তোমরা বলো, এটা বসন্তকাল,
বছর বছর এ নাকি আসে
চূতারবিন্দ রক্তোৎপল অশোক নবমল্লিকার সাথে !
হয়তো আসে ।
আমারো এসেছিলো এক দিন,
কিন্তু সে আর-বছর নয়,
সে যেন কবে, কতোদিন আগে ।

মনে আছে চাঁদের রাতের জোয়ারের মতো
ভরে উঠেছিলাম আমি !
আকাশে বাতাসে অজানা শিহরণ,
আলোতে ছায়াতে লুকোচুরির মাদকতা,
অঙ্গে অঙ্গে পুলক-আলোড়ন,—
নিজেকে নিজেরি কেমন অদ্ভুত ভালো লাগলো !

সৌষ্ঠবে ভরলো বুক বাহিরে,
ভেতরে জাগলো নাম-না-জানা শূন্যতা !
মনে হলো,
যদি পেতাম একান্তে বুকের মধ্যে আমাকে,
আরশির আমাকে,
চম্‌কে-জাগা আমাকে !

আশায় আশঙ্কায় দোল-খাওয়া সে বসন্ত,
সে তো সালতামামির জের টেনে আসে নি,
বাঁধা রইলো না বছরের পৌনঃপুনিকতায়।
একদা পাহাড়ী নদীর ঢলের মতো দুকূল ছাপিয়ে নেমেছিলো,
আপনিই গেলো শুকিয়ে।

এসেছিলো খবর না দিয়ে,
গেলো চলে অগোচরে।
আজ প্রজ্বলিত নিদাঘদাহে দেখছি সে নেই!

আমার নেই রূপ,
আর বাবার নেই রূপো,—
কাজেই, তেরো, তেইশ বা তেতাল্লিশ,
যায় আসে না।
অনূঢ়া আছি আজো,
এইটেই সত্যি।

আর সত্যি,
নিদাঘ-অন্তে কবে,—না না,—বসন্ত নয়—
আসবে শান্তিময়ী বরষা,
তারই ভরসায় দিন গোনা!

আমার মহেশ, সে কি
আর-জন্মের আমার মৃতদেহ কাঁধে
আজও রইল বিবাগী?
আমার মীনকেতন,
সে তবে ভস্ম হলো কার নেত্রতাপে॥

—শিলালিপি

অমিয় চক্রবর্তী

বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে।
মরুময় দীর্ঘতিয়াসার মাঠে, ঝরে বনতলে।
ঘনশ্যাম রোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের খেতের কাঁচা-মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষা ধারাজলে ॥
যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে মাটিতে।

ধ্বনিত টিনের ছাদে, গলিতে, গ্রামের আর্দ্র মাঠে
জলের ডাহুকী ডাকে, প্রাচীন জলের কলরবে ;
চঞ্চল পাখির নীড়ে ; বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥

অন্ধকার ঝর্নাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রাম জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে
সঙ্কলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে
গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গ শীর্ষে, মাঠে
ফিরে নামে মর্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে ॥

মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে ॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র মাটি, রুদ্র দিন, দূর
উদাসীন মাঠে মাঠে আকাশেতে লগ্নহীন সুর

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ব্যবধান

তোমারে বোঝার বুদ্ধি আজও মোরে দেয় নি বিধাতা
তাই যবে চন্দ্রকান্ত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ পাতা
বিস্ফারি তাকাও তুমি মাঝে মাঝে মোর মুখপানে,
আমি আত্মহারা হই, সে-নিগূঢ় চাহনির মানে
ধরিতে পারি না ; শুধু অনুষঙ্গে জাগে কত স্মৃতি ;
কে কবে অমনই চেয়ে জাগতিক বঞ্চনার রীতি
আমারে শিখালো যেন, অমনই পল্লবঘন আঁখি
অমৃতের আশা দিয়ে পারিজাতকুঞ্জে মোরে ডাকি,
অনিকাম বিসংবাদে বারম্বার হলো পণ্ডশ্রম
পলাতক সন্ধিলগ্নে।

একবারমাত্র ব্যতিক্রম
ঘটেছিল সে-বিধির ; হেমন্তের উর্ধ্বশ্বাস সাঁঝে
উদ্‌ভ্রান্ত কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়
আগন্তুক তমস্বিনী আপনারে অচিরে হারায়,
নিস্তৈল দীপের মতো মানুষের নিরাশ্রয় মন
আছাড়ি-বিছাড়ি নেবে, কোনো এক সন্ধ্যায় এমন—
যুগান্তে, জন্মান্তে যেন—শাপভ্রষ্ট কে এক উর্বশী
অন্তর্দীপ্ত উল্কাসম করপুটে পড়েছিলো খসি
অধরার মূক বার্তা মর্ত্যরজে করিতে সঞ্চার।

সে-দিনে মুহূর্তকাল অবচ্ছিন্ন শরীর আমার
অম্লান, অনন্ত বীর্যে উঠেছিলো উচ্চকিত হয়ে ;
অনাদ্য ওঙ্কারনাদে জেগেছিলো প্রতন হৃদয়ে
চিরঞ্জীব পুরুরবা ॥

কিন্তু কোনো কথা কহে নি সে ;
বলে নি আপন নাম ; সনাতন অন্ধকারে মিশে
নিঃসঙ্কোচ জৈবধর্মে করেছিলো মোরে সম্প্রদান
অনির্বচনীয় তনু। ব্যষ্টির প্রাকৃত ব্যবধান
তাই তীর্ণ হয়েছিলো নির্বাণের অখণ্ড শান্তিতে ;
মোদের বিশ্লিষ্ট আত্মা জাতিস্মর দেহের ইঙ্গিতে
প্রাক্তন প্রবৃত্তিপথ খুঁজে পেয়েছিলো অকস্মাৎ ;
অসম্ভূতির ঐক্যে ঘুচেছিলো বহুর ব্যাঘাত ॥

সে-দিব্য মিলনে তুমি অধিকার দাও নি আমারে।
তোমার বিশ্রব্ধ বাক্য তাই মোর রুদ্ধ চিত্তদ্বারে
বৃথা করাঘাত হানি নিরন্তর ফিরে ফিরে যায়।
তোমার সান্নিধ্যে তাই ব'সে থাকি আমি মৌনপ্রায়
সৌজন্যের ঘটাটোপে আপনারে পাকে পাকে ঘিরে ;
যে-দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে
মোদের বিয়োগধর্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা
স্বতন্ত্র জ্বালার কক্ষে নিরুপায়ে করে আনাগোনা।
তুমি চাও মোর মুখে, আমি তব মুখপানে চাই ;
এই ভাবি বুঝিলাম, এই ভাবি কিছু বুঝি নাই ॥

—উত্তরফাল্গুনী

উন্মার্গ

ঢেউ গুনে গুনে, কেটে যায় বেলা
সিন্ধুতীরে ;

জানি পুনরায় ভাসাব না ভেলা
অবাধ, অগাধ, অপার নীরে।
তবে মাঝে মাঝে কেন মনে পড়ে
পালের স্ফূর্তি উদ্দাম ঝড়ে,
উধাও তারার ইশারায় পথ
অবার নিরুদ্দেশে,
যেথা সর্বতোভদ্র জগৎ
সম্ভাবনার নিখিল নির্বিশেষে ?

অথবা নিবাত, নির্মল নীল
দ্বিপ্রহরে
পরিণত মায়ামুকুরে সলিল
আকাশে, বাতাসে আলস ভরে ;
স্তম্ভিত তরী যেন পটে আঁকা ;
অবাক বলাকা সংবৃতপাখা ;
অনাথ দ্বীপের বৃথা অধিবাস
বিলীন বিস্মরণে ;
অপ্সরীদের নিভৃত বিলাস
মুক্তাবিকচ রক্ত-প্রবাল-বনে ॥

কখনও আবার বাদলে ব্যাহত
আলোর গ্লানি
চেতনাচেতনে ঘনায় নিয়ত
অজাত দিনের অন্ধ হানি।
কিন্তু একদা সন্ধ্যার আগে,
মৌসুমী মেঘ ভিন্ন দু ভাগে,
স্নানযাত্রার স্বর্ণ সরণী
মুক্ত মর্ত্যধামে :
দক্ষিণে ডোবে স্মিত দিনমণি,
পৌর্ণমাসীর চন্দ্রমা জাগে বামে ॥

তার পর প্রতি পলের অভেদ ;
দিবা ও নিশা
আনে না কালের স্রোতে বিচ্ছেদ ;
এমন কি আয়ু হারায় দিশা।
নিত্য অন্তরীক্ষ ও জল,
অতৃপ্ত তৃষা তথা কুতূহল,
এবং দুরাপ, দূর দিগন্ত—
মূর্ত অসন্ধান ;
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত
সে-যবনিকার প্রতিভাসে ক্ষীয়মাণ ॥

তবু এসেছিল সহসা ব্যাঘাত
স্বগত ধ্যানে।
কঠিন মাটির অভিসম্পাত
বর্তেছিল কি অভিজ্ঞানে ?
অন্তত দিতে চেয়েছিল ঘুষ
মণি-কাঞ্চন-যোগে প্রত্যূষ ;
প্রশস্তি ব'লে হয়েছিল ভুল
শঙ্খচিলের হাসি ;
মায়াবী পুলিনে লোভের প্রতুল
দেখেই তরণী শূন্যে অবিশ্বাসী ॥

অনাত্মীয়ের মুখ চেয়ে আছি
সে-দিন থেকে ;
উঞ্ছ কুড়িয়ে অগত্যা বাঁচি
নিরুপার্জন নির্বিবেকে।
দৃষ্টির সীমা মাপে হিমগিরি ;
পর্ণকুটীরে দুর্যোগে ফিরি
সৈকতে এসে বসি কদাচিৎ
আমার উপক্রমে ;

মহার্ণবের সামসঙ্গীত
হয়তো বা শুনি শুক্তির মাধ্যমে

—সংবর্ত

প্রমথনাথ বিশী

বিদ্যাপতির রাধা

রাধা? কে সে? জানি তারে? তারি নাম আমি
কাব্যে গেঁথে চলিয়াছি, অস্ত-অনুগামী
শর্বরী যেমন গাঁথে তারার বকুলে
বিরহের নর্মহার! তারি স্মৃতিশূলে
বিদ্ধ করি রাখিয়াছি মোর জীবনের
আদি অন্ত ভবিষ্যৎ। তারি চরণের
মদির সঙ্কেতে কাঁপে মোর তনু মন
মুমূর্ষু শেফালিদলে আলোর মতন
সুপ্রসন্ন সমীরণে! প্রথম-ফাল্গুনে
উদ্‌ভ্রান্ত অধীর বায়ু যায় যথা বুনে
দিকে দিকে স্বপ্নাঙ্কুর, সেইমতো আমি
আপনা-বিস্মৃত হয়ে, দীর্ঘ দিবাযামী
সুখে দুঃখে ডোরাটানা বিচিত্র স্মৃতির
তারি নাম, তারি লীলা অজস্র গীতির
চল-কণ্ঠে ঢালিতেছি! মনে তো পড়ে না
যৌবনফাল্গুনে মোর কে বসন্তসেনা
হেন মায়াচ্ছায়াময়? চিনি না রাধারে।
পল্লবপেলব ঘন সুস্নিগ্ধ মাদারে
মেদুর তমিস্রারাশি, যেন সে প্রিয়ার
রতিমুক্ত কেশপাশ! নাহি পড়ে চোখে
কোন্ রাধা, কোন্ কৃষ্ণ, আছি কোন্ লোকে!
ছন্দের সঙ্কেত শুনি ছুটি অসম্বিৎ—
নাহি জানি স্বর্গ, শাস্ত্র, দেবতাচরিত।

নহে নহে রাধা, নহে সে রাধিকা,
ছন্দের মুকুরে মোর যেই প্রসাধিকা
অকারণে বেণী খুলে দেখিছে চিকুর ;
সিঁথির বীথির 'পরে পরিতেছে চূড়
রক্তকুরুবকে ; আর ঘুচায়ে কাঁচলি
দুর্গম সঙ্কট মাঝে গুঁজিতেছে কলি
স্বর্ণকরবীর ; আর নূপুর দুটিরে
অদলি-বদলি পরে, পরে ধীরে ধীরে,
যেন ত্বরা নাই ; আর হাসির আভাসে
গালে টোল পড়ে, আর চকিত চাহনি
ছুটে চলে যায় যেন সুবর্ণহরিণী !—
তারি কথা বলিতেছ ? সে যে সাহসিকা,
নহে সে নহে সে রাধা, সে নহে রাধিকা।

সেদিন পূর্ণিমাশশী ঘনপুঞ্জ মেঘে
ক্ষণে ক্ষণে আবরিছে, যেন বায়ুবেগে
পদ্মে আর পদ্মপত্রে চলে লুকোচুরি
নীল সরোবরতলে ; উঠিছে অঙ্কুরি
বিস্মৃত বাসনা যত চূতমঞ্জরীর
দুর্নিবার অন্ধ বেগে ; বহিছে সমীর
পুলক-জাগানো স্মৃতি ; দিগ্বলয়-ডোর
শ্লথ নীবীবন্ধ-সম রভসবিভোর
সুপ্ত নাগরীর ; যেন সমস্ত ভুবন
আবছায়া-মায়া-ঢালা কাহার চুম্বন-
পরশনে !

হেনকালে সন্ধ্যারতিথালে
পাঁচটি প্রদীপ বহি প্রভাদীপ্ত ভালে
কৃত্তিকারূপিণী ধনী আসিল বাহিরে ;
অপরিচিতের পানে তাকাইল ফিরে

একবার ; তারপরে গেল সে চলিয়া
জলদে-বিজলি-সম দ্বন্দ্ব পসারিয়া
ছায়া-ঢালা বীথিপথে। রূপ যায়, স্মৃতি
প্রেতের আকাঙ্ক্ষা বহে ; দুঃখ হয় গীতি,
চাক-ভাঙা মধুপের হা-হা গুঞ্জরণ!
বিজলি-ঝলিত চোখ সর্বত্র যেমন
বিদ্যুতের আভা দেখে তেমনি সদাই
সে রূপময়ীর রূপ দেখিবারে পাই।
নিদ্রার খিলানে দেখি আছে সে দাঁড়ায়ে
দীপঙ্করী ; স্বপ্নে আসে চরণ বাড়ায়ে
সকৌতুক কৌতূহলে ; ধরে সে কত-না
অচিন্ত্য অপূর্ব কায়া পথিকললনা
স্মৃতির বীথিকাচারী—উঠি চমকিয়া।
পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝে দ্বন্দ্ব পসারিয়া
প্রেমের সে পসারিনী যায় ঝলকিয়া।

সেদিন চলিতেছিনু রাজপথ-'পরে,
ভগ্ন চূতাঙ্কুর এক মাথার উপরে
সহসা পড়িল আসি। দেখিনু চাহিয়া,
প্রাসাদ-অলিন্দতলে রয়েছে বসিয়া,
শরতের শুভ্র মেঘে শুভ্রতর শশী
সে রমণী! আপনার অন্তস্তলে পশি
যেন হারায়েছে পথ, যেন সে দেখেনি
পথের পথিকে কোনো! অয়ি একবেণি,
তবু না ভাসিত যদি কটাক্ষে কৌতুক!
তবু না ঝলিত যদি হাসির যৌতুক
অধরের কোণে কোণে! একি লীলা তব,
পথের পথিকে হানি অস্ত্র অভিনব
কন্দর্পের অভিনয়! তুমি বুদ্ধিমতী,

তাই বলে হতভাগ্য আমি স্থূলমতি
এ কেমন অনুমান? নিলাম কুড়ায়ে
মকরকেতুর ছিন্ন রথের চূড়া এ
পাটল মঞ্জরীখণ্ড; হল সে আমার
স্মৃতির নিষ্ঠুরাঘাতে শয্যা শরাধার।

সখীসনে স্নানরঙ্গে দেখেছি তাহারে;
করবিতাড়নে তার মুক্তাদ্যুতি হারে
উচ্ছ্রিত ফেনিল ঊর্মি; যেত তারা ভাসি
অতল সুপ্তির মাঝে যেন স্বপ্নরাশি
অনায়াস কী লীলায়! উঠিত যখন
সোপানশিলার 'পরে, নিষিক্ত বসন
অঙ্গে অঙ্গে মিলাইত—নব সূর্যোদয়ে
মেঘচ্ছদ গৌরীশৃঙ্গে যায় লীন হয়ে।
তার চেয়ে শ্রেয়স্কর নিষ্কল নগ্নতা।
এ যেন তর্জনী তুলে হৃদয়ের কথা
বৃথা রুধিবার চেষ্টা, যতই শাসন
তত আরো বেশি ক'রে শরম-নাশন
একি মাথা কুটে মরা! রহস্য দেহের
আজো হইল না ভেদ; তাই মানুষের
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, নাই দিগ্বিদিক্—
তাই তো আজিও সে যে শিল্পের পথিক।

তার পরে কতবার দেখিয়াছি তাকে
রাজসভা-মাঝে। ঊর্ধ্বে জালায়ন-ফাঁকে
নেত্র তার জল-জল; উৎকণ্ঠা গানের
নিঙাড়ি টানিছে যবে নিভৃত প্রাণের
শেষবিন্দু রস—আর সমস্ত ভবন

অনির্বচনীয়তায় করে টন্ টন্
সুপক্ব দ্রাক্ষার গুচ্ছ, দেখেছি তখন
কামনার উল্কা-জ্বলা তার দুটি চোখ
ইন্ধনসন্ধানী ; চির জড়ত্বনির্মোক
অজ্ঞাতে কখন খুলি বুভুক্ষু নাগিনী
এসেছে স্বমূর্তি ধরি বাসনারূপিণী
আদিম রমণীশিখা ; দুটি নেত্র মম
সে দৃষ্টির নাগপাশে বদ্ধ মৃগ-সম
আপনা-বিস্মৃত আর বিস্মৃত সকল—
স্থান কাল, পাত্র মিত্র, রাজসভাতল

সেদিন সে চলেছিল সখীসনে মিলি
বিশ্রব্ধ-আলাপরঙ্গে ; রৌদ্র-ঝিলিমিলি
নব নব অলঙ্কার দিতেছিল তুলে
প্রতি অঙ্গে, কটিতটে, কণ্ঠে, বাহুমূলে
মুগ্ধ প্রণয়ীর মতো ! বনবীথিচ্ছায়ে
অভিনব কী বসন দিতেছে জড়ায়ে
দেহে তার ! আলো-ছায়া প্রণয়ী-যুগল
তাহারে করিতে খুশি হয়েছে পাগল—
কেহ দেয় শাড়ি আর কেহ অলঙ্কার,
সমান নিষ্ফল দোঁহে মুখ ক'রে ভার
প'ড়ে থাকে পথে। আমি সম্মুখে আসিয়া
দাঁড়ালেম। সখী তার শুধালো হাসিয়া,
কী চাও পথিক ? মুখে না জুয়ালো বাণী।
কী চাই ? তাই তো! আমি নিজেই কি জানি

কেন যে এমন হয় কে পারে বলিতে ?
আশার চরম লগ্নে কে আসে ছলিতে

বিড়ম্বিতে অকারণ? ভাষা কি শেখে নি
কেমনে ছাড়াতে হয় ঘটনার বেণী?—
ছায়ারে কেমন করি কায়া দিতে হয়?—
বাক্যে যাহা স্থূল অতি তাহারে প্রত্যয়
না পারে করাতে ভাষা; সঙ্গীতের সুর
সেও হার মানে, নাহি যায় তত দূর!
তাই শুধু চেয়ে থাকা!

গেল তারা চলি
অশোক-জাগানো পায়ে আলো-ছায়া দলি
বিশ্রামের বিস্রম্ভনে। দেখে ফিরে ফিরে,
দেখে আর হাসে দোঁহে। প্রদোষসমীরে
হাসির নিক্বণ আসে রূঢ় অদৃষ্টের
অক্ষধ্বনিসম; মোর জীবন-ছকের
সব ঘুঁটি দেয় উলটিয়া। দুজনায়
মিলালো পথের বাঁকে—বৃথা স্বপ্ন-প্রায়।
ততক্ষণে সন্ধ্যাকাশে হয়ে গেছে টানা
রঙের তুলিকা যত। বিগত-নিশানা
সঙ্গীহীন সন্ধ্যাতারা চেয়ে আছে একা—
তখনো তারার দল দেয় নাই দেখা।

সে কি মধ্যরাত্রি হবে? আরো বেশি কিছু
কালপুরুষের অসি অতখানি নীচু
না হয় দ্বিতীয় যামে। স্বপ্নে-মনে-পড়া
প্রিয়মুখচ্ছবিসম তরুতলে ঝরা
বকুলের আধো গন্ধ। প্রোষিতভর্তৃকা
বিরহিণী বধূ-সম ঘুমাইছে একা
বিনত রজনীগন্ধা। বেড়াপ্রান্তে হেনা
কত কী ইঙ্গিত করে, চেনা ও অচেনা

জগতের সীমন্তিনী। পুরীর উৎসব
কেবল হয়েছে শেষ; ফিরিতেছে সব
যে যাহার ঘরে। মুখে কারো নাহি কথা;
সকলেরি রক্তে এক আদি-ব্যাকুলতা
চঞ্চলিয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম তারে
স্বপ্নের পথিক-সম গুণ্ঠিত আঁধারে
চলিয়াছে। দাঁড়ালেম সমুখে আসিয়া—
আর না উঠিল তন্বী কৌতুকে হাসিয়া;
কুণ্ঠিত থামিল ধীরে। সে যেন রে জানে
আমি চির-প্রত্যাশিত, যেন এইখানে
দুজনে মিলন হবে অদৃষ্টের লেখা—
পথের জনতা-প্রান্তে মোরা দোঁহে একা।

কোথা গেল নাগরীর কৌতুকভাষণ?
কোথায় সে মুহুর্মুহু অপাঙ্গশাসন?
কোথা নিক্বণিত হাসি? ডুবিয়াছে ভরা;
বানচাল হয়ে গেছে সমস্ত পসরা,
সুখের বেসাতি যত। আছে শুধু নারী,
আর আছে বুভুক্ষিত হৃদয় তাহারি—
নহে অতিরিক্ত কিছু। প্রণয়স্তিমিত
চক্ষে আধো-অবিশ্বাস। বিহঙ্গিনী ভীত
আঁধারে আশ্রয় খুঁজি ফিরিয়াছে নীড়ে,
তবু না প্রত্যয় হয়। আমি ধীরে ধীরে
কুসুমকোমল কর লইলাম টানি!
তার পরে কী হয়েছে কিছুই না জানি!

তখন ছুঁইল চন্দ্র ধরার কপোল;
খসে-পড়া পুষ্প পেল ধরণীর কোল;
সারারাত্রি সাধনায় চঞ্চল সমীর
কুয়াশা-অঞ্চলখানি গৌরীশিখরীর

তখন ঘুচালো সবে ; ত্রিযামা প্রহর
ছায়া দেয় নাই ধরা, মূঢ় তরুবর
সেধে সেধে মরিয়াছে, তখন আঁধারে
তরুছায়া এক হয়ে গেল একেবারে।

অবোধ বালক যথা প্রতিদিন দেখে
নব অঙ্কুরিত বৃক্ষ মেলে একে একে
নব পত্র নব দল, পরম বিস্ময়ে
কথা না জোগায় মুখে, থাকে মুগ্ধ হয়ে—
সেইমতো দেখিয়াছি তারে, পাই নাই
রহস্যের তল। যবে দূরে চলে যাই
নিকটচারিণী সে যে ; কাছে যবে আসি
সে যেন সুদূরে গেছে দিগন্ত-উদাসী
ক্ষীণ তন্বী বনলেখা বাষ্পমায়াময় ;
বিশ্বাসের তরুশাখে দোলা অপ্রত্যয় ;
কোলে টেনে নিয়ে বুঝি নির্মম বিরহ ;
ছেড়ে দিয়ে জানি সঙ্গে আছে অহরহ
স্মৃতির সুগন্ধ-রূপে ; রাগারুণ গালে
চুম্বনের চন্দ্রকলা মিলায় অকালে
ঝড়ের ইঙ্গিতে কোন্ ; দুরন্তঝটিকা
মেঘ কেটে অকস্মাৎ দেখি স্মিতলিখা
আচম্বিত সুপ্রভাত, আপনার রূপে
আপনি আড়াল হয়ে নিজের স্বরূপে
ঢেকে যেন রাখিয়াছে। এই যদি প্রেম,
আজিও তাহার হায় অন্ত না পেলেম !

এই মোর রাধা। সে যে একান্ত মানবী
যৌবনযজ্ঞাগ্নি হতে বাসনার হবি
উত্তিন্ন করেছে নব রূপনন্দিনী।
কামনার গিরিশৃঙ্গ হতে নিঃস্যন্দিনী

এই নব ভোগবতী। প্রেম সে মর্ত্যের
আর আনন্দ স্বর্গের। প্রণয়াবর্তের
প্রচণ্ড ঘূর্ণনে হেথা জীবনের হেম
ধরেছে অরূপ কান্তি, তারে বলি প্রেম।

নহে তাহা সুখ, নহে দুঃখ নিরবধি ;
অসীম সমুদ্র নহে, নহে ক্ষুদ্র নদী ;
নহে পাওয়া, নাহি-পাওয়া ; নহে আত্মা, দেহ ;
বুকে বেঁধে কাঁদা আর উথলিত স্নেহ
বাহুপাশ মুক্ত করি। কামলোকমাঝে
নিগূঢ় মৃণাল তার ; রূপলোকে রাজে
অনবদ্য অরবিন্দ মেলি দিয়া দল ;
অরূপ লোকের বায়ু তার পরিমল
রেখেছে নন্দিয়া নিত্য। সেই মোর রাধা !
ত্রিলোকের অভিজ্ঞতা যন্ত্রে তার সাধা !
কামনার নটী সে যে ; পাপ-পঙ্কজিনী
মধ্যরাত্রে সুরাপাত্র ঝঙ্কৃতকিঙ্কিণী
ধরে ওষ্ঠে ; নিয়ে যায় দেহান্তের শেষে
যৌবনযোগিনী যেথা ছিন্নমস্তাবেশে
আপন রুধির পিয়ে। যত কিছু পাপ,
সুরাপাত্র ঘিরি আছে যত-না প্রলাপ
মুখরিয়া মত্ত হয়। স্খলিত নূপুর
মদিরপিচ্ছিল ভূমে ভেঙে করে চুর
সত্যশাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্কল্প মহৎ,
কীর্তির নরকে বসি দেখায় সে পথ
ঊর্ধ্বগামী। আমি কবি তুলিয়াছি তায়
প্রলয়পয়োধি হতে বেদবাণীপ্রায়
কল্পনার রূপলোকে। আমি তার কবি।
দেব নহে, দৈত্য নহে, একান্ত মানবী
আমার শিল্পের পদ্মে।

তারে বলো রাধা ?
ত্রিলোকের সপ্তস্বর কণ্ঠে তার সাধা।
কামনার নটী সে যে, প্রেমের রমণী,
ভাবনার অপ্সরী সে, কবিতার ধনী,
বৃকভানুপুত্রী রাধা। সে নহে কৃষ্ণের।
তারে বসায়েছি আমি পালঙ্কে কাব্যের,
যাপিব বাসররাত্রি। নন্দের নন্দন
আসিলে দেখিবে, নাহি দ্বারের বন্ধন
উন্মোচিত। জানো সবে, রয়েছে বসিয়া
সঙ্গোপনে বিদ্যাপতি আর তার প্রিয়া ॥

—অকুন্তলা

আমি টাইম-টেবল পড়ি

আমি টাইম-টেবল পড়ি।
জানালার ধারে ব'সে
বাইরের দিকে তাকিয়ে
একা একা আমি টাইম-টেবল পড়ি।
কালো-আঁক-কাটা পাতাগুলো
দ্রুত উলটিয়ে যাই,
গাড়ির উল্টো মুখে যেন
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে
মাইল-স্টোনের পাথর।

ওই জানালার ধারে বসেই আমার ট্রেন লম্বা পাড়ি দেয়।
ঘন ঘন নদীনালার সাঁকো,
দু'দিকে ধানক্ষেত,
পচা পুকুর,
বাঁশঝাড় ;

আম-কাঁঠাল-নিম-শিরীষের জড়ানো ছায়াতে
ধোঁয়া-ওঠা কুটির,
বিলে শাপলা,
মাঠে কৃষাণ,
আকাশে চিল,
ধুলোর-আঁচল-ওড়া পথের প্রান্তে এইমাত্র মিলিয়ে-যাওয়া
গোরুর গাড়ির আর্তনাদ,
তন্দ্রাভাঙা কুকুরের ক্ষুধিত কণ্ঠ,
মাঝখানে ট্রেন ছুটেছে জাঙাল-বাঁধা পথে।
আমি কিন্তু জানালার ধারেই ব'সে।

ক্রমে পৃথিবীর চেহারা বদলে আসে।
নারকেলের জায়গায় তাল,
আমের জায়গায় শাল,
বিলের জায়গায় বাঁধ
চমকিত করে তার ইস্পাতধবল বারি,
মাটিতে ঢেউ জাগে,
ভূস্তরের নিস্তব্ধ ওঠাপড়া বিস্তারিত হয়ে যায়
দিগন্তের দিকে,
বনচিহ্নহীন নিঃসীম দূরত্বে
কয়েকটি শীর্ণ তাল
শূন্যতার কঙ্কাল।
হঠাৎ শালবনের মধ্যে গাড়ি ঢুকে পড়ে।
সাঁকোর ঝঙ্কারে বাইরে তাকিয়ে দেখি
নদীর বালুশয্যায় পাথর-চুয়ানো জল,
অর্ধমগ্ন মহিষের পাল;
মনে মনে ডুব দিয়ে নিই।
পরে পরে এসে পড়ে ছুটো সিগনালের খুঁটি,
তারপরেই স্টেশন।

গাড়ি থামে,
লোক নামে ;
কেউ কেউ চড়ে,
কেউ কেউ বা শুধুই ছুটোছুটি ডাকাডাকি ক'রে মরে
হুইস্‌ল বাজে,
নিশান দোলে,
গাড়ি ছেড়ে দেয়।
আবার মাঠ, আবার বন,
আমি কিন্তু জানালার ধারেই ব'সে।

হেলে-পড়া সূর্যের চক্‌চকে সঙিন
জানলা দিয়ে খোঁচা মারে,
চম্‌কে স'রে বসি,
বুঝতে পারি, দিন শেষ হয়ে আসবার মুখে।
একে একে জনপদের চিহ্ন দেখা দেয়—
কল, কুঠি, ধোঁয়া, শব্দ,
কুলিদের সারিবদ্ধ ব্যারিক।
দ্রুত লাইনে লাইনে জট পাকিয়ে যায়,
আবার একটা জট খুলে তিন জোড়া লাইন বেরোয়।
কোথাও বা মালগাড়ির শ্রেণী,
কতক খালি, কতক বোঝাই ;
কিন্তু সমস্ত এমন নিঃসঙ্গ
যেন লোকে ভুলেই গিয়েছে ওদের প্রসঙ্গ।
ঘন ঘন সিগনাল, এঞ্জিন, উর্দিপরা লোক।
মস্ত স্টেশন, প্রকাণ্ড জংশন,
গাড়ি এসে থামলো।
রাবণের পুরীর বারান্দার মতো টানা প্ল্যাটফর্ম,
কত মাল, কত মালিক,
কত যাত্রী, কত দর্শক,

বিচিত্র হাঁকডাকের অফুরন্ত ফুলঝুরি।
আমার কিন্তু নামবার তাড়া নেই,
আমি ব'সে আছি সেই জানালার ধারেই।

স্টেশনের বাইরে সারিবদ্ধ সিসুগাছের ছায়ায়
সুরকি-ঢালা লাল পথ,
সেই পথের ধারে এক জায়গায়
ঝুমকো লতার ফুল-দোলানো
লাল টালির বাংলো।
সেখানে আছ তুমি,
তাই সেখানে আছে আমার পৃথিবী,
তাই সেখানে আছে অনন্ত কাল।
অনন্ত সে যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে মুষ্টিমেয় পড়ে আছে
তোমার পায়ের কাছে।
আর এত বড় যে পৃথিবী সে তোমার মছলন্দখানার চেয়ে
অধিকতর প্রসর নয়।
আমি দেখতে পাচ্ছি
তোমার চরণ-দুখানি ঘিরে ঝালর ঝুলিয়েছে
শুভ্র শাড়ির সবুজ পাড়;
চলনের তালে চঞ্চল,
পরনের ভঙ্গীতে কুঞ্চিত,
সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রান্ত
যেন তালে তালে স্তব ক'রে নাচছে সুন্দরী পৃথিবীর।

আমি কি তোমাকে দেখিনি
অষ্টমী-চন্দ্রের দিব্য কমণ্ডলু
যখন ঢেলে দিয়েছে তোমার শিরে শুভ্র-জ্যোৎস্না!
আমি কি তোমাকে দেখিনি
গোধূলির চেলিতে অপরূপ, অপূর্ব!

আমি যে দেখেছি
কামনার-কুঁড়ি-ভরা তোমার অধরোষ্ঠ !
আমি যে দেখেছি
কিশোরী পূজারিণীর নিপুণ-হাতে গড়া
শিবপূজার যুগল বেদী তোমার বক্ষে !
আর দেখেছি
সৃষ্টির শেষদিগন্তের রহস্যময় তোমার দুটি নেত্র,
উমার পূর্বরাগের মতো তোমার কপোল,
শচীর দর্পণের মতো তোমার ললাট।
কিন্তু সুন্দরী
আজ সে সমস্ত হার মেনেছে
তোমার ঐ চরণ-দুখানির কাছে।
আজ ইচ্ছা করছে আমার হৃদয়খানাকে
প্রচণ্ড বলে আছড়ে ফেলে দিই তোমার পায়ের তলে,
তার রক্তরাশি ছিটকে পড়ুক
তোমার চরণ-দুটি ঘিরে,
শনিগ্রহের মেখলার মতো
অঙ্কিত করুক এক তপ্ত মত্ত দীপ্ত অলক্তের বেষ্টনী।

আমার বাসনার ফুলবনের উপর দিয়ে
ওই দুটি চরণ চলে যাক,
আমার কামনার দ্রাক্ষাবন দলে যাক,
আমার কানে কানে বলে যাক,
'ধরা দিইনি বলেই ধরতে চাইছো,
অন্বেষণেই তো মৃগয়ার আনন্দ !
স্বর্ণমৃগী ধরা দেয় না বটে
তাইতো সেই মৃগয়াসুখেরও অবসান নেই কোনো কালে।
জানালা দিয়ে মন যায় না,
তাইতো জানালা এমন মোহিনীর মন্ত্র পড়া।'

ভোগবতীর হংসমিথুনের মতো
ওই চরণ-দুটি আমার কানে কানে বলুক,
'জানালায় বসে যদি সুধার স্বাদ পাও
তবে দ্বারের সন্ধান ক'রো না।'
চমকে উঠি!
আমি তো জানালাতেই ব'সে।
আমার নামবার তাড়া কিসের?

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ুক,
আমার বাতায়নিকাকে কাড়বে এমন সাধ্য কার?
আমি জানি, টাইম-টেবল পড়বার আনন্দ
দেশভ্রমণে নেই।
তাই আমি একা একা টাইম-টেবল পড়ি
জানালার ধারে ব'সে॥

—উত্তরমেঘ

সুনির্মল বসু

তিন-চুড়ো পাহাড়ের দেশে

গোধূলিতে ডুলি চ'ড়ে আমি চলি দূর গাঁয়ে তিন-চুড়ো পাহাড়ের শেষে—
পার হয়ে অবিরাম কত গ্রাম, মাঠ-ঘাট, চলি চলি বুনোদের দেশে।
দুই কুলি বয় ডুলি, আমি চলি দুলি দুলি সাঁওতাল-পরগনা দিয়ে,
শীতের অলস বেলা ক্ষীণ হয়ে আসে ক্রমে, আয়ু তার আসে যে ফুরিয়ে।
আকাশের ভাঙা-চোরা অগণিত মেঘে মেঘে সিঁদুরের ছোঁয়া যেন লাগে,
যেন কোন্ অতীতের মায়াময় স্মৃতিগুলি রাঙা হয়ে ওঠে অনুরাগে।
তখন ভেঙেছে হাট দূর কোন্ 'দেহাতে'র, বুনোপথ ভেঙে তাড়াতাড়ি
চলেছে গোরুর গাড়ি, লোকজন সারি সারি, কেনা-বেচা সেরে' ফেরে বাড়ি।

চলেছে মেয়ের দল, গানে ক'রে কোলাহল, নাহি বুঝি সে গীতের বাণী,
তবু সে গানের ভাষা, যাহা শুনি ভাসা-ভাসা, আকুল করিছে প্রাণখানি।
নুড়ি আর খোয়া-ভরা উঁচু-নীচু মেঠো পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে ঘুরে,
ডুলির ঝোলার মাঝে আমি চলি একটানা, দূরে,—কোন্ সীমাহীন পুরে।
পার হয়ে চলি মাঠ, আসে ঘন শালবন, তালবন ডাহিনে ও বামে,
গাছের মাথার পরে মিলালো দিনের আলো, ধূসর সাঁঝের ছায়া নামে।
শাখে শাখে পাখীদের কলহের কোলাহল, ঘরে ফেরে বেলে-হাঁসগুলি,
নিঝুম শীতের সাঁঝে ধূসর বনের মাঝে হেলে-দুলে চলে মোর ডুলি।
সহসা বনের ধারে আগুনের ছোপ লাগে—পূরবের গগনের কোণে,
আবছায়া ধরা যেন আলোর স্বপন দেখে' হেসে ওঠে আপনার মনে।
আঁধার সাগরকূলে আলোকের ঢেউ এলো, কে শোনালো সোনালী এ ভাষা,
নিরাশা-আঁধার মনে জাগে যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রাণভরা আলোময় আশা।
আমি শুধু চেয়ে দেখি কৃষ্ণা-তিমির সাঁঝে অপরূপ রূপের মাধুরী,
ওঠে চাঁদ প্রতিপদী, উজল সোনার দ্যুতি আছে তার সারা দেহ জুড়ি'।
বনে বনে সাড়া জাগে, পাখীদের কোলাহল থেমে যায়, ধরে তারা গীতি,—
আলোর অতিথি আসে, অভয়ের হাসি হাসে, দূর হয় আঁধারের ভীতি।
ঝিরি ঝিরি হাওয়া বয়, গাছে গাছে ঢেউ ওঠে, শাখে শাখে মৃদু আলো দোলে,
ঝিলিমিলি জ্যোছনা সে ঝিম্‌ঝিমে সাঁজে আজ কুয়াসার আবরণ তোলে।
ছোট পাহাড়িয়া নদী প'ড়ে আছে নিরালায় বালুর চাদরখানা মেলে,
তারি সাদা বালুচরে খাড়া ঢালু পথ বেয়ে চলে ডুলি কালো ছায়া ফেলে।
তীরে মেহেদীর বন, ঘন ঘন ঝোপ-ঝাড়ে ঝিঁঝিদের চলে কানাকানি,
শীতের প্রখর সাঁঝে, শিবা ডাকে মাঝে মাঝে, আশে-পাশে নাহি জন-প্রাণী।
আলোর পরশে ফের জাগে দূর সীমানায় ছায়াময় পাহাড়ের রেখা,
হাতছানি দিয়ে ডাকে সাঁওতালী বুনো গ্রাম, পাহাড়ের শেষে যায় দেখা।
পাহাড়ের তলে তলে বুনোদের গান চলে, মাদলের ধ্বনি আসে ভেসে,
চলে চলে ডুলি চলে ওই পাহাড়ের গাঁয়ে—তিন-চুড়ো পাহাড়ের দেশে॥

জসীম উদ্দিন

অবেলায়

কেন সন্ধ্যায় তুমি এলে—
কনক-মেঘের অলকায় আজি
রঙের কুহেলি মেলে'।
গেঁয়ো নদীটির দু'টি কূল ধরি'
ঝাউ-ঝাড়ে কেশ নাড়ে বিভাবরী,
জলের আঙিয়া উঠিয়াছে ভরি'
তারি ছায়া বুকে ফেলে'।

কেন তরী তুমি বেয়ে যাও মাঝি
মোর নদীতট দিয়া,—
তোমার গানে যে বাসা বাঁধিয়াছে
আমার গোপন হিয়া!
তুমি চ'লে যাবে সাঁঝেরি মতন
আঁধারে ভাসায়ে মেঘের আগুন,—
ঘিরিয়া আমার নয়ন গগন
মেঘ দেছে ধারা ঢেলে।

ওগো ক্ষণিকের বন্ধু আমার,
ফিরে যাও তবে ঘরে;
এই ব্যথা শুধু রহিল, তোমায়
নারিনু রাখিতে ধ'রে।

মোর কেয়া-বনে ছিল যত ফুল
জলে ভাসালেম মিছে করি' ভুল,
এখন আমার বেড়িয়া দু' কূল
কাঁদন বেড়ায় খেলে'॥

জলের ঘাটে

নদীর কূলে কেয়ার বন, তাহার নীচে ঘাট,
সেই ঘাটেতে ডুব দিয়েছে দিঘল গেঁয়ো বাট।
সেখান দিয়ে জল্‌কে যেতে পল্লীবধূর দল
দোলায় ঘড়া, এলায় চুল, বাজায় পায়ে মল।
সারি সারি কাঁখের ঘটে কাঁকন বাজে র'য়ে,
দেবারতির প্রদীপ-মালা চলছে যেন ব'য়ে।

কারো পরন হলুদ শাড়ি, কারো পরন লাল,
কারো শাড়ি নীলাম্বরী, কারো বা 'মেঘ-জাল'।
রঙের রঙের শাড়ির লহর দুলছে রঙের বায়—
মেঘের বহর দুল্‌ছে যেন রঙিন সাঁঝের গায়।
দু'ধারে মাঠ সুদূর-ছাওয়া—সবুজ পারাবার—
সেই সাগরে ওরাই যেন করছে পারাপার।

রঙের রঙের শাড়ি ত নয়, শতেক রঙের পালে
বিদেশী কোন্ হাওয়া-কুমার জড়িয়ে রঙের জালে।
চলছে তারা এ-ওর সাথে নানান কথা ক'য়ে—
গ্রাম্য কবির কাব্য যেন চলছে সাথে ব'য়ে।
শুন্‌তে তাহা হয়ত মিঠে, চুড়ির গীতির মত,
হয়ত তাহা অমনি রঙিন, রঙিন শাড়ি যত।
নদীর ঘাটে এসে তারা ঘট ভরিয়ে জলে
সারাটি গাঙ ওলট-পালট করে চানের ছলে।
কারো খোঁপার ফুল খসে যায়, কারো গলার মালা,
মাটির ঘড়া জড়িয়ে বুকে ভাসে বা কেউ বালা।
আলতা-রাঙা চরণখানি ঘসে বা কেউ তীরে,
কেউ বা গায়ে হলুদ-বাটা মাখায় ধীরে ধীরে।

'ভেসাল' মেলে জেলের ছেলে ঢুল্‌ছে ঘুমে, হায়!
জাল ছিঁড়ে তার মাছ পালাল, খেয়াল নাহি তায়।
ওই মেয়েদের জল-ভরণে যে ঢেউ জলে ভাঙে
হয়ত আরেক কূল ঘেঁসে তা কূলের বাঁধন মাঙে।
হয়ত ওদের রঙিন পায়ের আলতা-গোলা জল
কখন কখন এপার কারো মন করে চঞ্চল।
হয়ত কেহ চলতে পথে ওদের নয়ন হ'তে
বিনা-তারের তার পেয়ে যায় অমনি কোন মতে।
এই ঘাটেতে নিতুই ওরা জলের খেলা সেরে'
ভরা কলস 'কাখে' নিয়ে ঘরের পানে ফেরে।
পথের পরে রাঙা পায়ের আখর এঁকে যায়,
আঁচল-ভেজা জলের ধারা ছিটায় তারি গায়!
তারি শীতল পরশ পেয়ে মাঠের ধুলো বুঝি
রাঙা পায়ের ঘুম্‌লি স্বপন দেখছে নয়ন বুঁজি।

এই ঘাটেরি একটি ধারে কুমার-গাঙের কূলে
কদম্ব গাছ এলিয়ে শাখা দুল্‌ছে ফুলে ফুলে।
পাতায় পাতায় বুলিয়ে যেন সবুজ রঙের জাল
কোন্ বাতাসে বাঁধবে বলে বাড়িয়ে আছে ডাল।
তাহার ফাঁকে যায় যে দেখা খণ্ড-নীলের মায়া,
সেখান দিয়ে টুক্‌রো রোদের ঝরে সোনার কায়া।
বাতাস দোলায় গাছে শাখা, তাহার সুরে সুরে
ছোট ছোট রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে।
এই গাছেরি হেলান দিয়ে বিগান গাঁয়ের ছেলে
উদাসী তার বাঁশির সুরে বুকখানি দেয় মেলে।
গাঁয় মেয়েরা চলতে ঘরে ভেবে না কূল পায়,
জল ভরিতে কার কথা ও বাঁশির সুরে গায়।
কেউ বা ভাবে সুরখানি তার বাঁধবে বাহুর ডোরে,
কেউ বা ভাবে গানখানিয়ে চুমোয় দেবে ভ'রে।

কারো কারো হয় বা মনে, তাহার রাঙা মুখে
যে রঙ ঝরে ওই বাঁশি তা গাইছে মন-সুখে।
রাখাল সে ত বাঁশিই বাজায় আপন মনে একা,
ওই মেয়েদের বুকে সে সুর আঁকে নানান রেখা।
কোন্ নারী সে ভাগ্যবতী যাহার কথা ল'য়ে
ওই বিদেশীর বাঁশি আজি ফিরছে ভুবন ব'য়ে॥

—ধান-খেত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমি রজনীতে জানালার ধারে ফুটেছে আমার হেনা,
ওর পানে চেয়ে মনে পড়ে সেই বলেছিলে,—ভুলিবে না!
আছ কি নিদ্রাগত,
চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে কি আমার স্নেহের মত?
সফেনপুঞ্জা তটিনীর নীরে তুমি নবেন্দুরেখা,
দুখ-জাগানিয়া কোন্ বাঁশরীর অস্ফুট গীতলেখা!
শেষবিস্তারপাণ্ডুর তব স্তনকোরকের জ্যোতি,—
শিথিল শিথানে কারে মোহিয়াছো—ব্রীড়ায় বেপথুমতী!
গোপন মিলন সুখে
মৃণালমৃদুল দুটি বাহু দিয়ে জড়ায়েছো কা'রে বুকে!
পল্লবরাগতাম্র অধরে কার তরে এত মধু,
কা'র করে লীলাকমল তুমি গো, কার তুমি লীলাবধূ!
তনুতট উচ্ছল
শিশিরশীতল কপোলে পড়েছে বিচূর্ণকুন্তল!
হেথায় আঁধার নেমেছে নিবিড় কাকপক্ষের মত,
মনে আনে কা'র কালো দুটি আঁখি মমতায় সন্নত!
ফুটেছে ব্যথার হেনা,—
কেন ঘুমাইলে,—আমার মতন কেন তা'রে চিনিলে না?

—অমাবস্যা

রাধারাণী দেবী

লীলাকমল

বক্ষে উতল ঘন মধুরস, মর্ম সুরভি-ভোর—
প্রভাত-রবির প্রেমরঞ্জনে পরানে রঙের ঘোর।
মেলিয়াছি আঁখি, আমি জলবালা, সূর্য-স্বয়ম্বরা,
উর্ধ্বে পসারি মৃণাল-গ্রীবাটি,
হেরিতে আসিনু তরুণ-দিবাটি,
হেরিতে আসিনু সোনার কিরণে কনকোজ্জ্বল-ধরা।

জ্যোতির্ময়ের রূপ-বারতায় ধ্বনিত পূবের পুর,
নিতল জলের তল ভেদি' বুকে বেজেছে যে সেই সুর!
কুঞ্জ-কাননে ফুল-মালঞ্চে আমি লই নাই ঠাঁই,
পঙ্ক-আসনে সাধন নিত্য,
ইষ্ট আমার নব আদিত্য,
সলিল-শয়নে সমাধি হ'লেও শিশির সহে না তাই।

সপ্ত বরণে বরি' নিতে আজ গুণ্ঠন দিছি খুলি',
লীলায়িত কার সুন্দর তনু শূন্যে ধরেছি তুলি'।
মানব মুগ্ধ কমলগন্ধে,
মধুপ মত্ত মধুর ছন্দে,
আমি ভাবি মোর আলোর দেবতা কখন আসিবে বুকে,
তনু-মন-ধন অর্পিয়া তাঁরে, ঝরিব সকৌতুকে।

উৎসুক মোর উন্মুখ মুখ সুখে অবনত হবে,
প্রিয়-বিরহের ব্যাকুল-বেলায় নামিবে সন্ধ্যা যবে।
আনত-বৃন্ত এ আননে মম
বিদায়-চুমাটি দিবে প্রিয়তম,
অস্তরাগের অনুরাগে মোর অঙ্গ পড়িবে ঢলি'—
সার্থক হবে লীলাকমলের অন্তিম-অঞ্জলি॥

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কারায় শরৎ

আজ তোমাদের চারিপাশে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে
শরৎরবির সোনার আলো ঝরিছে ;
আজ প্রভাতে এতক্ষণে রোদ পড়েছে কাশের বনে,
শিউলিতলা সরস ফুলে ভরিছে ;

মেঘলা দিনের ওড়না ফেলি চাইছে ভুবন নয়ন মেলি,
রাঙা মাটি রঙীন আলোয় বাঁচিল ;
আমার শুধু চোখের কাছে আজকে ক'টা পাঁচিল আছে,
সোনার আলোয় ভরেছে সেই পাঁচিলও।

আশ্বিনে এই নূতন রোদে মাত্‌ল যে মন কোন্ আমোদে—
কোন্ প্রাণে আজ উঠল যে গান গাহি রে !
কেমন ক'রে বুঝাই প্রাতে পেলাম দু-হাত আঙিনাতে
মাঠ ভ'রে যা' পাওনি তুমি বাহিরে !

আজকে আমার সকলদিকে ঘিরেছে এই ধরণীকে
শ্যাওলাধরা পাঁচিল যত পুরানো ;
কেউ বা কালো কেউ বা মেটে, লম্বা বা কেউ, কেউ বা বেঁটে,
তাই দেখে' আজ যায় না নয়ন ঘুরানো !

এই পাঁচিলে এমনি ভাবে কতই গেছে কতই যাবে
শরৎরবি সোনার তুলি বুলায়ে ;
দূরের স্বপন পাখায় মাখি বস্‌ল হেথায় কতই পাখী,
বস্‌বে কতই বন্দী হৃদয় ভুলায়ে ;

এই পাঁচিলে কতই রেখায় বাদল-বারির হাতের লেখায়
কতই ছবি—কতই আছে রচনা ;
কচিৎ কভু হেথা হোথা বুঝেছিলাম তাদের কথা,—
তাদের প্রসাদ,—তাদের প্রাণের যাচনা।

আজকে তাদের প্রলাপরাশি বক্ষে আমার ঢুকল আসি
দস্যুসম সহসা দ্বার ভাঙিয়া।
আজ পূজা চায় সবাই যেন! শেওলা জলে পান্না হেন;
রাঙা ইট আজ উঠল দ্বিগুণ রাঙিয়া।

এই উঠানে এ জেলখানায় দেখছি আলো দিব্যি মানায়!
দুদিন আগে এ কথা কই ভাবি নি!
সকল দীনের দৈন্য নাশি শরৎ এল মধুর হাসি,
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী।

ইটের পরে ইটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমনি করেই মানুষকে ভাই শুকায়ে;
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তা'রে এমনি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙীন চিঠি লুকায়ে!

সহসা সেই শুভক্ষণে সব কিছু হয় মধুর মনে,
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে;
কঠিন সে হয় কোমল বড় পুরানো হয় নূতনতর,
রঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে ফ্যাকাসে।

আশ্বিনে সেই দিন এসেছে আলোর নদীর কূল ভেসেছে।
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা?
নিখিলের রং ছড়িয়ে যাবে, তোমরা কি তার সবটা পাবে?
হেথায় আমি একটুও কি পাব না?

বাইরে আলো দুষ্ট ছেলে মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,—
ধরার নয়ন ভরে স্বপন আবেশে;
হেথায় আলো লক্ষ্মী মেয়ে করুণ চোখে রয় যে চেয়ে
যায় কি পারা থাকতে ভালো না বেসে॥

—মুক্তিপথে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পথ

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে ;—
কেরমানের নোনা মরুর উপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদকৃশান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।
শ্রান্ত উটের পায়ে-পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,
চমরীর খুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা !

বাদকৃশানের চুনি আর খোটানের নীলার নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,
ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,
লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথ—
লাদকের কস্তুরীর গন্ধ যেখানে আজো আছে লেগে পুরানো স্মৃতির মতো।

সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি ;—
আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল-করা
দু-ধারের দীর্ঘ দেওয়ালের
শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায়-ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মতো ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো।
ভাঙা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া
ঝিলমিল-দেওয়া বাতায়নের নিচে থমকে-থামা,
ধূপের গন্ধে সুরভি ; দেবায়তনের দ্বারে ভূমিষ্ঠ-হওয়া পথ।

ভয়ে ভয়ে স্মরণ করি সে-পথ ;—
ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চরণের 'ঠৌরি' ;—
যুগযুগান্ত ধ'রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম পায়ে মাড়ানো।
যে-পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়চকিত মৃগ ;
অন্ধকারে শাণিত চোখ চমকায়।

যে-পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্বার তাতার বাহিনীর অশ্বখুর-বিক্ষত ;
করোটি-কঠিন যে-পথে
তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।

স্বপ্ন দেখি সে-পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি ॥

ছাদে যেওনাক

ছাদে যেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন !
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

তার চেয়ে এস বসি দুজনাতে, জানালা পাশে,
ওধারের ছোট গলিটিরে দেখি,—গ্যাসের আলো,
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে,
শুনি নগরের মৃদু গুঞ্জন, লাগিবে ভালো।

তার পরে চাই তোমার নয়নে, তুমিও চেও ;
—ঘরের বাতিটি জ্বালা হয় নাই, আধো আঁধার।
যা দেখিব তার বেশি যেন সেথা কি রয়েছেও,
মনে হবে যেন চোখের সাগর, সেও অপার।

যদি খুশি হয়, কাছে সরে এসো, বাড়ায়ে হাত
হাতটি ধরিও, আর মাথাটিরে হেলায়ে দিও;
সুবাসিত চুল, সেই হবে মোর গহন রাত,
কপালের টিপে পাব প্রিয়তম তারকাটিও।

নিকট পৃথিবী ঘিরে থাক, আর যা কিছু চেনা,
তাই দিয়ে রাখি শূন্য আকাশ আড়াল করি;
মুহূর্তগুলি মন্থন করি উঠে যে ফেনা
তাহারি নেশায় সব সংশয় রব পাশরি'।

সীমাহীন ধাধা ধূ-ধূ করে সখী উপরে নীচে,
রচ নীরন্ধ্র গাঢ় চেতনার ক্ষণিক নীড়;
স্বপ্নহরণ মহাকাশ হোথা নিঃশ্বসিছে,
এই ক্ষণ-সুখ-প্রত্যয় তাই হোক নিবিড়।

ছাদে যেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন।
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন॥

—সম্রাট

হেমচন্দ্র বাগচী

বন্দী কোকিল

এ মোর মনের আঁধার কোটরে কেন না জানি
বন্দী কোকিলে বেঁধেছে বাসা!
কোথা' আলো নাই, ফুল নাই কোথা', বিলীন বাণী—
অধীর তিমির সর্বনাশা!
ঈশানের কালো মেঘে মেঘে ছায় আকাশ-তল,
ধূলি-ঝঞ্ঝায় ঘেরে চারিধার; কোথায় জল?

পিঞ্জরে কাঁপে সোনার কোকিল—অসাবধানী,
লাল দু'টি ঠোঁটে ফোটে না ভাষা—
কতকাল হ'ল আঁধার কোটরে কেন না জানি
বন্দী কোকিলে বেঁধেছে বাসা!

হোথা ঝাউবনে সন্ধ্যা নামিছে নদীর তীরে—
সাদা ভাঁট-ফুলে ভরিছে বন;
আধ-ফোটো-ফোটো মুকুলের দল তরুটি ঘিরে
তুলিছে গুমরি' ভোমর-মন!
সে জগৎ যেন চুপি চুপি আসে স্মরণ-পথে—
কত কথা বলে আপনা-আপনি আপনা হ'তে,
কণ্টক-ঘায় স'রে স'রে যায় আঁচল ছিঁড়ে,
তবু উঠে সুর-গুঞ্জরণ!
ওগো কতবার নামিল সন্ধ্যা নদীর তীরে,
কত ভাঁট-ফুলে ভরিল বন!

আজ এ নগর-পাষাণে হেরি যে রৌদ্ররাজ—
সে কি গো আমার মনের দাহ?
দূর অলিন্দ-বন্ধ-কারায় হায় নিলাজ
বন্দী কোকিল কি গান গাহ'?
হেথা আনো কি গো ভীরু পল্লব-মর্মরিত?
বনের বেণুর আনো কি গো সুর-সঞ্চরিত?
অশথ-জামের চিকন-পাতায় পরো কি সাজ—
আলো ও ছায়ার সে অবগাহ?
আজি রৌদ্রের রুদ্র-লীলায় হে সুর-রাজ
ছড়াও কি শুধু মনের দাহ?

তোমারি মতন আমার এ-মনে কাঁদিছে কে সে—
বাঁধন-নেশায় লাল সে আঁখি!
গোধূলি-প্রভাত—ফিরে যায় রাত হেথায় এসে
অঘোর এ ঘোর টুটিবে না কি?

যদি নাহি টুটে, তবে তোল' সুর ঊর্দ্ধ গ্রামে,
উঁচু-নীচু পথে চলো মনোরথ ডাহিনে বামে—
সবার উপরে ফেল' আলো-সুর মধুর হেসে—
কোনোখানে কিছু রেখো না বাকি,
সোনার কোকিল, তোমারি মতন কাঁদিছে কে সে—
বাঁধন-নেশায় লাল সে আঁখি!

হায়, গোঠে গোঠে ফিরে এলো ধেনু বিকালবেলা—
কুলায়ে তোমার ফিরিবে কবে?
শিকল পাহারা—ঝটপট ডানা, ধূলির মেলা—
ভুলায়ে তোমারে ল'বে কি নভে?
সবুজ পাতার আড়ালে মধুর লাল সে ফল—
গোয়ালের ধোঁয়া, নিম-পল্লব, ছায়া শীতল,
নিথর দীঘির উপরে পাখীর কি কল-খেলা—
তা'রা কি তোমার পরশ লভে?
ঘন শ্যাম বনে ফিরে এলো পাখী বিকাল-বেলা—
কুলায়ে তোমার ফিরিবে কবে?

ওগো দিশাহারা বন্দী রাগিণী, তোমারে ল'য়ে
পাঠাইনু আজি সীমার শেষে;
দিবস-নিশার হারা গীত-গান যেথায় ব'সে
কত প্রাণ চলে অনামা দেশে!
সেইখানে আজি হারাইতে চাই আপন হিয়া—
জানি না কোথায়, কতদূরে তুমি মিলিবে গিয়া!
শীতনিশাপার-প্রদোষ-তিমির-বিজনালয়ে
সুরের কুসুম চলিবে ভেসে—
ওগো পথহারা বন্দী রাগিণী, তোমারে ল'য়ে
পাঠাইনু আজি সীমার শেষে॥

—তীর্থপথে

দাশশঙ্কর রায়

প্রণাম

যে নারী পূরায় বাঞ্ছা অন্তরযামিনী
তাহারে প্রণাম।
সে নয় বিভবলুব্ধা সামান্যা কামিনী
তাহারে প্রণাম।
ঊর্ধ্ব হতে বর্ষে সুখ কল্পতরু প্রায়
স্বর্গ হতে পারিজাত শিয়রে ঝরায়
আপনি লুকায়ে থাকে সলজ্জ দামিনী
তাহারে প্রণাম।
প্রণাম হাসিয়া লয় যে ঊর্ধ্বগামিনী
তাহারে প্রণাম।

সহস্র বর্ষের তপে সে ক্ষণিকপ্রভা
ক্ষণকাল উরে।
চঞ্চলা লক্ষ্মী সে আনে বৈকুণ্ঠের শোভা
প্রেমিকের পুরে।
দিয়ে যায় যুগান্তের প্রার্থিত দর্শন
নিঃস্বের করামলকে দুর্বহ কাঞ্চন
আপনারে দিয়ে যায় সুচির দুর্লভা
ক্ষণযুগ জুড়ে।
অসহ্য সৌভাগ্য দিলে অমর্ত্য বল্লভা
মনোবাঞ্ছা পুরে।
যে লক্ষ্মী কামনাযজ্ঞে সহিতগামিনী
তাহারে প্রণাম।
সে নয় প্রসাদভিক্ষু সামান্যা কামিনী
তাহারে প্রণাম।

নূতন তপস্যা দানি' সহস্র বর্ষের
সমাপন করি যায় ক্ষণিক হর্ষের
গুণ্ঠন টানিয়া দেয় নিষ্ঠুরা যামিনী
তাহারে প্রণাম।
কোথা সে লুকায়ে যায় ক্ষণসৌদামিনী
তাহারে প্রণাম॥

—নূতন রাধা

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কণ্ঠসূতা হোলো কি চঞ্চল

গৌরীশৃঙ্গ-শিরে হেরি শিশুসূর্য, উষা অনুরাগে
বিছায়ে দিল কি তার স্বচ্ছ শুভ্র পুষ্পিত অঞ্চল!
সাগরের স্বর শুনি অরণ্যের অভিসার জাগে,
কুরঙ্গীর নৃত্যরঙ্গে কণ্ঠসূতা হোলো কি চঞ্চল?
এ ধরণী চিরশ্যাম মানুষের অশ্রুজলে জানি,
জীবন-সমাধিক্ষেত্রে জন্মে প্রেম তৃণ সম জনারণ্য মাঝে,
সেই প্রেম রোমন্থন করে কত প্রাণী;
সে প্রেমের রসায়নে সঞ্জীবিত শস্যশীর্ষে স্বর্ণচ্ছটা রাজে।
অঙ্কুরের মাঝে সুপ্ত রহে যারা, কেন অসহায়!
কল্পনায় কামনায় ভাবগত মহাকেন্দ্র 'পরে
আশা-নৈরাশ্যের গান অন্তরের তন্ত্রী হতে ধায়,
মায়াজালে লীলায়িত সুরগুলি ঝরে ঝরে পড়ে।

আত্মিক লোকের যাত্রী আমারে যে ডাকে,
সুন্দর ভুবনে মোর রেখে যাবো মৃত্যুরেখাগুলি;
নীহারের মত অশ্রু ঝরিল কি পল্লবের ফাঁকে,
কাহিনী কালের নীড়ে স্মৃতিলোকে র'বে পুচ্ছ তুলি!

কালোত্তর ক্ষণে তার কাকলী কূজন
লোকোত্তর পান্থজনে করিবে কি কভু আকর্ষণ !
জীবনের পরিক্রমা প্রবাসীর মত,
দুঃখে সুখে নির্যাতনে চিত্ত যেন ফলভারে-নুয়ে-পড়া পাদপের সম,
পর্ণগৃহে দৈন্য গ্লানি বক্ষে ধরি উপেক্ষিত কাব্য লয়ে দিন যায় মম ;
সত্তা মোর নহে বিশ্বগত !

অসংখ্য বৈচিত্র্য মাঝে সংখ্যাতীত শতাব্দীর বিস্মৃতির স্তূপে
চিরদিবসের বাণী সমুজ্জ্বল রয় ।
ঐতিহ্যের পুষ্প গন্ধ ধূপে
মহাকাল-অর্চনায় ধ্যানমন্ত্রে এ ধরণী ঐক্যধ্বনিময় ।
আমার নিখিলে আজ স্মারক-চিহ্নিত হয়ে প্রেমে জ্বলে তব অঙ্গুরীয়
তোমার নিখিলে মোর যৌবনের গানখানি সমাদরে কণ্ঠে তুলে নিও ॥

—দীপায়ন

কানাই সামন্ত

বাউল

ইচ্ছা করে, ছুটে যাই
কৈলাস মানসসরোবরের তীরে—
নগ্ন নিরাবরণ হয়ে দাঁড়াই অকলঙ্ক তুষারে ;
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
মেঘমন্দ্রগম্ভীর স্তবধ্বনি জাগাই সীমাশূন্য নির্জনতায় ।
ইচ্ছা করে, জীর্ণবস্ত্রের মতো এ দেহ ফেলে দিয়ে
ছুটে যাই বায়ুসমুদ্রের নীলোচ্ছল তরঙ্গতাড়নে
বায়ুশূন্য আকাশে

চন্দ্র-সূর্য-তারকার-ভিড়-করা নিরন্ত পথে
কায়াহীন মায়াহীন অক্লান্তগমনে—
জানিনে কোথায়, জানিনে কেন ॥

সুদূরপিপাসু আমি,
আমি চঞ্চল—
ক্ষুব্ধ অবরুদ্ধ ঘরে রব শ্রীহীন লোকালয়ে
আর কতকাল ?
হে চিরমৌন, বাজুক এবার
প্রাণের গভীরে তোমার গম্ভীর ডাক ॥

হল যে অনেকদিন।
সূর্য-চন্দ্র-তারার কিরণে ঝরেছে আকাশসম্ভব সুখ।
বিলুপ্তসীমা কিশোরস্বপ্নে জেগেছে মর্তঅমরাবতী।
পূর্ণিমার নিস্তব্ধ নিশীথে যুবক বন্ধু যেদিন
বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে জড়ালো বুকে—
হঠাৎ-জাগা ফুলের গন্ধে,
হঠাৎ-জাগা পাখীর ডাকে,
দিঘির জলে দ্বিতল-বারান্দায় আর নারিকেল-সুপারির বনে বনে
ছায়াবধূ জ্যোৎস্নার ঈষৎ ঝল্‌মলানিতে
হঠাৎ এই মাটির দেহ হয়ে উঠেছিল কুসুমকুঁড়ি ;
পুরেছিল মধুর মধুবিন্দুতে ;
নিমেষে ফুটে উঠেছিল ॥

তারপর অনেকদিন হল।
জানিনে প্রাণের নিভৃত কোনো ঘরে
পায়ের ছাপ হাতের ছাপ কারও মুছে গেল কিনা নিশ্চিহ্ন হয়ে-
ধূপের কুণ্ডলিত সুরভি ধূম জানিনে আজও জাগছে কি ॥

দিনের দিন
ধূলিধূসরিত জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যহীন, তবু
ধুলো তো ভালোবেসেছি ;
ধুলোর এই পথে সবাই মিলে চলেছি।
সকাল সন্ধ্যায় শুধু
শিশির-ভেজা আলে,
ভাঙা ঘাটের কোলটিতে,
একা বসে গান গেয়েছি আপন মনে।
সে গান শোনেনি কেউ—
সৌন্দর্যের প্রেমের বেদনার মৃদুগুঞ্জিত স্তুতি ॥

নিরবলম্ব হে মহেশ,
শূন্যের উদাস প্রান্তরে চিরদিনরাত চিরযুগ
জাগর-ধ্যানে-সমাসীন,
আজ মঞ্জুর করো আমার ছুটি।
বিনা সাধনায়, বিনা সংগ্রামে,
প্রাণের গানের শুধু অশেষ গুন্‌গুনানিতে
ক্লান্ত অবসন্ন আমি।
জেনেছি মানুষের কী গভীর ক্ষুধা,
কী গভীর খেদ ;
কী করুণ আশা
মুমূর্ষু মুখের হাসির মতো থাকে মর্মে লেগে !
সত্য ? সুখ ? ভালোবাসা ?
কোথা গো ?—কোথায় ?
ভক্ত আর জ্ঞানী যারা
বিদ্যুৎক্ষিপ্র বিহঙ্গের মতো
চিহ্নহীন পথে ধায় কে জানে কোথায়।
মূক প্রকৃতি, কথা কইতে জানে কি ?—
বাক্যহীন শুধু ইঙ্গিত ও ইশারা
মেলে রাখে জলে স্থলে, ফুলে পাতায়,

তারায় মেঘে, শৈলশিখরে, অরণ্যে
উর্ধ্বমুখ ডালপালার আঁকুবাঁকুতে ॥

আর তো ভালো লাগে না।
হে অলক্ষ্য, হে চিরমৌন,
তুমি কথা কও এবার প্রাণে ॥

ছুটে যাই কৈলাসে মানসসরোবরের তীরে ;
নগ্ন নিরাবরণ হয়ে দাঁড়াই অনন্ত তুষারে ;
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
তোমার স্তবমন্ত্রে জাগাই সুপ্ত দিক ;
জীর্ণ বস্ত্রের মতো এ দেহ ফেলে দিয়ে
নীলিমা হয়ে যাই নিঃসীম নীলিমাতে ॥
—চিত্রোৎপলা

নিরুপমা দেবী

কি নাম বলিব বঁধু ?
—আগাগোড়া মধু
অণু পরমাণু তার সিক্ত সুধারসে,
স্বরগের অমৃতের পবিত্র পরশে
উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত,
চির শুদ্ধব্রত
একনিষ্ঠ ভক্তসম
অপূর্ব সুন্দর নিরুপম
নবস্ফুট পদ্ম সুশোভন,
যে পূজারী এ পূজায়
দেবতা পূজিতে চায়

পূজারী দেবতা দুই ধন্য আজীবন !
বলিব কি ভালবাসা ?
বন্ধু, এ তো সে নামের যোগ্য নহে ভাষা !
তবে ভক্তি কি এ
প্রণত প্রাণের চির অনুরক্তি দিয়ে ?
শুধু এ তো নহে তাই,
কেমনে বুঝাই
আরো কি যে আছে তার মাঝে মিশে মিলে,
অনন্ত নিখিলে
উপমা সে পাওয়া ভার ।
তবে এ কি স্নেহ প্রীতি মহৎ উদার ?
হ'ল না হ'ল না, সবে
যারে, প্রিয়, বলে প্রেম এ কি তাই তবে ?
থাক্ থাক্ বঁধু,
ও যে বিষ, এ যে মধু, আগাগোড়া মধু !
ঊর্ধ্বে তুলে ধরা
বিশ্বহারা নিরজনে
শুধু মনে মনে
এ যে আপনার চিত্ত নিবেদন করা !
ভুলে যাওয়া সুখ দুখ,
জাগ্রত উন্মুখ
ভাল হওয়া, বন্ধু, ভাল চাওয়া ;
স্বার্থ বলি দিয়ে ফিরে স্বর্গসুখ পাওয়া !
যার কাছে তুচ্ছ ধন,
তুচ্ছ যশ, মান, খ্যাতি, সর্ব প্রলোভন,
যার কাছে দুঃখ চিরপ্রিয়,
আয়ু সে তো কোন্ ছার,
অর্ঘ্য দিতে যে পূজার
মৃত্যু সে যে, বন্ধু, চির-নিত্যবরণীয় ॥

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঘুম-নিঝুমি

নিশীথ রাতে যায় গো ডেকে বুনো হাঁসের দল,
হাওয়ায় পাখার শব্দ জাগে বালুতীরের তল।
নদীর বুকের অতল তলে
রহস্যেরই ধারা চলে,—
চপল ঢেউয়ে তারই গীতি গাইছে নদীজল,
বালু-ভুঁয়ে স্বপন-সুরে গাইছে কলকল্।

ছায়ায় মাখা বালুর কূলে বন-ঝাউয়ের ঝাড়,
মাঝে মাঝে দীর্ঘ জটিল অশথ-বটের সা'র।
ঘুমের ঘোরে কোন্ অজানা
পাখীরা সব ঝাড়ছে ডানা,
আবছায়াতে রহস্য-সুর জাগছে চারিধার।
বিজনকূলের মায়াবিনী বিছায় মায়া তার।

কত মায়া গোপন আছে বিজন বালুর বুকে,
তারই সুরে জাগছে সাড়া বুনো হাঁসের মুখে।
দাওয়ায় ভাসে তারই আভাস,
মৃদুল সুরে চম্‌কে আকাশ,
নীরবতার বুক হতে তার স্বপন হাসে সুখে,
লক্ষ যুগের স্মরণ জাগে বালুতীরের বুকে।

পাতারা সব অন্ধকারে করছে কানাকানি,
সুপ্ত স্মৃতির কাহিনীটি বক্ষে ব'য়ে আনি'।
ঘুমের ঘোরে শিহরণে
কি সুর জাগায় বিজন বনে,

উদাস হাওয়া যায় মিলিয়ে কোন্ দূরে না-জানি
চমক লাগে হঠাৎ শুনে আবার মৃদু বাণী।

ইঙ্গিতে কি সুর জাগালো বুনো হাঁসের দল,
বিজন বুকের গোপন কথা কইলো তীরতল।
বন-ঝাউয়ের বুকের কথা
অশথ-ছায়ার নিবিড় ব্যথা
নিথর 'পরে পাখীর সুরে জাগলো কি আজ ? বল্।
তীরের বুকে ঢেউ ভেঙে কি কইলো নদীজল ?

নিশীথ রাতের বুকের তলের স্বপনটুকুর সুরে
তারারা সব কয় কি কথা সারা আকাশ জুড়ে ?
আচম্‌কা ডাক ডাকলো পাখী,
স্বপন দেখে জাগলো নাকি ?
উড়ো-পাখীর ডানার ধ্বনি মিলালো কোন্ দূরে !
বন-ঝাউয়ের বুকে বাতাস এলো আবার ঘুরে' ॥

—কুটীরের গান

হুমায়ুন কবীর

কিশোরী

হেরিনু দিনের শেষে—
গোধূলির সোনা পড়েছে আসিয়া
তোমার সোনার কেশে।
নাহি তব বেশ, নাহি কোন ভূষা,
কেবল নয়নে লাজারুণ ঊষা,

করুণ বাহুর আড়ালে লুকায়ে
তরুণ দেহের লাজ,
মনের বনের সোনার হরিণী
কিশোরী দাঁড়ালে আজ !

তখন ভুবনে আঁধার ঘনায়
দিবসের অবসান,
মন্দছন্দা আলোক বাজায়
রবির বিদায়-গান।
সন্ধ্যা-তপন গগন-কোণায়
তোমারে হেরিয়া ভোলে আপনায়।
স্তব্ধ মূরতি রহিল চাহিয়া
কিশোরী-দেহের পানে,
নিঃশেষে ঢালি দিল ভাণ্ডার
তব যৌতুক দানে।

আলোর কুমারী রয়েছ ফুটিয়া
রক্ত কমল সম,
কেমন করিয়া তোমারে লুকাবে
রজনী নিবিড়তম ?
তোমার পরশে নিশীথের কালো
টুটিয়া হাসিল গোধূলির আলো,
অপরূপ দেহ কিরণ-বসনে
ঘেরিয়া দাঁড়ালে তাই।
এত রূপ যার তার কি গো কভু
দেহের বসন চাই ?

তরুণ তনুর ললিত লীলায়
তরুণ মনের ছবি,

আলোক ছায়ায় রেখায় বরণে
বহে রূপ-জাহ্নবী।
স্বর্ণকেশর পড়ে আসি বুকে,
গোধূলি-দীপ্তি লাজস্মিত মুখে,
কম-কুণ্ঠায় সারা দেহখানি
প্রভাতকুসুম সম।
কিশোরী-মনের রূপের স্বপন
ফুটিল নয়নে মম॥

-সাথী

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

লিয়াখিয়া

[পুরী থেকে কোণার্ক-যাত্রার পথে নদীটি পার হতে হয়। নদী পেরিয়ে সুরু হয় দিকদিশাহীন বালুকাপ্রান্তর। নদীটির জোয়ারের কিছু ঠিক নেই। জোয়ার এলে যাত্রীকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু ভাটার সময় হেঁটে পার হওয়া যায়। কোন খেয়া নেই। প্রসিদ্ধি আছে যে মহাপ্রভু কোণার্ক থেকে ফেরার পথে এই নদীতীরে এসে একান্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। তখন এক বৃদ্ধা খই দিয়ে ওঁর ক্লান্তি দূর করেছিলেন। তাই এর নাম লিয়াখিয়া (খই-খাওয়া)।]

লিয়াখিয়া অপরূপ নদী।
দুধারে বালুর মেলা, দিশাহীন চর,
রবিখর দু'পহরে ঝলসে নয়ন আর জ্বলে মরুশিখা,
জ্যোছনায় মায়া নামে, চোখে নামে ঘুম,
চারিদিক হয়ে আসে নীরব নিঝুম।
খেয়ালি জোয়ার আসে, সোনালি জোয়ার,
লিয়াখিয়া বয়ে চলে খরতর বেগে।

লক্ষ আলোর কুচি ঢেউএ ঢেউএ ভেঙেচুরে যায়।
অপরূপ—অপরূপ লিয়াখিয়া, কাহারে সে খোঁজে ?

লিয়াখিয়া স্বপনের নদী
সেদিন দুপুরে
দুই তীরে ছলছল খেয়ালি জোয়ার এলো,
দুরন্ত জোয়ার !
দিশাহীন বালুচর—ছায়া পড়ে কার ?
পায়ে পায়ে বেজে ওঠে ধ্বনি,
কে আসে ? কে আসে ?
লিয়াখিয়া নদী দেখে সোনার স্বপন,
ছবি অভিনব,—
দেবতা দাঁড়াল আসি লিয়াখিয়া-তটে,
সোনার-বরন দেহ, ঢলঢল লাবনির ধারা—
সহসা বসিয়া পড়ে ক্ষুধিত, কাতর,
ভেঙে-পড়া অবসাদে চলে না চরণ।
কূলে কূলে লিয়াখিয়া উছসিয়া ওঠে।
অপরূপ—অপরূপ ! কাহারে সে খোঁজে ?

সুদূরে গ্রামের পথে একা পসারিনী
খইএর পসরা মাথে চলিয়াছে নারী।
নদীতটে ভেঙে-পড়া অপরূপ শোভা তাঁর দেখে আর দেখে।
তার পরে আসে ধীরে, বেদনায় আঁখি ছলছল।
সুতপা শবরী বুঝি ? দয়িত এসেছে তার !
জীবনের সাধনার ধন !
পাদমূলে দিল রাখি খইভরা ডালা,
যেন যূথী রাশি রাশি।

দেবতা তুলিয়া লয়—
নীরবে চাহিয়া থাকে সেবিকার পানে।

করুণার বারিধারা আঁখি হতে ঝরে আর ঝরে।
লিয়াখিয়া বয়ে চলে খরতর বেগে।
সোনার আলোক ঝলে ভরা বুকে তার,
খেয়ালি জোয়ার তার, সোনালি জোয়ার।

অতীতের যবনিকা সরে গেলে পরে
সেদিন স্বপনে, দেখিলাম লিয়াখিয়া।
লিয়াখিয়া অপরূপ নদী।
যাহারে সে খুঁজেছিল পেয়েছে কি তারে?

—কোণার্ক

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মায়া

তোমার দেহ উঠ্‌তি ধানের মঞ্জরী।
আঁটো গড়ন, নধর চিকণ, কচি কাঁপন শিষের
কেমন করে ধরি?

তোমার দেহ রেশ্‌মী সুতোর জাল।
কামনারই ঠাসবুননে ময়ূরকণ্ঠী চেলি,
পরবো কত কাল?

তোমার দেহ উল্কা-রাতের মেঘ।
আকাশ জুড়ে মরছে উড়ে, পুড়ছে পাথর ছাই,
হারিয়ে গেছে বেগ!

তোমার দেহ আরব রাতের দেশ।
স্তব্ধ শীতল সুপ্তি নিতল। সুর্মা-চোখের জাদু
স্বর্গলোকেই শেষ!

—সম্ভবা

অজিত কুমার দত্ত

মালতী ঘুমায়

বৈশাখী হাওয়ার বেগে তারাগুলি কাঁপিতেছে
ক্ষীণ-শিখা প্রদীপের মত ;
—এখন বাহিরে রাত কত ?
নিশীথের হাওয়া আজ আফিমের নেশার মতন,
(মালতীর চুলগুলি চোখের পলকে চুমো খায়),
বাতাসে আসিছে ভেসে দূর হতে অস্পষ্ট গুঞ্জন,
(ঘুম এসে নয়নে জড়ায়।)
পত্রের মর্মর আর শোনা যায় বাতাসের স্বর,
নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে ক্ষুদ্র তারা, ক্ষীণায়ু প্রহর।
(ঘুম কি ভাঙিয়া যাবে কপালে রাখিলে হিম হাত ?)
—এখন বাহিরে কত রাত ?

একরাশ কালোচুল উতরোল এ বাতাসে
একেবারে হল এলোমেলো ;
—এবার বৈশাখী ঝড় এলো !
কাঁপিছে দালান কোঠা সমুদ্রের আহাজের মত,
(বাতাস সরায়ে দিলো লঘু হাতে বুকের আঁচল)
এখনি ঝাপটে ছিঁড়ে' উড়িয়া পড়িবে তারা যত।
(শুভ্র বাহু, পাটল কপোল।)
বাতাসে আসিছে ভেসে জল-কণা ঘরের ভিতরে,
সমস্ত আকাশ এসে জানালার কাছে ভিড় করে।
(নেমেছে চুমার মত ঘুম ওর পলকের 'পর)
—এলো কাল-বৈশাখীর ঝড় !

ঘুমন্ত দৈত্যের পুরী অকালে জেগেছে আজ,
রক্ষা নাই, নাই আর গতি,
(জেগে যেন ওঠে না মালতী !)

পাতালের যত নাগ আকাশে মেলিছে লক্ষ ফণা,
(সাবধানে সবগুলি জানালা দিয়েছি বন্ধ ক'রে)
এ কী হুলুস্থুল কাণ্ড! আকাশে যে গ্রহ রহিলো না!
(আমি আছি বসিয়া শিয়রে।)
লক্ষ দৈত্য ব্রহ্মাণ্ডেরে ছিঁড়িয়া ফেলিছে কুটি কুটি,
তুলিয়া ধরেছে তা'রা বিদ্যুতের মশাল-দেউটি;
আমি জানি, কা'র খোঁজে নাগদৈত্য ছুটিতেছে রাগে
(ভয়, যেন মালতী না জাগে।)

ওই শোনো দুড় দুড় লক্ষকোটি নাগদৈত্য
ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইছে ত্রাসে,
—মত্ত ঝড় শ্রান্ত হয়ে আসে।
শাখার উন্মাদনৃত্য ধীরে ধীরে হয়েছে মন্থর,
(বিদ্যুৎ গিয়েছে ছুঁয়ে মালতীরে কম্পিত চুমায়)
ঝাপটে ঝরিছে পাতা, স্বচ্ছ হয়ে আসে দিগন্তর।
(অপরূপ! মালতী ঘুমায়।)
শঙ্কিত ডানার নীচে পৃথিবীরে লুকাইয়া কোলে
আশঙ্কায় কাঁপে রাত্রি, দুটি তারা ভয়ে আঁখি খোলে।
(স্বপ্নে উঠিয়াছে কেঁপে মালতীর আরক্ত অধর)
—শ্রান্ত হয়ে এলো মত্ত ঝড়।

মেঘমুক্ত স্বচ্ছাকাশে তারাগুলি ফুটিতেছে
শুভ্রদল শেফালীর মত;
—এখন বাহিরে রাত কত?
দেবতা নিক্ষেপি' বজ্র তাড়ায়েছে অমঙ্গল যত,
(পৃথিবী হয়েছে হিম মালতীর ঘুমের লাগিয়া।)
এলায়ে পড়েছে রাত্রি নিদ্রাক্লান্তা মালতীর মত,
(আমি আজ থাকিবো জাগিয়া।)

ঘুমায় দূরের বন, ঘুমে ঝরে কুসুমের জল,
ঘুমায় পাথার-পুরী, ঘুমাইছে ক্লান্ত দৈত্যদল।
(জাগিয়া উঠিবে না তো ধরি যদি ওর দুটি হাত ?)
—এখন বাহিরে কত রাত ?

—কুসুমের মাস

ন খলু ন খলু বাণঃ

সংহত করো, সংহত করো অয়ি,
যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর,
এ নহে তন্দ্রা-অরণ্য-ছায়াচারী
ত্রস্ত হরিণ ; সংহরো তব শর।
তীক্ষ্ণ সায়ক দীপ্ত এ-দিবালোকে
ভ্রষ্টলক্ষ্য কোনোমতে হয় পাছে,
শক্তি তোমার সংহত করো অয়ি,
মৃগয়ারো তরে ভিন্ন সে ঋতু আছে।

গর্বিতা অয়ি বলয়-শৃঙ্খলিতা,
মুহূর্ত ভোলো বন্ধন-কৌশল,
চোখে থাক মোহ, হে মোহ-দুর্বিনীতা
বহুছলময়ী, আঁখি হোক ছল-ছল।
চিত্ত আমার স্তব্ধ সরসী-সম,
শুধু ছায়াখানি বক্ষে রাখিব এঁকে,
সুকঠিন মম মর্মের দর্পণে
সায়ক তোমার মিথ্যাই যাবে বেঁকে।

জানিয়ো কন্যা, আলেখ্য নাহি রয়
সরোবর-বুকে নিত্য অনশ্বর,
দর্পণ 'পরে বহু ছায়া সঞ্চরে—
অভিমান নাহি সাজে দর্পণ 'পর।

বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে বাঁধিতে পারে ?
বিদ্যুৎ-গতি শাসনে বাঁধিবে কে সে ?
দৃষ্টি-মোহন নভ-চারী উল্কারে
কে বাঁধিবে বুকে তপ্ত ভ্রমণ শেষে ?

দূরবর্তিনী, তোমার আমার মাঝে
উদাসীনতার স্ফটিক-প্রাচীর গাঁথা,
দর্শন চাহি, স্পর্শন চাহি না যে
পিপাসু নয়ন, ক্লান্ত চোখের পাতা।
ওগো গর্বিতা, সংহরো সংহরো,
এ নহেকো মৃগ ত্রস্ত ও চঞ্চল,
অস্ত্র তোমার যত্নে রক্ষা করো,
শূন্য গগনে বাণ হানি' কিবা ফল !

-পাতালকন্যা

শিবরাম চক্রবর্তী

সুন্দর

ঘাতককেও অপেক্ষা করতে হয়
বধ্যের জন্য ওৎ পেতে গোপনে।
সূর্যকেও অপেক্ষা করতে হয়
রাত্রি-প্রভাতের প্রত্যাশায়।
সত্যও অপেক্ষা ক'রে থাকে
আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজে'।
প্রেম জেগে থাকে অনির্দিষ্টকাল
শুভদৃষ্টির ভরসা নিয়ে।

মৃত্যুও অপেক্ষা করে দিন গুনে'।
এমন কি, তুমি— তোমাকেও প্রতীক্ষা করতে হয়

অনন্তকাল ধ'রে—
আমার উন্মুখ হওয়ার মুখ চেয়ে।
ত্রিভুবনে কেবল একজন অপেক্ষা করে না—
সব সময়েই তার সংক্রমণ—
প্রতিমুহূর্তেই তার বৈজয়ন্তী উড়ছে :
সে সুন্দর।
সে অপেক্ষা করে না তার প্রিয়পাত্রের জন্যও—
এমন কি, নিজের জন্যও নয়—
নিজেকে ছড়াতে ছড়াতে সে চ'লে যায়,
এমন কি, নিজেকে ছেড়ে ছেড়েই সে চলে—
প্রাণে বেঁচে থাকতেই চ'লে যায় সে—
নিজদেহের যৌবরাজ্য ত্যাগ ক'রেই।
এ-ই দেখি তার সংক্রান্তি, এ-ই সমাপ্তি, এ-ই তার দেহান্তর-লাভ,
কারো মুখাপেক্ষা তার নেই।
এমন কি, কারো চুম্বনের জন্যও নয়।

তুমি চিরন্তন।—
কিন্তু তোমার সুন্দর ক্ষণভঙ্গুর।—
(ও কি তোমারই সৌন্দর্য?)
সমস্ত ছাড়তে পারি তোমার জন্য,
কিন্তু সুন্দরের জন্য তোমাকেও বুঝি ছাড়া যায়॥

বুদ্ধদেব বসু

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণ-রেণু-সম বালুকণারাশি
লুটায় চরণ-প্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।

ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ—
প্রভাত-সূর্যের লজ্জা রঞ্জিত করিছে অরণ্যানী।
সদ্য-নিদ্রা-জাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল-'পরে
বহ্নি-শিখা করিছে অর্পণ :
কামনার বহ্নি সে যে, স্বপনের সলজ্জ বিকাশ।
গোলাপের বর্ণে-বর্ণে স্বপ্ন-সুধা মাখা,
আরক্তিম কামনায় আঁকা।
আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে।
লক্ষ-লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি' দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থযাত্রীদলে
সহসা-বন্যায়।
নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদ্‌গারিছে বিষ,
তরঙ্গ-মথিত ফেনা রেখে যায় সৈকত-শিয়রে।
গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল
নিত্য-নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন গভীর গর্ভে ;
অকল্যাণ বায়ু বহি' প্রাণের মন্দিরে
নির্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ ;
ম্লানমুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।
আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন।
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ।
সুদূর কুসুম-গন্ধে তার যাত্রা-বাঁশি বেজে ওঠে ;
দৈন্য-ভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।

—যৌবন আমার অভিশাপ।

ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হয়ে যেন লাগে;
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব-সম্পুটে।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ি আমি লিখন তাহার:
'হে তরুণ, দস্যু নহ, পশু নহ, নহ তুচ্ছ কীট—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'

শাপভ্রষ্ট দেব আমি!
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি' শূন্যতায় উড়ি' যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লবমর্মর
প্রেম-গুঞ্জনের মত কী অমৃত ঢালে মর্ম-মাঝে।
রবির গভীর স্নেহে, শিশিরের শীতল প্রণয়ে
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ-পবন তারে মৃদুহাস্যে আন্দোলিয়া যায়।
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হয়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ-তলে।
স্তব্ধচিত্তে চেয়ে থাকি; অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো
আনন্দের মন্দির-সোপানে।
সুধায় নির্মিত মোর দেহ-সৌধখানি,
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি' তারে আকাশের অকূল আলোকে

অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ !

অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু কোন্
স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে—
আজ তার নাহিকো আভাস ।
আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পথ-প্রান্তে পড়ে আছি
নীরব ব্যথায় শান্তমুখে
ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে ।
সেই মোর গোধূলির সুরভি আঁধারে
যার সাথে দেখা,
যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়-গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি' যায় হর্ষের বিজলী ;—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,
দেখিয়াছি দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে আপনার ছায়া,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ,
ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময় ;—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি ।
তখন বিষণ্ন বায়ু নিঃশ্বসি' কহিয়া গেছে কানে :
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'
নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কয়েছে যবে কথা
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ-সাথে মিশি' আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মতো—
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'

তাই আজ ভাবি মনে-মনে—
পঙ্কের-কলঙ্ক-বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।
শেফালি সৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান্ মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব-নব হয়েছে প্রকাশ।
বকুল-বীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।—
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি!

—বন্দীর বন্দনা

সুদূরিকা

চক্ষে যার বহ্নিরাগ, বক্ষে যার সুমধুর কুসুম-সুষমা,
অন্তরে লুকায়ে রেখো সংগোপনে সেই অন্তঃপুরচারিণীরে;
সৃষ্টির আনন্দ-মোহে রচিয়াছ অন্ধকারে নব তিলোত্তমা—
সূর্যের দুর্জয় দাহে এনো না টানিয়া তারে নির্লজ্জ বাহিরে।

থাক সে নিশীথরাত্রে পত্রের মর্মর-মাঝে চিরবিরহিণী,
সুদূরিকা হয়ে থাক্ আকাশের নীহারিকা উদার, উদাস,
প্রভাতের তারা হয়ে জলুক রূপের রেখা স্বপ্নের সঙ্গিনী,
সুরভির সুরা ঢালি' তুলুক মদির করি' উতল নিশ্বাস।

হারায়ে ফেলো না তারে বাহিরের হর্ম্যভরা হিরণ-আলোতে,
মিলায়ে যাবে সে, হায়, ছায়াসম, বাসনার প্রখর কিরণে;

ফেনিল মত্ততা যত সঞ্চরিছে বিষদগ্ধ নীল রক্তস্রোতে,
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে তার ভাসায়ে দিয়ো না তব সুন্দর স্বপনে।
লেলিহান লালসারে নিবাইয়ো অশ্রু আনি' তার আঁখি হতে,
জ্যৈষ্ঠের নিষ্ঠুর তপ ভাঙিয়ো তাহার স্নিগ্ধ ব্যথার বর্ষণে॥

—পৃথিবীর পথে

নিশিকান্ত

অগ্নিবাণ

অব্যর্থ শরের মত চলিয়াছি আমি অনুক্ষণ
আমার লক্ষ্যের পানে।
হে ধানুকী! আমি তব তীর;
তব স্থির চেতনার নিষ্পলক সন্ধানীদৃষ্টির
দিশায় চলেছি আমি পথে পথে করি' বিদীরণ
বাধাগুলি, উদ্ঘাটিয়া তোরণের মত। প্রিয়তম!
আমি তব প্রেম দিয়ে প্রজ্বলিত শিখার শায়ক,
চুম্বনবহ্নিতে মোর প্রতি বস্তু প্রত্যেক পলক
জ্ব'লে ওঠে; মোর স্পর্শতীক্ষ্ণতায় লভে অনুপম
অনুভূতি প্রতি প্রাণ, জীবনের প্রতি ধূলিকণা;
ধরার মৃন্ময়তার মাঝে আমি বহিয়া চলেছি
তোমার পাবক-বার্তা, ক্লান্তিহীন ঝঙ্কারে বলেছি
আলোর উৎসের বাণী; যে-উৎস তোমার অন্যমনা
নিশ্চল আনন্দ হতে মোর মাঝে লভিয়াছে গতি
উদয়-আদিত্য সম বিচ্ছুরিয়া তোমারি কিরণ;
যে কিরণ দীর্ণ করে শত উষা সন্ধ্যার তপন,
ভুবন প্লাবিয়া ঢালি' অন্তহীন জ্যোতির অক্ষতি
যে-আদিত্য চলিয়াছে তব মন্ত্র করিয়া মুদ্রিত
নিখিলগ্রন্থের বক্ষে উপলব্ধ স্বর্ণের অক্ষরে।
হে বিশ্বস্বপনী!

মোর স্বপ্নময় সত্তার অন্তরে
তোমার সৃষ্টির পাণি সারাবেলা করে উদ্ভাসিত
শাশ্বতলীলার স্বপ্ন। আমি তব চন্দ্রাঙ্কিত তরী,
স্পর্শে মোর কালের অসীমতার সিন্ধুরজনীর
অঙ্গের তরঙ্গগুলি উজ্জ্বল রজতকৌমুদীর
রূপ লভি' উদ্বেলিয়া উচ্ছলিয়া মোরে লয় বরি';
অনন্তের প্রস্ফুরণ মোর প্রতি মুহূর্তের মাঝে।
হে কালের অধীশ্বর!
আমি তব মানস-মরাল,
তোমার বিহঙ্গদূত, মোরে কি বাঁধিতে পারে কাল?
অন্তহীন গণ্ডি তার ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি লভিয়াছে
আমার পাখার ছন্দে, যে-পাখার প্রত্যেক কম্পন
কালহীন হৃদয়ের স্পন্দনের তালে তালে দুলি'
অনাদি উন্মগ্নতার বিনিস্তব্ধতায় আত্মভুলি'
আপনার প্রতি গতি, প্রতি ভঙ্গি, করে উৎসঞ্জন।
আমার বন্ধন, মুক্তি, জীবন, মরণ, কিছু নাই;
প্রিয়তম! আমি শুধু বহি' চলি তোমার লীলার
বিবর্তের ব্রহ্মপুত্র, জন্ম জন্ম ভেসেছে আমার
তব ছন্দে; তাহা জানি, এ-জীবনে যবে স্পর্শ পাই
তোমার অঙ্গুলি-তলে।

হে মোর প্রেমের সিন্ধু! তুমি
গভীর সুষুপ্তি নিয়ে ভেসে এলে আপন স্বপনে;
দাঁড়ালে বন্ধুর মত এ ধরার ধূলার অঙ্গনে,
হে অপার! মূর্ত হ'লে আপনার স্বপ্নবিন্দু চুমি'।
দেখ, আজ মোর স্রোতে যাহা পাই সব নিয়ে চলি
তোমার অতল গানে; হে প্রশান্ত অম্বুধিমানব!
মোর প্রতি রঙ্গে আজ বিভঙ্গিত তোমার উৎসব।
যে-উৎসবে এ-মর্ত্যের প্রতি ধূলি-কণা ওঠে জ্বলি'
অপূর্ব শিখার মত, জ্বলি ওঠে প্রত্যেক জীবন,

প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি ফুল ; প্রত্যেক রঞ্জনে
তোমার অনন্ত বিভা প্রস্ফুরায়, প্রত্যেক রতনে
একটি অচিন্ত্যমণি বিচ্ছুরায় আপন কিরণ।
প্রিয়তম !
আমি শুধু মুঞ্জরাই একটি গোলাপ
অযুত মঞ্জরী মাঝে, সে গোলাপে তোমার প্রাণের
অরুণ-শোণিতধারা মিশিয়াছে লক্ষ হৃদয়ের
রক্ত অনুরাগ সাথে ; এ-আমার প্রেমের প্রলাপ
বলে শুধু একবাণী।
হে ধানুকী ! আমি তব তীর,
জানি শুধু একলক্ষ্য ; দয়া নাই, নিষ্ঠুরতা নাই ;
অযুত পাখির প্রাণ জ্বেলে যাই, দীর্ণ ক'রে যাই ;
আমি জানি, তব তৃষ্ণা পান করে তোমারি রুধির ॥

—অলকানন্দা

ত্রিজন্ম

পশুজন্ম দেবে যদি, হে জননী ! তবে মোরে কর পশুরাজ
একচ্ছত্র অধিপতি—অরণ্য ভুবন 'পরে বরেণ্য সম্রাট,
হুঙ্কারে হুঙ্কারে মোর পলকে শাসিত হোক শ্বাপদ-সমাজ—
ধ্বনিতে স্পন্দিত হোক এ অনন্ত কান্তারের অন্তর-বিরাট।

তীক্ষ্ণবক্র নখ দাও, দাও মোরে খর-দন্ত বদন ভরিয়া,
বিপুল কেশর দাও, উজ্জ্বল চক্ষুর তারা, বিদ্যুতের গতি,
শার্দূল-বিজয়ী বীর্য এ-বিশাল বক্ষে মোর দাও সঞ্চরিয়া,
অব্যর্থ বজ্রের মত ধাবমান করো মোরে সন্ধানের প্রতি।

কেশরী-বাহিনী মাত ! আজি এসো, আমি হবো তোমারি বাহন,
পশু যদি করিয়াছ, তবে মোর পশুশক্তি চরণে তোমার
আনত করিয়া রাখো—রাখো মোর জীবনের শান্ত নিবেদন ;
জগৎ-ধারিণী মাতা, শোনো, জগতের বক্ষে তোমার পূজার

শঙ্খ বাজে দিকে দিকে, আনন্দে ধ্বনিয়া ওঠে বিশ্বের প্রাঙ্গণ···
জগৎ ধারণ করো, আমি করি জগদ্ধাত্রী-দেবীরে ধারণ।

অসুর-যোনিতে যদি জন্ম দেবে, করো বরদান—
মাগো, আমি যেন হই বীর্য-বলে ত্রিভুবন-জয়ী,
সুরেন্দ্রের সিংহাসন মোর করে হোক কম্পমান,
চলুক পশ্চাতে মোর হত-মান নত-শির বহি',
বন্দী দেব-সেনাপতি ;
সূর্য-চন্দ্র নিত্য আবর্তিত
অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে মোর ক্রীতদাস ভৃত্যের মতন,—
ত্রিকাল ত্রিলোক ভরি' মোর রাজ্য হোক প্রতিষ্ঠিত ;
আমার শাসন-বশে পদ্মযোনি-ব্রহ্মার আসন
শঙ্কায় উঠুক দুলি', বিষ্ণুনাভি-মৃণালের পরে ;
বিষ্ণু-তন্দ্রা টুটে যাক, ক্ষুব্ধ হোক পয়োধি-প্রলয় ;
সৃষ্টিমূল শিহরাক সে প্রচণ্ড আকর্ষণ-ভরে,
মহেশের যোগভঙ্গ হোক···
হোক রুদ্র-অভ্যুদয়—
তোমার শক্তির মাগো,—মুক্তি দাও মুক্ত-খড়্গাঘাতে
আমার বিদ্রোহী সত্তা লয় হোক তোমার সত্তাতে।

মানব-জগতে যদি জন্ম লভি মাগো,
মোরে করো অসহায় শিশুর মতন,
স্নেহের অঞ্চলে তব মোরে ঘিরি' রাখো,
দাও মোর সর্ব অঙ্গে মঙ্গল-চুম্বন।

তোমার পন্থায় মোরে চলিতে শিখাও,
তোমার মুখের বাণী শিখাও বলিতে ;
তোমার লিখনে মোর অদৃষ্ট লিখাও,
শিখাও তোমার শঙ্খ ধ্বনিয়া তুলিতে।

ধ্যান মোর জ্ঞান মোর—গৌরব-গরিমা—
সে-যেন আশ্রয় লভে তোমারে জড়ায়ে,
রচিতে পারি গো যেন তোমারি প্রতিমা
তোমারি অঙ্গন হতে মৃত্তিকা কুড়ায়ে।

জীবনে নিবিড় করো তোমার বন্ধন,
মরণ তোমারই বুকে—লভুক শরণ॥

—অলকানন্দা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

আগন্তুক

পৃথিবীর রং মুছে ফেলে দেয় যারা
তারা তো আসেনি ফিরে,
তাদের আত্মা করে অপেক্ষা ভবিষ্যতের ভ্রূণে,
যায়নি পৃথিবী সময়ের সেই মহাসমুদ্র-তীরে।

তাদের নামের অক্ষয় অক্ষর
মাটিতে রয়েছে লেখা
যাদের জন্য অরণ্য দূরে স'রে করেছিল ঠাঁই,
পৃথিবীতে ছিল যাদের দেবতা আর তরবারি-রেখা।

আবার যাদের তীক্ষ্ণ অশ্ব-খুরে
গোবির গেরুয়া ধূলি
ভূগোলের সীমা ভেঙে যাবে মিশে হিস্পানী উপকূলে,
আসছে কি ভেসে মহাসমুদ্রে তাদের স্বপ্নগুলি ?

লেগেছিল কোন্ জাহাজে অজানা হাওয়া
দূর দিগন্ত হতে
মিশর মিশেছে 'মায়া'র মাটিতে নাইলের নীল ঢেউএ
সেই নাবিকেরা হারালো কি পথ দুঃসময়ের স্রোতে।

পৃথিবীর এই ভাঙন দেবে যে জোড়া
তারা তো আসে নি ফিরে,
যায় নাই মুছে তাদের তৃষ্ণা দুরন্ত উৎসাহ,
করে অপেক্ষা তারা সময়ের মহাসমুদ্র-তীরে

কাজী কাদের নওয়াজ

হারানো টুপি

টুপি আমার হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে ভাই রে,
বিহনে তার এই জীবনে
কতই ব্যথা পাই রে।
হাসবে লোকে শুনলে পরে
হারাল সে কেমন ক'রে,
কেমন ক'রে বৈশাখী ঝড়
উড়িয়ে দিল মোর সে টুপি,
বুঝেছি হায় টুপির লোভে
দেবতাদেরই এ কারচুপি।

২

থাকত টুপি দুপুর রোদে
ছায়ার মতোই মাথায় মম,
কখনো বা বাতাস পেতাম
ঘুরিয়ে তারে পাখার সম!
বক্ষে তাহার নিতুই প্রাতে
ফুল রেখেছি আপন হাতে,
সে ছিল মোর ফুলদানি আর
ফুলের সাজি একসাথে হায়,
জানিনে আজ কোথায় গেছে
কোন্ দেশে সে কোন্ অলকায়

৩

হয়তো এখন পবনদেবের
মাথায় আছে সেই টুপি মোর,
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায়
আমার চোখে ঝরতেছে লোর !
ভুলতে নারি টুপির প্রীতি,
জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি,—
বিদেশ গেলে বালিশ হত
হায় সে টুপি মোর শিয়রে,
চলতে পথে সেলাম পেতাম
থাকলে টুপি মাথার 'পরে।

৪

তিনটি টাকায় কিনেছিলাম
'চাঁদনি' হতে সেই টুপিরে,
তিন শ টাকা দিবই আজি
পাই যদি ফের তারেই ফিরে'।
চার মিনিটে 'চসার' প'ড়ে
শেষ করেছি টুপির জোরে,—
পরীক্ষাতে প্রথম হতাম
থাকলে টুপি মাথার 'পরে ;
দুখের দিনের বন্ধু টুপি
কোথায় গেলি আজকে, ওরে !

আজিও হায় নিমন্ত্রণে
গেলে সভার মধ্যখানে,
সব ভুলে' যে প্রথম আমি
তাকাই লোকের মাথার পানে।
দেখি কেবল চুপি চুপি
কার শিরে রয় আমার টুপি,—

মিলে না খোঁজ, সভার থেকে
ফিরে আসি শুষ্ক মুখে ;
নূতন টুপি কিনব না, ভাই,
পণ করেছি মনের দুখে ॥

বিষ্ণু দে

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
কখনো বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
কখনো বা দেশান্তরে কখনো বা চোখোচোখি
কখনো বা ডাকে কানে কানে কাছাকাছি
নিশ্বাসের তাপে একান্ত আপন ছন্দময়
বুঝিবা অলক তার কাঁপে আমার কপালে
কখনো হাওয়ায় লাগে হাওয়া

তবু তাকে পাওয়া আজো হল না নিঃশেষ
বাহুর নাগালে নেই অস্পষ্ট অধরা
অথচ সূর্যের মতো সত্য মাটি যেন ফসলের কাছে
পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ অথচ
অতনু প্রবাহ তার
রক্তে তার পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে
স্বপ্নে তার হৃদয় সদাই শ্রাবণের তালদীঘি
উত্তরাধিকারে তার দীর্ঘ অঙ্গীকার প্রেরণা পৌরুষে

তবু তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধারণে জনতায় চকিতে নিবিড়ে
দুর্গতির ব্যাপ্ত দায়ভাগে নিশ্চিত আশ্বাসে
জনগণে জনসাধারণে দেশের মানুষে

যে যার আপন কাজে রচনায় রচনায়
মনে হয় দেখা বুঝি মেলে
সমুদ্রে সমুদ্রে দেখি আবেগকল্লোলে
এই বুঝি আবির্ভাব

সাগরউত্থিতা উল্লাসে উল্লাসে শপথে শপথে
দীপ্ত মিলিত ভাষায়
লবণাম্বুরাশিনিবদ্ধধারায় মেলে বনরাজিনীলা
সভায় মিছিলে তোমাদের আমাদের ভিড়ে
সমুদ্র সে সমুদ্রই নয় বুঝি আকস্মিক বান বুঝি
গান শুধু হঠাৎ জোয়ার
উল্লাস উদ্ভ্রান্ত মরু ঠেলাঠেলি অন্ধ অহঙ্কার
ক্ষমতার পাতাল সন্ধান প্রায় আত্মঅচেতন
পালায় সে মেঘে মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
মোহানার ভাঁটায় ভাঁটায়
আষাঢ়ের অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে
রেখে যায় ছায়া শুধু হাওয়া শুধু রেশ
আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায়

সেই ছায়া দিনরাত খুঁজে ফিরি সেই হাওয়া
রক্তে আঁকি সেই ছদ্মবেশ একান্ত আপন
তালীতমালের বনে মৃত্যুবাঁধা রাজপথে
তোমাদের আমাদের সামনে আড়ালে তাকে
বারবার আজো সারাক্ষণ
অস্পষ্ট আসন্ন তবু যেন বা সে
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ ॥

—নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

ভিলানেল্

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
সে কার হাওয়া বনের নীল ভাষা।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

আলোর ঝিকিমিকি তোমার কাল চুলে,
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে

পরশ মেলে মেলে তুমি যে ধরো খুলে,
হৃদয় সে উষায় থামায় যাওয়া-আসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

কে খোঁজে পথে আর কে ঘোরে পথ ভুলে,
অস্তগোধূলিকে কে সাধে দুর্বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে?

ঈশান-মেঘে আর ওঠে না দুলে দুলে
ত্বরিতে কাঁদা আর চকিতে মৃদুহাসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

সে তরু এ হৃদয়, তুমি যে—তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়ি রাতের রাঙা ফুলে।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে॥

—নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সরোবরে আমন্ত্রণ

ব'সো এই সরোবর-প্রান্তে,
হেথা মধুমালতীর গন্ধ!
এখানে নেইক কেউ জানতে,
সবারই ঘরের দ্বার বন্ধ!
এখন প্রথম প্রহরান্তে
আকাশে উঠেছে ক্ষীণ চন্দ্র!

দুধারে আঁধার লতা-গুল্ম
গড়েছে নিবিড় নীলকুঞ্জ—
ওখানে লুকিয়ে খেয়ে ফুল-মৌ
নাচছে মাতাল ঝিঁঝিপুঞ্জ!
তাদের নূপুর ঝুমঝুম্‌মো,
কানন-ছায়ায় বাজে—শুনছো?

আকাশে আধেক ক্ষীণ চন্দ্র,
বাতাস সুরভি রসে মগ্ন—
উদাস পাখীর গীতিছন্দ
বনের স্বপন করে ভগ্ন।
জ্যোৎস্না, কুহর, হাওয়া, গন্ধ…
এলো আজ অপরূপ লগ্ন!

ব্যাকুল বাতাস নিঃসঙ্গ
লুটায় তোমার কেশগুচ্ছে,
নবনী-নরম ভীরু অঙ্গ,
চাঁদের কিরণ আধো ছুঁচ্ছে!
বেদনা, বিষাদ, আশাভঙ্গ…
এসো উঠে ওসবের উচ্চে!

আজ রাতে ঘুমে ভরা চক্ষে
এসো এই সরোবর-প্রান্তে,
নিতল ছায়ার হিমকক্ষে
নীরবে ব'সো গো উদ্‌ভ্রান্তে!
কামনা-কাঁপানো ভীরু বক্ষে…
মধুরাতে ছি-ছি নেই কানতে

অশোকবিজয় রাহা

ডিহাং নদীর বাঁকে

একটি রাতের একটু দেয়া নেয়া
এই তো হল শেষ,
আজ সকালে পাহাড়-দেশের মেয়ে,
ছাড়ব তোমার দেশ।
মনের মাঝে ঘরছাড়া কেউ আছে
চিনি নে কেউ তাকে,
যাবার বেলা বিদায় ব'লে যাব
ডিহাং নদীর বাঁকে।

দুয়ার ঠেলে একটুখানি হেসে
আবার ফিরে গেলে,
হঠাৎ তুমি এ কী নূতন বেশে
বাহির হয়ে এলে?
বুকে তোমার আগুন-রঙের শাড়ি
আগুন যে ধরালো,
উঠল জ্ব'লে পাহাড়তলীর বনে
বর্শা-ফলার আলো।

কোথায় ছিল সবুজ বনের তলে
ঐ আগুনের শিখা—
জিহ্বা মেলে হাজার বছর ধ'রে
তৃষার মরীচিকা ?
ঐ আগুনে পড়ছি তোমার মুখে
তারি অনল-গীতা,
জ্বলছে তোমার সর্বদেহে বুকে
সর্বনাশের চিতা ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

জামরুল

জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ-বেলা।
পীচে-বাঁধানো রাস্তা গ'লে মিশে যাচ্ছে
বিক্ষুব্ধ বাতাসের সঙ্গে।
মাঝে মাঝে জানালায় ধাক্কা দিয়ে যায়
প্রতপ্ত নগরীর দীর্ঘশ্বাস।

চা-পানের নিমন্ত্রণ।
সেটা অবশ্য সাধারণ নাম বা উপলক্ষ্য
যাকে ঘিরে লক্ষ্য হয়ে ওঠে পাঁচ রকমের আয়োজন-
ভূরি জলযোগ, সুশীতল পানীয়—
সুরম্য দর্শনীয় এবং সুমধুর শ্রবণীয়
এবং ইত্যাদি।

বিরাট বড়লোকের বাড়ি।
কক্ষের দরজা বন্ধ—
জানালাগুলো বন্ধ এবং ভিজে খস্‌খসে ঢাকা,

ভিতরে সাঁই সাঁই চলেছে পাখা
আর জলছে তুহিন-রাতের চাঁদের আলোর মত
ঈষৎ নীল কাচের অস্বচ্ছ আবরণ পরানো
বিজুলীর বাতি,
বাইরের জগৎটাকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখবার
নিখুঁত ব্যবস্থা।

খাবার এল অনেক—প্রাচুর্যে এবং প্রকারে,
নিমকি আর কচুরি আর শিঙাড়া—
ভাজি আর ডালনা আর চাটনি—
তারি পাশে একখানি চীনেমাটির থালায় সাজানো
আম আর লিচু—আর দুটো জামরুল।

বাজে রেডিও—বিলিতি ঢঙের রেকর্ড—
ওঠে হাসি-ঠাট্টার রোল,
তাও অবশ্য পরদা-মাফিক –
স্থান-কাল-পাত্রের বিচারে।

রুদ্ধ কক্ষ।
বায়ু ঢুকবার পথ নেই—আলো ঢুকবার রন্ধ্র নেই—
শব্দের প্রবেশও সবটা না হলেও অনেকটা নিষিদ্ধ।
সামনে চীনেমাটির সাদা বাসন—
তারই উপরে দু'টো জামরুল।

চেয়ে আছি ঐ দুটো জামরুলের দিকে,
সহসা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল মনের জানালা,—
চারিদিকে অনেক আলো, অনেক হাওয়া,
অনেক পথ-প্রান্তর-খোলা আকাশ।
সেই জানালার পথ দিয়ে
চলে গেলুম অনেক দূরের দেশে
অনেক বন-প্রান্তর পাহাড়-নদী মাঠঘাট অতিক্রম ক'রে।

যেখানে গিয়ে পৌছলুম
সেখানে পড়ে রয়েছে শ্যাওলা-ভরা একটি দীঘি
কর্মহীন নিরালা গ্রাম্য স্থবির।
তার সামনে—যতদূর চোখ যায়
ধূ ধূ করে দিগন্তজোড়া মাঠ ;
তার বুকে ঝিলমিল-করা রোদের তাপ
ঝলসে' ওঠে চাষীর ঘামে-ভেজা কালো দেহে—
আর সাদা বলদ দু'টোর পিছল গায়ে।

নির্জন দুপুর—স্তব্ধ দুপুর—
শ্যাওলাভরা দীঘির চারিকূল ঘেঁষে
বেড়ে উঠেছে পানিকচু আর হিঞ্চে—
আর পুরু হয়ে উঠেছে কলমীর দল—
যার উপরে বকগুলো আর বেলেহাঁসগুলো
ঘুরে বেড়ায় স্বেচ্ছাবিহারীর ছন্দে।
কালো দীঘির মাঝখানে যেটুকু রয়েছে ফাঁক
সেখানে ডুবছে আর খেলছে
পানকৌড়ির একটি ছোট্ট দল ;
মাছরাঙা হ্রস্বগ্রীবায় লাল চঞ্চু উর্ধ্ব ক'রে
ধ্যান ধ'রে আছে পূব-দক্ষিণ কোণের তেঁতুল গাছটায়।

এপারে একটি বকুল গাছ,
তার নীচে বাহুতে মাথা দিয়ে
অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে ভিন গাঁয়ের পথিক,
পাশে ঘুমিয়ে আছে বাঁশের লাঠির আগায় বাঁধা
ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের কি যেন একটা পুঁটুলি।
তারি পাশে একটা জামরুল গাছ—
তিনখানি ভাঁজ হয়ে দীঘির কূলে হেলে পড়েছে।
যে বাঁকা ডালখানি এগিয়ে গেছে দীঘির দিকে
তারই উপরে নিশ্চিন্ত নিরালায় রয়েছে ব'সে

একটি বার-তের বছরের গেঁয়ো জীব ;
কোঁচড়ভরা টস্‌টস্‌ করে জামরুল।
মাঝে মাঝে কোঁচড় খুলে খায়,
পা দোলায় আর গুন্‌গুন্‌ গান গায়—
আর তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে,
কালো দীঘির বুকে ডুব মেরেছে যে পানকৌড়ি
তার দিকে,
আর ঝুপ ক'রে ছোট একটা মাছ তুলে নিল যে মাছরাঙা
তারি দিকে।

চীনেমাটির বাসনে সাজানো জামরুলের দিকে তাকাই
আর আনমনে ভাবি—
এত রূপ এই জামরুলের !

দেবেশ দাশ

মেঘনার মাঝি

১

বিদায় মেঘনা মোর। মেঘ নামে ঘনায়ে আকাশে
পাগল পাথার পারে, হাহাকারে হিংসা গ'র্জে আসে
ধ্বংসের মৃত্যুর মত, বিদ্যুৎ অশনিপাত সনে
লুপ্ত করে শেষ আশা, সুপ্ত গ্রাম হতে নির্বাসনে
যাই চলে, বাহুবলে তোমার যে সিংহের কেশরে
স্নেহে দাঁড় চালায়েছি, মালা সম পরম নির্ভরে
সফেন তরঙ্গে রঙ্গে গলে পরি' দিয়েছি সাঁতার,
সে মালা, সে মোহঢালা কালো জলে জীবন জোয়ার,
তট-ভাঙা গাঢ় রাঙা খল খল দুর্নিবার হাসি,
আকুল দুকূল-ভরা মর্মরিত কাশ পুষ্পরাশি,

এক তীর ভেঙে গড়া নব নীড় অন্য তীর 'পরে,
হেমন্তসন্ধ্যায় হায় সারিগানে মুখরিত চরে :—
সবারে হৃদয় ভারে জানাইনু চরম বিদায় ;
শত স্মৃতি প্রাণ প্রীতি রেখে গেনু মোর মেঘনায়।

বিদায় মেঘনা মোর। বহু দূর প্রবাসের নীরে
মুক্তিস্নানে শক্তি শৌর্য সকলি কি দুর্ভাগ্যের ভীড়ে
বিসর্জন দিয়েছি অকালে? দৃপ্ত ভালে তোমার মৃত্তিকা
দুঃসাহসী অভিযানে সর্বনাশী গানে জয়টিকা
দিয়েছিল—তা কি আজ রিক্ত সাঁজে ক্ষুণ্ণ পরমাদ
মুছে যাবে কলকল গঙ্গাজলে? তব সিংহনাদ
ভৈরব ফেণীর তীরে সুগম্ভীরে পরম উল্লাসে
প্রতিধ্বনি জাগাইত বক্ষে মোর, চক্ষের আভাসে
ফুটিত প্রলয়চ্ছবি, লুপ্ত রবি, কালো চারি দিক
এলো চুলে পথ ভুলে উন্মাদিনী নীরব নির্ভীক
আমারে হেরিতে তুমি, ঘেরিতে উত্তাল বাহু দিয়ে।
সে আমি দিবস-যামী—নাহি ঝঞ্ঝা হৃদয় মাতিয়ে,
নাহি স্রোত হাতছানি দিতে—ব'সে নিস্তরঙ্গ তীরে
ভাবি দাক্ষিণাত্যে যাব পাড়ি দিতে কৃষ্ণা কাবেরীরে॥

অজিতকৃষ্ণ বসু

সূর্যমুখীর প্রতি

সূর্যমুখী, এইবার চন্দ্রমুখী হতে হবে তোর,
সূর্যের প্রহর অবসান।
যাহার লাগিয়া কত কবিতায় কাঁদিছে চকোর
তোর কাছে সে চাহিছে মান।

একবার উর্ধ্বে তাকা,
আকাশ নহে তো ফাঁকা,
আছে চন্দ্রতারা—
নীলাকাশ হয়নি সাহারা।
সূর্যের বাঁধানো রুপো চাঁদে এসে হল স্নিগ্ধ সোনা,
আমি কবি গাহি তার গান,
সূর্য-ধাঁধা শেষ হয়ে চন্দ্র-স্বপ্নজাল হোক বোনা,
সূর্যের প্রহর অবসান।

নিউটন ও ভাব

নিউটন, মধ্য-টান তুমি করেছিলে আবিষ্কার
আপেল বৃক্ষের তলে বসে,
সহসা আপেল যবে পড়েছিল সম্মুখে তোমার
উর্ধ্ববর্তী বৃন্ত হতে খসে।

হতে যদি দার্শনিক এই ভারতের পুণ্যভূমে,
আপেলের অধঃপাত দেখে
তাহলে ভাবিতে তুমি আধ-জাগরণে আধ-ঘুমে
"এই মত হায় একে একে
জীবনের বৃন্ত হতে খসে পড়ি আমরা প্রত্যেকে।
তবে এ ভবের হাটে কেন মিছে"—ইত্যাদি ইত্যাদি!
কিন্তু তাহা ভাব নাই বস্তুবিদ্‌ তুমি বুদ্ধিবাদী।

তুমি ছিলে কৌতূহলী তুষ্টিহীন দুষ্টশিশু যেন
মগজের যন্ত্রে যার একই প্রশ্ন বারবার
গুঞ্জরিছে—"কেন? কেন? কেন?"

আপেলের পানে তব দৃষ্টি গেল, তুমি নাহি গেলে,
শুধাইলে শুধু অতঃপর

"বৃন্তচ্যুত হয়ে তুমি নিম্নপানে কেন নেমে এলে ?
হে আপেল, দাও গো উত্তর।"
জবাব দিল না জানি, আপেল পড়িল ভিন্ন হাতে,
সযতনে ছিন্ন হ'ল ছুরিকায়, ভিন্ন হ'ল দাঁতে,
চেনার অতীত তীরে আপেলের হ'ল রূপান্তর।

ভাবিয়া দেখিলে তুমি, "হায় শুধু আপেল তো নহে,
নামে বেল, নামে তাল, নারিকেলও নামে নিম্নপানে
ছিন্ন-হলে-বোঁটা। বৃষ্টি নামে, নদী নিম্নপানে বহে।"—
তারপর খ্যাত হলে আবিষ্কার করি মধ্য-টানে।

কিন্তু ভাবি তুমি বন্ধু বসেছিলে যে বৃক্ষের তলে
না হয়ে আপেলবৃক্ষ ডাব বৃক্ষ হ'ত যদি তাহা,
সেই আপেলের মতো যদি হায় বৃন্তচ্যুতি ফলে
একটি বৃহৎ ডাব পড়িত তোমার টাকে আহা!
হয়তো পাইতে অক্কা টাকে সেই ডাবাঘাত লেগে,
অথবা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা লয়ে হাসপাতালে জেগে
ভাগিত বিজ্ঞানীবুদ্ধি, জাগিত না গবেষণা ভাব;
করিতে না প্রশ্ন তুমি, "নিম্নপানে কেন এলে ডাব ?"
—এক নদী বহু তরঙ্গ

জগদীশ ভট্টাচার্য

ভগ্নপক্ষ

আমি নই রাজহংস—শুভ্রপক্ষ মেলে নভোনীলে
বলাকার মালা হয়ে ভুলে যাব ধরণী-সীমানা,
অলকাবিলাসী নই—মানসের স্ফটিক-সলিলে
স্বপ্নিল কমল-বনে চঞ্চুকেলি নেই মোর জানা।

ঝড়ে-পড়া পাখী এক, কাদামাখা, ভাঙা দুই ডানা,
প্রলয়ের সন্ধিলগ্নে হারায়েছি আশ্রয়-শাখাটি,
আমার আকাশ নেই, আছে শুধু পৃথিবীর মাটি
আর আছে ভীরু রক্তে সর্বগ্রাসী মৃত্যুর ঠিকানা।

তবু জানি এই মৃত্যু পার হতে হবে একদিন—
তাই ত অমৃতমন্ত্র জপ করি ধূলির আসনে,
জানি চক্ষে আলো নেই, তবু আশা আছে মনে মনে—
জড়ময়ী এ পৃথিবী শোধ ক'রে দেবে সব ঋণ,
এ প্রলয়-রাত্রিশেষে দেখা দেবে প্রত্যূষ নবীন,
অভিশপ্ত মৃত্যুপুরী ভেসে যাবে প্রাণের প্লাবনে ॥

দিনেশ দাস

স্বর্ণভস্ম

ভস্ম তোমার ছড়িয়ে দিলেম
গঙ্গা সিন্ধু খরস্রোতে,
নীল, অ্যামাজন, হোয়াংহোতে
ছড়িয়ে দিলেম, জড়িয়ে দিলেম
সাত সাগরের অতল জলের অন্ধকারে,
নতুন প্রাণের অঙ্গীকারে।

এই যে বিরাট পতিত জমিন্ অনুর্বর,
মনসাকাঁটা গুল্মে ভরা দিগন্তর,
শূন্য সকল সম্ভাবনা,
প্রাণধারণের প্রাণহরণের বিড়ম্বনা।

ভস্ম তোমার মিলিয়ে গেল স্রোতের তোড়ে
ননির চেয়ে নরম নতুন অবাক্ পলির সৃষ্টি ক'রে,

বসুন্ধরার বন্ধ্যাচরে
এবার বুঝি জীবন-সোনার ভস্ম ঝরে :
পতিত মাটি আজকে দেখি স্বপ্নরতা
আসবে ফিরে হারানো তার উর্বরতা,
দিগন্ত তার উঠবে জেগে
সবুজ মেঘে।

ভস্ম তোমার বীজের মতই ছড়িয়ে গেল আকাশতলে
জলে স্থলে ॥

তবু

নিশুতি রাতের নেকড়ের মত দৈন্য যখন গর্জায়
তবু প্রেম এল জীবনের সিং-দরজায়।
হে জীবন, তুমি কী মধুর কী নিখুঁত,
অপরূপ অদ্ভুত!

কোথা নীড়? কোথা নীড়?
নির্জন কোন্ কোণেতে দু'জন হবো যে সন্নিবিড়।
আমি নীড়-সন্ধানী,
নীচে ধূসরিত পাষাণের রাজধানী।
নীড় নেই হেথা নীড় নেই,
উটপাখী আজ কোথায় খুঁজবে বাসা
নভ হ'তে অবতীর্ণেই,
নীড় নেই কোনো নীড় নেই।

নীড় নেই কোনো পালাবার,
চলো হিমাচলে চলো যাই দূরে মালাবার;

শেষ ক'রে মিছে ছন্দমিলের গরমিল
চলো যাই চলো সাগর যেখানে উর্মিল,
গুঁড়োনো গিনির মতই যেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো বালি উড়ছে,
সোনা বালুচর প'ড়ে আছে কাঁচা রোদের হলুদে মুছে',
জোয়ারের বাধা আনি না তো আর গ্রাহ্যে,
পৃথিবীকে চলো দীর্ঘ করি সে নতুন দ্বীপের রাজ্যে।

বাসা নেই হেথা বাসা নেই,
মকরকেতুকে দিতে হবে তুলে ভাসানেই ;
যেদিকে তাকাও সামনে অথবা পিছনেই,
শুধু নেই নেই কিছু নেই ;
সবই মুছে গেছে ডুবে গেছে বিস্মরণে,
তবু দেখি প্রেম এসে গেল এই জীবনের সিং-তোরণে।
হে জীবন! হে সময়!
বিস্ময়! মধুময়!

সুশীল রায়

পাঞ্চালী

পাণ্ডব এসেছে দ্বারে, খোলো দ্বার, হে সতী পাঞ্চালি
পাণ্ডব এসেছে দ্বারে ॥
প্রতিবিম্ব নেহারিয়া মীন-আঁখি পারি নি বিঁধিতে—
নাই সাধ্য, নাহি সে সাধনা,
করি তা স্বীকার।
তাই কি অক্ষম বলি' মোরে দিবে জঘন্য ধিক্কার ?
আমার ললাটে তুমি এঁকে দিলে দীপ্ত জয়টিকা,
এনে দিলে বীরের সম্মান।

সমুন্নত শির তাই, হেরো, নীল আকাশ ভেদিয়া
কত উর্ধ্বে তুলিয়াছি।
অহংকারে সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত মোর,
মীনাক্ষি, তোমারে জিনি'।
আমি লভিয়াছি তোমা', লো পাঞ্চালি, মোর ভ্রূ-ধনুতে
নয়নের বহ্নিশর নিক্ষেপি' যতনে,
স্ফটিকনির্মিত তব সমুজ্জ্বল আঁখিতারকায়
হেরি' মোর পরিপূর্ণ ছায়া অপরূপ।
তোমারে জিনেছি আমি, মুহূর্তের এই গর্ব হোক,
জীবনের সে হোক সান্ত্বনা।

তোমার হৃদয় ছিল কী কঠোর, বুঝাতে পারি নে।
নিখুঁত সৌভাগ্য দিয়ে সে শিলারে শোলার মতন
করিনু সহজ।

তাই তো শোভিছ তুমি বিচিত্র শোভায়
পঞ্চমে গাহিছ গান মুক্ত বিহঙ্গমা।
মাথার মুকুট-তুমি, শিরস্ত্রাণ হয়েছ আমার,
আমার এ জীর্ণ নীড় হেরি তাই প্রাসাদের মত ;
অদূরে চাহিয়া দেখ, কী অপূর্ব সৌন্দর্যভূষায়
সাজায়েছ ইন্দ্রপ্রস্থ মোর।
অগণিত জনস্রোতে রাজপথ উতল, অস্থির।
হে সখি, পাঞ্চালি, তুমি জনতার প্রবাহ হইতে
চিনিয়া আনিতে পারো রথিশ্রেষ্ঠ সব্যসাচীটিরে ?
পারো যদি, সেই মোর বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
বীরের সম্মানে মোর বিভূষিত রহিবে ললাট ;
সে ভাগ্যলিখনখানি ক্ষণে ক্ষণে দেখিবে যখনি
আমারে ডাকিয়া নিয়ো গভীর গৌরবে
অন্তঃপুরে তব।

নাকের নোলক সম অশ্রুর মুক্তা
ছলছলি দোলে যদি নাসাগ্রে তোমার
কোনো অসময়ে,
আমারে স্মরণ ক'রো, হে পাঞ্চালি, পাণ্ডবে তোমার ;
জতুগৃহদাহ সম জ্বলে যদি লেলিহান শিখা
অন্তরে আমূল,
অজ্ঞাত আবাসে তুমি মোর সাথে থাকিয়ো, পাঞ্চালি,
নিভাব তোমার জ্বালা আমার এ নয়ন-আসারে ।

প্রতিটি পঞ্চম রাত্রে, মোরে তুমি জানাবে আহ্বান—
তোমার পাণ্ডবে ।
তাই তো পঞ্চমী বলি' সম্বোধন করি' তোমা' আমি
তোমার নামের মন্ত্রে লভি' মোর দীক্ষা অভিনব
রচিলাম কত কাব্য কত শত প্রগল্‌ভ নিশায় ।
কত কানে কানে কথা কহিলাম অস্ফুট ভাষায় ।
কান পেতে শুনিলে সে বাণী—
এই পাণ্ডবের ভাষা, শত যুগযুগান্তর ভেদি'
লক্ষ ইতিবৃত্তকথা উল্লংঘন করি' অবশেষে
যার আবির্ভাব
ঘটিয়াছে দুয়ারে তোমার ।
চাহিলে ব্যথিত চোখে মোর পানে, জড়ালে বাহুতে,
বিপুল শতাব্দী ভেদি' ছুটে-আসা নায়িকা আমার ।

যা পেয়েছি এই সত্য, সেই সত্যে মোরা চিরঞ্জীব,
অপগত রজনীর ইতিহাস জানিতে চাহি না ।
অতীতের গর্ভ হতে টেনে এনে কৃমির কঙ্কাল
কে চাহে উৎসবরাত্রি করিতে অশুভ ?
চৌদিকে নিজেকে তুমি ছড়ায়েছ বিপুল হেলায়
বিশাল ধরিত্রী সম দিক হতে দূর দিগন্তরে—
জানি, এ যে কর্তব্য তোমার ।

কত রাত্রি কাটে তব কত অভিনয়ে
জানি জানি, জানি তা সকলি।
জানি আরো, তোমার ও বিশাল হৃদয়ে
ভালোবাসা রয়েছে অগাধ।
তুমি যদি জনে-জনে কৃপার মতন
তাহ'তে কয়েক ফোঁটা দান ক'রে থাকো,
কি ক্ষতি আমার ?
আপনার গন্ধটুকু কোন্ ফুল রাখে সংগোপনে,
ঢাকে নিজ অবয়ব ঘন পত্রচ্ছায়ে ?
তাদের যা প্রাপ্য তা তো নিয়ে যাবে ভ্রমর, মধুপ,
বিলাসী বাতাস আসি' ঠোঁটে তার টোকা দিয়ে দিয়ে
নিজেকে সৌভাগ্য দিয়ে করে সুরভিত,
উষার শিশির
রাতের বাসরঘরে কত সাধে কত-না সোহাগে
নিজ আঁখিজল দিয়ে ধৌত করে পাপ ;
সে ফুলে অঞ্জলি দিলে দেবতার কি ক্ষতি তাহায়,
কিসের আক্ষেপ ?
আমারি কৃপায় তুমি প্রস্ফুটিতা, পূর্ণবিকশিতা—
আমারি হৃদয় 'পরে তাই তব আত্মসমর্পণ।

আজিকে আমার নিশা, তাই তব দ্বারে আসি'
হানি করাঘাত—
খোল দ্বার, হে সতী পাঞ্চালি।
এলাও এলাও চুল এলোমেলো দেহলীর 'পরে,
সমস্ত প্রদীপখানি কেঁপে কেঁপে যাক্-না মরিয়া,
এ ঘর উজ্জ্বল হবে দু'জনার নয়ন-বিভায়।
পাণ্ডব এসেছে দ্বারে, খোলো দ্বার, হে সতী পাঞ্চালি
দুয়ারে অতিথি তব তৃতীয় পাণ্ডব ॥

—পাঞ্চালী

সমর সেন

দুঃস্বপ্ন

মাঝে মাঝে তোমার চোখে দেখেছি
বাসনার বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন ;
তার অদৃশ্য অন্ধকার প্রতি মুহূর্তে
আমার রক্তে হানা দেয় ;
আমার দিনের জীবনে তোমার সেই দুঃস্বপ্ন
এনেছে পারহীন অন্ধকার।

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়
মধ্যরাত্রে।
বাইরে এসে দেখি
তারায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ,
আর হাওয়া দিয়েছে বিপুল শূন্যতা থেকে ;
সে হাওয়ায় শুধু যেন শুনি,
কান পেতে শুনি
কোন্ সুদূর দিগন্তের কান্না ;
সে-কান্না যেন আমার ক্লান্তি,
আর তোমার চোখের বিষণ্ণ অন্ধকার।

অন্ধকারের মতো ভারি তোমার দুঃস্বপ্ন,
তোমার দুঃস্বপ্ন অন্ধকারের মতো ভারি ॥

ইতিহাস

তোমাকে বললাম—এস,
তোমার ধূসর জীবন হতে এস,
তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এস,
যেখানে প্রভাতের রক্তিম আশা কাঁপছে,

যেখানে আসে রাত্রের পাহাড়ে ঘননীল আভাস,
নামে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার,
আর তারারা জ্বালে তীক্ষ্ণ, নীল আগুনের শিখা
আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।

তুমি কোন উত্তর দিলে না, শুধু হাসলে।
সে ক্লান্ত, স্তিমিত হাসিতে
রাত্রির অবিশ্রাম, অশান্ত বিষণ্ণতা॥

গোপাল ভৌমিক

বসন্ত-বাহার

রমলা কমলা মায়া বা মাধবী—
যে নামে তোমাকে ডাকি,
জানি সবগুলি সত্যি
আবার সবগুলি তার ফাঁকি—
যাকে খুঁজি তার এখনও আসার
অনেক যে দিন বাকি।

অনেক তো ভুল করেছ জীবনে,
পায়ে পায়ে রশি এঁটে
বন্ধ ঘরের চারটে দেয়ালে
এক ছবি সেঁটে সেঁটে
বহুমুখী মনে আনতে চেয়েছ
একমুখী অভিরুচি :
দোষ কি তোমার? তুমি যে মানবী,
খাঁটি হীরা ফেলে চেয়েছ কাচের কুচি

কিন্তু এ মন দুরন্ত
এবং পৃথিবীও বহুরূপী,
ক্ষণে ক্ষণে তার বদলায় রূপ
অজান্তে চুপি চুপি।

ধর না এই আজকে সকাল
ফাল্গুনী রসে মত্ত মাতাল
হাতছানি দিয়ে বারবার ডাকে
কোথায় কি ছাই জানি !

কচি রোদ-শাড়ি পরেছে নগরী,
তার সে আঁচলখানি
দেখে মনে হয়, ছুটে চলে যাই,
বলি, আমি আছি, আছি—
কি করে বোঝাই উদ্বেল কেন
আজ মন মৌমাছি ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এই চাঁদ

এই সেই চাঁদ।

কপালে দিয়েছে টিপ, প্রথম কৈশোরে।
চোখে উদ্দীপনা জেলে
হৃদয়কে করেছে উন্মাদ।
এই সেই গোল চাঁদ রুপালী-হলুদ।
দূর নীলে বাঁশবনে তমালের ফাঁকে
মেঘেদের সিঁড়ি ভেঙে চুপে উঠে এসে
যে-চাঁদ দিয়েছে ধরা শিশুদের ডাকে,
গোটা পৃথিবীটা ফের হঠাৎ উঠেছে হেসে
গভীর খুশিতে আপনার,
রাত্রির রজনীগন্ধা স্পর্শে যার হয়েছে উন্মাদ,
এই সেই যুগান্তের চাঁদ।

অশোক তরুর 'পরে দেখা যেতো যারে,
ছায়া স'রে যেতো বনে-বনে,
রূপার থালার মতো প্রতিবিম্ব পদ্মদীঘিপারে,
আলো-বিচ্ছুরিত বাতায়নে,
এই সেই চাঁদ।
যখন দিনের শেষে এ সংসার লেগেছে বিস্বাদ,
প্রত্যহের ঘূর্ণিপাকে ভারাক্রান্ত মন,
বারান্দায় এসে বসা, দেহে লাগে হাওয়া,—
উপলব্ধি হয়েছে তখন
এ পৃথিবী হ'তো যদি চাঁদের মতন!
নির্মল প্রশান্তি এক চন্দ্রিমার কাছেই যে পাওয়া!

এই সেই চাঁদ।
পথ দিয়ে যেতে যেতে উদাস পথিক
অতর্কিত যাকে দেখে হয়েছে উন্মাদ।
ছুটেছে তো বারংবার আলেয়ার পিছু,
হয়েছে যে মাথা নীচু,
নিস্তরঙ্গ বনস্থলী, ক্রমেই বেড়েছে শুধু রাত,
মাথার উপরে জেগে
সারারাত ধ'রে এই স্নিগ্ধদীপ্তি চাঁদ।

মনে পড়ে, বেণুমতীতীরে
অপূর্ব পুলকরাশি মনে
কুঞ্জতলে থাকে ব'সে একটি যুবতী;
স্বপ্ন নামে দু'নয়ন ঘিরে,
নির্মল যৌবনে
স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক পড়ে,
দুঃসহ যৌবন নিয়ে চাঁদ খেলা করে বনে বনে

অনেক যুবতী
অনেক গভীর ক্ষতি
সয়েছে তো যুগে-যুগে ক্ষমাহীন প্রেমের সংসারে ;
অনেক যুবক
মাঝপথে ফেলে গেছে প্রতিরুদ্ধ হয়ে
সদ্যোজাত ফুলের স্তবক ;
মধ্যরাতে চাঁদ দেখে মিটে গেছে অন্য যত শখ।
যে কার্থেজ ভেঙে গেছে, যে রোমের স্বপ্ন আর নেই,
যে মিশর ভগ্নস্তূপে ভরা,
লুপ্তপ্রাণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে যুগে যুগে
এই চাঁদ ছিল সেখানেই।
অতিক্রান্ত কত কাল! তবু তো লাগে নি দেহে জরা।

ধনী-প্রাসাদের চূড়ে, কৃষকের জীর্ণ চালাঘরে,
দিগন্তে অম্বরে
সর্বত্র সমানবেগে জ্বলে
পিতৃপুরুষের এক অনির্বাণ আশিসের মতো
চিরজ্যোতিঃ এই চাঁদ ;
চাঁদের কটাক্ষ থেকে বঞ্চিত হয়েই যুগে-যুগে
পৃথিবী কি লেগেছে বিষাদ!
রূপালী অজস্র আলো প্রসারিত মাঠের ফসলে,
অরণ্যশিয়রে, উচ্চতটতলে ;
রাতের পাখীরা উড়ে যায়
ডাল হ'তে অন্য ডালে সাদা জ্যোৎস্নায় ;
নিঃশব্দ চরণে
রাত্রি-জাগা পলাতক প্রেমিকের মতো
চাঁদের ছায়ারা বনে বনে।

মাঠপারে কৃষিপল্লী, সেখানেও চাঁদ
দাঁড়িয়েছে এসে

হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের বেশে,
মুছে নিয়ে গেছে যত দিনান্তের জরা অবসাদ ;
দীর্ঘপথে শূন্যক্ষেতে
কণ্টকিত সংসারের পথে যেতে যেতে
নির্বিকার বিধাতার মতো
এই সেই চাঁদ ॥

—স্বর ও অন্যান্য কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

বিরহ

বালুচর জলে ধূ ধূ—সুদীর্ঘ সময়,
উড়ে গেছে শ্বেতপক্ষ যাযাবর পাখি !
আকাশে অবাধ শূন্য, আর কিছু নয়,
নির্লিপ্ত, অলস চোখে দূরে চেয়ে থাকি ।
সবুজ ইশারা সেই তৃণহীন চরে ।
জলের পশুর হাড় বিক্ষিপ্ত ধূলায় ।
পিশাচী হাসির ধ্বনি বাতাসের স্বরে ।
একাকী দর্শক আমি এ শিব-লীলায় ॥
এখানে সমুদ্র ছিল নীলাম্বু নিথর,
আদিম প্রাণের বন্যা নিবিড় নীলিমা ।
এখানে সমুদ্র ছিল অগাধ, দুস্তর,
উচ্ছল জলের দীপ্ত, অশান্ত মহিমা !
তুমি চ'লে গেলে, আর সমুদ্র তো নয়—
বালুচর জলে ধূ ধূ,—সুদীর্ঘ সময় !

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

থাকত যদি মেঘনা

গাঁয়ের পাশেই থাকত যদি কোনো নদী
অনেক বড় নদী, যেমন মেঘনা—
নিখোঁজ হয়েছে যার ওপার, আর
এপারের দিকেই কি চাওয়া যায় ?
ধূ ধূ জল শুধু
অভ্রের মতো ঝলমল করে !

বলাকার শাদাপাল নৌকোগুলি
উধাও হ'ত কোন্ সে দেশে,
আমাদের গাঁয়ে লাগত তার হাওয়া।
আর,
বর্ষার কালো মেঘেরা ছায়া ফেলে ফেলে
কোথায় যে চ'লে যেত !
ও তখন হয়রাণ হ'ত পিছুপিছু,
ঘন ঘন পড়ত নিশ্বাস,
ফুলে' ফুলে' বিপুল বুক উঠত দুলে—
থাকত যদি মেঘনা !

কত গাঁয়ের ভিতর দিয়ে
আঁকাবাঁকা খালটি—
সবুজে ভিজে ভিজে
বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
আষাঢ়ে যখন ও নতুন আবদারে বেড়ে ওঠে
আর, অধৈর্য দুরন্তপনায় দিনরাত
কলবল্ ছোটে—
ভারি ভালো লাগে আমার।

কিন্তু মাঘের শেষেই
না-খেতে পাওয়া রুগীর মতো শুকিয়ে শুকিয়ে
ম'রে যায়,
দখিণা সাগরের হাওয়াটুকুও
গায়ে লাগিয়ে যেতে পারে না !
সমস্ত গাঁও জুড়ে প'ড়ে থাকে শুধু ওর
আঁকাবাঁকা দীর্ঘ সুদীর্ঘ কঙ্কাল ।

আর থাকত যদি মেঘনা !
কাশের বনে এপার মুখ তুলে
হেসে উঠত বটে,
তবু কি আর ওপারের দিকে চাওয়া যায়—
হাজার সূর্য জ্ব'লে উঠেছে !

থাকত যদি মেঘনা ।

কেশবতী

রুদ্ধ-জানালা শহর-শয়নে
স্বপন ঘনায় রাতে :
পাহাড়ের গায়ে জ্যোৎস্না গড়ায়
দ্বীপের দেশে,
কেশবতী ঘুমে ফুলশয্যাতে
শিথিল কেশে !
নিবিড় কেশের সুরভি আঁধার
তনুখানি ঘেরি ঝরে চারিধার,
মাঝে ফুটফুটে মুখখানি তার
প্রণয়-স্বপনে হাসে,
—সে মুখ দেখিয়া নিশীথের চাঁদ
আকাশ সাঁতারি' আসে ।

যে লিপিখানিরে সাঁঝে স্নানশেষে
জড়িয়ে দিল সে কুঞ্চিত কেশে
রাতের জোয়ারে এলো ভেসে ভেসে
হিজলঘাটের দেশে,
দীঘল চুলেতে জড়ানো সে চিঠি
তুলিলাম দুই হাতে—

স্বপন দেখি যে রাতে !

উমা দেবী

বরতনু

১

সে বরতনুর কথা যে মুহূর্তে মনে পড়ে যায়
অমনি আকাশ-মন ভরে ওঠে রঙিন জ্যোৎস্নায়—
স্বপ্নের সৌরভ ভাসে দক্ষিণ হাওয়ায়—
তেমন—তেমন তনু ক'টি দেখা যায় !
আমার তো সাধ যায় সে বুকের আকাশে হারাতে,
বাহুর সীমানা-ঘেরা অনন্তের নিদ্রাহীন রাতে
সুধায় শীতল দুটি চোখের তারাতে—
সে চোখে কিসের দিশা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে অকারণ ?
কে জানে—সে জিজ্ঞাসা কেমন !
আমি তো তৃণের মত ভেসে গেছি দেহের জোয়ারে,
স্খলিত অশ্রুর মত ঝরেছি সে চোখের কিনারে,
অঙ্গে অঙ্গে আবর্তের ক্রুদ্ধ ফেনভঙ্গে ভঙ্গে
করেছি গাহন—
পিপাসার্ত রসনাকে সিক্ত করে দিয়েছে দাহন—
ভ্রূভঙ্গ-শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কোন্ পতঙ্গের মন ?
কে জানে—সে জিজ্ঞাসা কেমন !

আমার লেগেছে ভালো সে দেহের অত্যাশ্চর্য রূপ,
তারই তপস্যায় যাক দগ্ধ হয়ে এ দেহের ধূপ!
আমার লেগেছে ভালো সে চোখের শীতল আগুন,
যাক না বিকল হয়ে বনে বনে সকল ফাগুন!
আমার লেগেছে ভালো সে দেহের বিহ্বল সীমানা—
সেখানে হারিয়ে যেতে আছে কার মানা?
হারিয়ে যাওয়ার স্বাদ মধুর এমন!
কে জানে—সে জিজ্ঞাসা কেমন!

২

আমার সে প্রিয় দেহে আছে এক মনোরম দেশ—
সেখানে পৌঁছলে পরে মিলবে না কারো কোনো একটু উদ্দেশ!
দেহের রহস্যে ঘেরা একটি দ্বীপের মত শ্যামল সে মন—
সেখানে পৌঁছতে হলে হারিয়ে আসতে হবে সমস্ত ভুবন!
সেখানে অপার এক রহস্যের সোনালি আকাশে
জগতের যত অশ্রু—তারার আভাসে
ভোরের আলোর নীচে ফুলের মতন হয়ে হাসে!
সেখানে অতল এক রহস্যের গভীর পাথারে
গোপন বেদনাগুলি মুক্তা হয় শুক্তির আধারে।
মাঝে মাঝে সেখানেও ওঠে এক দক্ষিণ বাতাস
অমনি মুহূর্ত মধ্যে কি যে হয়ে ওঠে চারিপাশ—
সুখ-ভারে বন্ধ হয়ে আসে যেন বুকের নিঃশ্বাস!
সব স্বপ্ন গাঢ় হয়ে নামে—
মনের গভীরে এসে থামে—
বিকায় তখনি বিনা দামে।
সে এক রহস্যময় দেহশায়ী মনোরম দেশ—
সেখানে পৌঁছলে আর পৃথিবীর থাকে না উদ্দেশ,
মনে হয় এই তো অশেষ—
অশেষের আনন্দ এমন!
কে জানে—সে জিজ্ঞাসা কেমন!

তবু সে অশেষ নয়—আরো আছে গহন গভীর,
সেখানে—সেখানে নেই কোনো ভিড় এই পৃথিবীর,
কোনো ঢেউ গান কিংবা স্বপ্ন জলধির।
সেখানে একক এক আত্মা মহীয়ান্
ধ্রুব-তারকার মত অজেয় অম্লান—
বিরাজিত আছে দিনমান।
সে তারার আলো যদি লাগে এসে পৃথিবীর গায়—
অমনি সমাজ আর সংসারের গ্রন্থিগুলি শ্লথ হয়ে যায়।
আমার প্রিয়ের মধ্যে অমনি মিলায় এসে সহস্র শতেক
ভাই বন্ধু পুত্র পিতা সম্পর্ক অনেক!
সমস্ত আলোক এসে একটি আলোয় করে আত্ম-নির্বাপণ—
গভীরের ব্রত-উদ্‌যাপন!
কি ক'রে অনেক এসে তার মধ্যে এক হয়ে যায়—
কে জানে সে কথা আর কে আছে সে রহস্য বোঝায়!
আমি তো পারি না কিছু বুঝে নিতে কি আছে কোথায়!
আমার দৃষ্টিতে এসে সে আলোক লাগে বার বার,
আমার মুষ্টিতে শুধু ধরা থাকে দেহ-দীপাধার।

সে দেহ-দীপের কথা—সে বরতনুর কথা যে মুহূর্তে মনে পড়ে যায়
অমনি আকাশ-মন ভরে ওঠে নিবিড় জ্যোৎস্নায়—
স্বপ্নের সৌরভ ভাসে দক্ষিণ হাওয়ায়—
তেমন—তেমন তনু ক'টি দেখা যায়!
আমার তো সাধ যায় সে তনুর আকাশে হারাতে,
অজস্র রূপের শিখা জ্বেলে নিতে চোখের তারাতে,
সহস্র সুখের স্মৃতি বেঁধে নিতে মনের কারাতে—
হার মেনে নিতে তার হাতে।

আমি তো তৃণের মত ভেসে গেছি দেহের জোয়ারে,
স্খলিত অশ্রুর মত ঝরেছি সে চোখের কিনারে,
একটু হাসির সঙ্গে জ্বলেছি সে অধরের পরে—
একটু ক্লান্তির মত ডুবে গেছি ঘুমের সাগরে।
তার প্রতি রোমরূপে স্বহস্তে আপনি আমি রসকূপ করেছি খনন,
তার প্রতি বলিদামে পলাতক যৌবনকে করেছি বন্ধন,
অনন্ত ভঙ্গিতে তার—আমারি—আমারি শুধু প্রতিক্ষণে জীবন-মরণ!
তাইতো আমারি সাধ সে বুকের আকাশে হারাতে,
বাহুর সীমানা-ঘেরা অনন্তের নিদ্রাহীন রাতে,
যৌবন-রহস্যে ভরা বিষাদমধুর দুই নয়ন-তারাতে—
হার মেনে নিতে তার হাতে॥

বাণী রায়

রাজপুত্র

রাজপুত্র! রাজপুত্র! পক্ষীরাজ তব
গেছে চলি বহুদিন তেপান্তর ধরি,
সুদূর আকাশ-প্রান্তে দিক্‌চক্রবাল,
অশ্বারোহী মিলায়েছ কৃষ্ণবিন্দু যেন।

সে তো হল বহুদিন।
বহু উষা এল,
কাজল-আকাশে এল কত না প্রদোষ;
কত পুষ্প বিকশিল,
ভ্রমর গুঞ্জিল,
পক্ষীরাজ ফিরে আর এল না ধরায়।
রাজপুত্র, নিশা-অন্তে র'লে স্বপ্নপ্রায়।

নহি আমি রাজকন্যা,
তবু অনিমিখ

প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি দিগন্তের সীমা,
ধুলা ওঠে ঝড় হয়ে, শুষ্ক পত্র খসে,
ধূসরে মিলায়ে যায় সুদূর নীলিমা।
ওঠে না অশ্বের ধূলি শুধু চক্রবালে,
রাজপুত্র, এ নয়ন ঢাকে বাষ্পজালে ॥

—জুপিটার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ছাপ

কেউ দেয় নি কো উলু
কেউ বাজায় নি শাঁখ,
কিছু মুখ কিছু ফুল
দিয়েছিল পিছুডাক।

পরনে ছিল না চেলি
গলায় দোলে নি হার ;
মাটিতে রঙীন আশা
পেতেছিল সংসার।

আকাশের নীল গায়ে
শপথের ইস্পাত ;
দরজায় পিঠ দিয়ে
বাইরে গভীর রাত।

সারা বাড়ি থমথমে
সিঁড়ি একদম চুপ ;
দেয়ালে নাচায় ধোঁয়া
জানলায় রাখা ধূপ।

মুঠো মুঠো তারা নিয়ে
কড়ি খেলছিল মেঘ ;
ভুলে গেছে বুঝি হাওয়া
ঝড়ঝঞ্ঝার বেগ !

হঠাৎ যে কোথা থেকে
ছুটে এসেছিল ঝড় ;
ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে
দুলে উঠেছিল ঘর।

দু জোড়া বন্ধ ঠোঁটে
থেমে গিয়েছিল গান ;
চোখে রেখেছিল হাত
টেবিলের বাতিদান।

জীবনের হ্রদে স্মৃতি
চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ;
ভিজিয়ে সে জলছবি
তুলে নিল এই ছাপ

—যত দূরেই যাই

গোবিন্দ

হাঙর

এমন অখণ্ড অবসর
কতটুকু মেলে এ-জীবনে।

এই বৃষ্টি,
নির্জনতা,
নীল বেলা,
এমন আকাশ,
এমন নিথর অবকাশ !

ভাবি মনে মনে :
সমুদ্রের মত ব্যাপ্ত এ কোন্ জগৎ !

বুক ভেঙে আসে দীর্ঘশ্বাস।

ঠিক এরই পর—
বৃষ্টির কুয়াশা-মোছা
আছে সেই সমুদ্ধত, বীভৎস নগর :
চিমনি, মিনার আর মোটরে নিরেট

তারক ঘোষ

রাহু

অমৃতের দিব্য তৃষা ছিল তোর স্পন্দময় বুকে।
তবু, ওরে লোভাতুর ! ব্যর্থ তোর জীবন সাধনা।
প্রতি রোমকূপে তোর উচ্চারিত জলন্ত বাসনা,
সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তোর ধূমায়িত আপিঙ্গল চোখে।
ওরে চোর ! লুব্ধ হয়ে কামনার ক্ষণজীবী সুখে
ভ্রষ্ট হলি অমৃতই চুরি করে। তপস্যা ছিল না
যে সিদ্ধির—ফাঁকি দিয়ে তাই পাবি ? অমৃতের কণা
বিষ হল ; নীলাভ গরল তোর কলঙ্কিত মুখে॥
ওরে লোভী ! কামমত্ত এ জীবন হল অভিশাপ।
প্রকাশের দীপ্ত সূর্য—হৃদয়ের সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমা
গ্রস্ত ত্রস্ত হয় বার বার—গৃধ্নু তার নেই ক্ষমা।
জীবনের প্রতি পর্বে লেলিহান হয়ে ওঠে পাপ।
অবিশ্বাস, ঘৃণা, ভয়—এই লোভ দিন-যাপনায়।—
জীবন জীবন নয়—মরণের জলন্ত অঙ্গার॥

—পূষা

নরেশ গুহ

ট্রেন

স্বর্গের করি নি আশা।
অলকার অলীক বৈভব
স্বর্ণ-পারিজাত আর বাসবের অমৃত আসবে
কোনকালে ভাবি নি যে একতিল অধিকার হবে।
ত্রিলোকরঞ্জিনী নটী উর্বশী রম্ভার
নির্বিকার মুখচ্ছবি কখনো ভাবি নি।
অসম্ভবে দাবী নেই। এখন গম্ভীর
জীবনের দীর্ঘ ট্রেন উর্ধ্বশ্বাস। ঘুরন্ত চাকায়
শব্দের পাঁজর ভাঙে, চূর্ণ হয় সময়ের বুক ঃ
এর চেয়ে দুঃখ দ্রুত ? রোমাঞ্চিত এর চেয়ে সুখ ?
কখন পেরিয়ে গেছি শেষরাতে-আলো-জ্বলা, ঘুমে অচেতন
দুরাশার সিঁড়িতোলা অজানা স্টেশন।
কখন ছেড়েছে গাড়ি, থেমেছে কোথায়,
ঝুড়ি কি জলের কুঁজো হাতে করে কে উঠল,
কারা নেমে যায়,
করবীর ডালে বসে ডেকে যায় যে পাখিটা
কী যে ওর নাম ঃ
আনমনে ছাড়িয়ে এলাম।

প্রকাণ্ড সূর্যের নীচে শ্রমে তিক্ত, জ্বরে মূর্ছাতুর
আকাশ পৃথিবী ভরা পড়ে আছে নির্বাক দুপুর।
আদিগন্ত রেলপথ—অনিশ্চিত অনন্ত সময়—
জীবনের লৌহচক্র অক্লান্ত ইচ্ছায় পার হয়।
মুহূর্তের বনপথ, মুহূর্তের মাঠ,
জ্যোৎস্নায় কুঞ্চিতরেখা হ্রদের ললাট,
গোধূলিতে হাটফেরা মানুষের ভিড়
পার হয়ে মধ্যরাতে উদ্দাম নদীর

নির্জন পাড়ির পরে চিরতরে থেমে যাবে ট্রেন :
প্রশ্ন শুধাবে না কেউ—'কোথায় যাবেন ?'
আকাশ দেবে না আলো, স্বর্গ পাঠাবে না
অমরার করুণার সেনা।

দ্রুতদৃষ্টি দেখে নেয় অবসন্ন মহানগরীর
সীমান্তে পোহায় রোদ আকাশের আশ্চর্য শরীর
আলোর সমুদ্রে সেরে স্নান।
অতলান্ত নীল তার চোখে ভরা প্রাণ।
আমার সামান্য রুটি, সামান্যই জল
ট্রেনের সম্বল।
কর্কশ কম্বলে ঘেরা অপ্রসর শয্যাভরা রাত
নিয়ে বসে আছি জেগে ; কবে অকস্মাৎ
ছবির মতন ছোট কোনো এক ইষ্টিশানে
ওঠে যদি সে-ও
যারে ভেবে এতকাল হৃদয়ে তুলেছি কত ঢেউ,
যে এসেছে অতিদূর আপনার ঘর থেকে তার
মাঠের শিশির ভেঙে, ফেলে তার মায়ের সংসার,
ফেলে তার সখীসোনা, ফেলে তার দীঘিভরা জল
ট্রেনের বাঁশির সুরে উতলা চঞ্চল।
সুন্দর কপালে আঁকা বিন্দু বিন্দু ঘাম,
ভোরের ঘুমের মত স্নিগ্ধ যার নাম,
যে আছে অপেক্ষা করে সহস্র নিদাঘে ভরা যেন এক
ছায়া সুশীতল :
তারে নিয়ে তবে আমি ভাগ করে খাই
তৃষ্ণার পবিত্র তীর্থে সামান্য পাথেয় এই জল।
কর্কশ কম্বলখানি—মমতা চিত্তের—ছেড়ে দিই তারে,
জীবনের অপরূপ সীমান্ত-ট্রেনের উন্মোচিত জানালার ধারে।

তখন পাহাড়তলে বিকেলের ছায়া নামে, না হয় নামুক,
অরণ্য নীরব :
সূর্যের উজ্জ্বল চোখ ম্লান মেঘে হয় হোক ফিকে।
অন্ধকার নেয় নিক সব।
চোখে তার চোখ রেখে জীবনের জানালায়
আমি শুধু বসি দণ্ড কয়।
না হয় সে নেমে যাবে পরের স্টেশনে
যাবেই না হয়॥

—দুরন্ত দুপুর

চক্রবর্তী

স্বপ্ন-কোরক

তবু সে হয়নি শান্ত। দীর্ঘ অমাবস্যার শিয়রে
যে-রাত্রে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে
মলিনলাবণ্য-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মমতা,
যে-রাত্রে সমস্ত তুচ্ছ অর্থহীন কথা
গানের মূর্ছনা হয়ে ওঠে
শোক শান্ত হয়, দুঃখ নিভে আসে, যে-রাত্রে শীতার্ত মনে ফোটে
কল্পনার সুন্দর কুসুম, নামে সান্ত্বনার জল
চিন্তার আগুনে, আর আকন্যাকুমারীহিমাচল
কপালে জ্যোৎস্নার পঙ্ক মেখে
জেগে ওঠে অতলান্ত অন্ধকার সমুদ্রের থেকে—
তখনো দেখলাম তাকে, কী এক অশান্ত আশা নিয়ে
সে খোঁজে রাত্রির পারাপার,
দুই চোখে তার
স্বপ্নের উজ্জ্বলশিখা প্রদীপ জ্বালিয়ে।

সে এক পরম শিল্পী। সংশয়-দ্বিধার অন্ধকারে
সে-ই বারে বারে
আলোকবর্তিকা জ্বালে, দুঃখ তার পায়ে মাথা কোটে,
তারই তো চুম্বনে ফুল ফোটে,
সে-ই তো প্রাণের বন্যা ঢালে
দামোদরে, গঙ্গায় কি ভাকরা-নাঙালে।
সে-এক আশ্চর্য কবি, পাথরের গায়
সে-ই ব্রহ্মকমল ফোটায়।

কী যে নাম, মনে নেই তা' তো—
আবদুল রহিম কিংবা শঙ্কর মাহাতো,
অথবা অর্জুন সিং। মাঠে মাঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে
সে জাগে সমস্ত রাত স্বপ্নের কোরক হাতে নিয়ে।
আমার সমস্ত সুখ, সকল দুঃখের কাছাকাছি
সে আছে, আমিও তাই আছি॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

রানার

রানার ছুটেছে, তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে,
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে।
রানার চলেছে, রানার!
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার,
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

রানার! রানার!
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,

বোম্বাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে স'রে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা, আকাশে মিটমিট ক'রে চায় ;
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায় !
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্ ঠন্, জোনাকিরা দেয় আলো—
মাভৈঃ, রানার, এখনো রাতের কালো।
এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌছে দিয়েছে 'মেলে'।
ক্লান্ত শ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে,
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া এক শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার! রানার!
এ বোঝা টানার
দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে ?
ঘরেতে অভাব ; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাটা যাবে না ছোঁয়া।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে ;
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,

এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,—
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে—আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?

রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখনি, নেই দেরী নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো আরো বেগে, দুদম হে রানার॥

—ছাড়পত্র

শান্তিকুমার ঘোষ

সিকিম-স্মৃতি

দূরের পাহাড় হাতছানি দেয়—মেঘের ফাঁকে রোদের ছিটে,
ঝাঁঝাল হাওয়া বইয়ে দিল কমলাফুলের গন্ধ মিঠে।
স্বপ্নে-দেখা অলখ ভুবন দেখছি কি আজ সামনে আমার—
নীল পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে চিত্রশালার খুলল দুয়ার।

'মকাই'-ক্ষেতে ভুটিয়া-বউ আঁচল ভ'রে তুলছে দানা,
অর্কিড-ফুল দুই বেণীতে—আপেল-রাঙা গাল দুখানা।
থাক-কাটা ক্ষেত যাচ্ছে নেমে পাহাড়ের ওই ঢালু বেয়ে—
কোথায় মেশে সবুজ সোপান ভুট্টা-জনার ফসল ছেয়ে।

পথের পাথর কুড়িয়ে পেয়ে ভাবছে বালা, 'মানিক নাকি ?'
আপন গলার সাতনরীতে নতুন করে গাঁথবে তা কি ?
ধাপে ধাপে নামছে ঝোরা 'মাথি'র স্ফটিক তুষার গ'লে,
কান্না-চাপা সুরের ঢেউয়ে পাহাড়তলী ভরিয়ে তোলে।

পাহাড়-কোলে নারাঙ্গী-বন দূরের থেকে দেখায় ভুল,
ডালে ডালে সোনেলা ফল ফুটেছে ঠিক গাঁদার ফুল !

* * *

অনেক উঁচু নাথুলা ওই—স্বপ্ন-ঘেরা পারুল-বাগ,—
সবুজ ঘাসে ঝরছে কেবল বন-গোলাপের রেশ্‌মী ফাগ ;
ফুলের নেশায় মাতাল হাওয়া—পথিক গেলে পড়বে ঢুলে,
ঘুমের আরক পান ক'রে সে ঘুমিয়ে যাবে সকল ভুলে।

* * *

টিলায় ব'সে ওই দুনিয়া দেখছি মেঘের সীমায় হারা—
ছবির মত কে এঁকেছে নীচের পাহাড় ঝরনা-ধারা !
প্রজাপতির ছুটছি পিছে সোনার বুটি ডানায় বোনা,—
জোড়ায় জোড়ায় উড়ছে কত—হায় রে, তাদের বৃথাই গোনা।

দূর-জনমে ছিলাম বুঝি ঘর বেঁধে এই পাহাড়-বুকে—
সবুজ-ঝুঁটি বনের পাখি তাই কি চেয়ে আমার মুখে ?
ঘুঙুর-বাঁধা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে কি সেই পশম-বোঝা
উঁচু-নীচু চড়াই পথে হাটের মুখে যেতাম সোজা ?

আজো হঠাৎ চলতে পথে চমকে দূরে তাকিয়ে থাকি—
সামনে রোদে তুষার-চূড়া—সোনার হ'তে নেই তা বাকি !
কোথা থেকে বনের ফাঁকে আপনি দোলে ডালিয়া-ফুল,
ঝাঁক বেঁধে যায় রাণীচরা—ভুল যে সে-সব, কেবলই ভুল ॥

সংযোজন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার নিভাও আলো

এবার নিভাও আলো। চিত্তদীপ আর কতদিন
অনির্বাণ জ্বলিবে একাকী? অনাদি কালের সাথী—
জ্বলিয়া জ্বলিয়া তবু নিঃশেষ হল না তার বাতি;
শিখা তার তৈল বিনা মহাশূন্যে হল না বিলীন?

বিশ্বে যবে ঝঞ্ঝা বহে, নিষ্পলক জ্যোতি রহে ফুটি;
দেহের সুপ্তিতে তার নিভে না দুর্জয় প্রাণশিখা;
জন্ম হতে জন্মান্তরে লঙ্ঘিল শত মৃত্যুর পরিখা
জাগিছে শাশ্বত মন—তন্দ্রাহীন কালের দেউটি।

এইবার মাগে সে বিশ্রাম; যুগক্লান্তি নেমে আসে
বিনিদ্র নয়নে তার। ধূম-দীপ্তি-আলো ও কালিমা
একাকার হয়ে যাক প্রলয়ের মহা জলোচ্ছ্বাসে,
অনাদি এ জাগরণ লভুক অন্তিমতম সীমা।

মহাকাল, এইবার ফুৎকারে নির্বাণ কর তারে
মিশে যাক সমাপ্তির স্বপ্নহীন সুষুপ্তি আঁধারে।

—তন্দ্রুমন

অতীন্দ্রিয়

নয়নের আলো দিয়া আঁধার ভেদিতে কেবা পারে?
নয়ন সে আলোর ভিখারী,
আলো পান করিয়া সে রামধনু রঙের মাতাল
আঁধারের নহে অধিকারী।

তমসার কূলে কূলে বেড়ায় লোলুপ আঁখি মোর
খোঁজে অজানার পরিচয়,
অতলের তলে তলে কোথা জ্বলে তিমির মণিক'
প্রভাহীন মুকুতা নিচয়।

দীপহীন অমাপুরে নিকষকুট্টিম 'পরে পড়ি
কে তরুণী কাঁদে নিরাকারা!
নীরব রোদন তার চেতনা-অতীত স্বরে আসি
বেদনার দিয়ে যায় সাড়া।

অতীন্দ্রিয় সে বেদনা ঘুরে মরে মর্মের কন্দরে
কায়াহীন স্বপ্ন নিশাচরী
কী যেন বলিতে চায় ভাষাহারা অব্যক্তের বাণী
মূক কণ্ঠে গুমরি গুমরি।

মনে হয় ডাকে মোরে অপলক নয়ন সঙ্কেতে,
বলে, ওগো বন্ধন-বিলাসী,
আলোকের কারাগারে স্বপ্নঘোরে শুনিতে কি পাও
তামসীর অনাহত বাঁশী?

ইন্দ্রিয়ের পরপারে ইন্দ্রনীল সুপ্তিমায়াপুরে
জাগরূকা হে অভিসারিণী,
পাইনি তোমারে কভু শব্দরূপগন্ধের ইঙ্গিতে
চিনি গো তোমারে তবু চিনি।

পাই নাই যাহা কিছু, পাইব না যে ধন কখনো
ঢাকা আছে তোমার অঞ্চলে,
পরম পিপাসাহরা পরিপূর্ণ পাত্র অমৃতের
তার লাগি হৃদয় চঞ্চলে।

চির তমিস্রার মাঝে চিরন্তন বাজে তব বাঁশী
মোহময় কুহক মধুর
শিথিল ইন্দ্রিয় গ্রন্থি, সম্মোহিত বিবশ চেতনা
আত্মহারা পরাণবঁধুর।

টেনে লও বুকে তারে, তমোময়ী অয়ি বিমোহিনী
অরূপা অনন্ত রূপবতী,
ক্ষুদ্র আলো ক্ষণিকের—সীমাচক্রমসী-রেখাঙ্কিত
নিখিলের তুমিই শাশ্বতী ॥

অতুল্য ঘোষ

সমুদ্র আর চড়ুই পাখি

চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম,
আজ কটায় জোয়ার আসবে ?
সে আঙ্গুল গুণে বললো, "আজ ত সপ্তমী,
কাল দুপুরের কাছাকাছি জোয়ার এসে যাবে।
এই সমুদ্র, এমন প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর,
দেখে মনে হয় যার কোন ঠিকানা নেই,
যে কারও কাছে নতি স্বীকার করে না,
সেই সমুদ্র নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে,
আর সেই খবর জানে এই বাংলোর চৌকিদার।

খানিক আগে আমার ছাদের আলসেতে
একটা ছোট্ট চড়ুইপাখি এসে বসেছিল।
চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম
"বাপু বলতে পারো এই ছোট্ট চড়ুই পাখিটা
আবার কখন আসবে ?"

সে আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললো,
"আজ্ঞে চড়ুই পাখির আনাগোনার কি
ঠিক ঠিকানা আছে ?"

আমার বাংলোর চৌকিদার
বিশাল সমুদ্রের ঠিকঠিকানা রাখে,
তার গতিছন্দ তার অজানা নয়,
কিন্তু ছোট্ট পাখিটার আনাগোনার খবর
তার একেবারেই জানা নেই।

ধান-শীষ

ঋজু ঊর্ধ্বশীর্ষ আরাধনায় রত হয়ে আছে,
পৃথিবীর রসে পুষ্ট হয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে অসীম গগনকে।

লীলায়িত তার ছন্দ,
প্রতীক্ষমান আহ্বানের আমন্ত্রণে তার সর্বদেহ হিন্দোলিত ;

অসীমকে সে মাটির স্পর্শে বাঁধতে চায়—
দুস্তর তার তপস্যা, প্রচণ্ড তার আকৃতি।
অসীমের নিবেদন অজস্র ধারায় নেমে এসে তাকে আলিঙ্গন করে

অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হয়ে
প্রাণপ্রাচুর্যে সে নিজেকে পরিবেশন ক'রে
নিঃশেষ করে দেয়।
পৃথিবীর বুকে রস সিঞ্চনের শাশ্বত প্রকাশ ॥

বিমলচন্দ্র সিংহ

পৃথিবী

আজ নীল আকাশ আর শাদা মেঘের অলস কানাকানি,
চিকন পাতায় হাওয়ার ঝিরঝির শব্দ,
নাম-না-জানা পাখীর আওয়াজ,
ছোট ছোট ঘাসের ফুল,
ঝিঁঝিঁর ডাক,
ফড়িঙের লাফ—
আর পরিপূর্ণ শান্তি।

হে অশান্ত পৃথিবী
মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে কি দুর্দমনীয় বেগে চলেছ ছুটে,
বুকে তোমার জ্বলন্ত লাভার আলোড়ন,
চলার বেগে আন্দোলিত হচ্ছে মহাসমুদ্র,
তবু জানালা দিয়ে চোখে পড়ে তোমার এক টুকরো ছবি—
ছোট ছোট ঘাসের ফুল,
ঝিঁঝিঁর ডাক,
ফড়িঙের লাফ,
আর পরিপূর্ণ শান্তি ॥

—এল্‌ডোরাডো

নিরন্তর

দিন চলে যায়।
জীবনের বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
কালো পাখী ডাকে তার সঙ্গিনীকে পাতার আড়ালে
চোখে যার মুগ্ধ দৃষ্টি, বুকভরা তাপ—

নাই নাই সে কোথাও নাই,
উড়ে গেছে আর কোন দেশান্তরে, তাই
হিম হাওয়া নামে, নামে বুকভরা শীত
বদ্ধ অন্ধকারে স্তব্ধ কণ্ঠভরা গীত।

তবু তো আলোর কলস্বরে
প্রভাতের পাতার মর্মরে
আবার ধ্বনিত হয় গান,
দোসরের তরে তার অবিরাম আকুল আহ্বান।
নাই নাই সে কোথাও নাই,
যাক চলে দেশান্তরে, তবু তারে চাই—
চাওয়া আর পাওয়া,
এ দুয়ে হলো না কভু মিল, তাই চিরকাল গাওয়া।

—এল্‌ডোরাডো

সুধীর গুপ্ত

অন্ধ-গলির রন্ধ্র-বিহীন ঘরে,
বদ্ধ বাতাস যেথায় স্বনিয়া মরে,
স্বর্ণ-শিল্পী সোনার গহনা গড়ে।

সৌর-লোকের আলোর আশিসও হায়
ক্বচিৎ সেথায় ছড়াতে সুযোগ পায়,
শিল্পী সোনার-স্বপন বুনিয়া যায়।

বণিক-বিপণি চারিদিকে সারি সারি,—
বস্ত্র-ব্যাপারী—মুনাফার-কারবারী ;—
স্বার্থ-মত্ত চুরি—আর বাটপাড়ি।

হিংস্র পশুতা, স্বার্থপরতা হায়,
মানবের বেশে সেথা শুধু শোভা পায় ;
দেবতারও পাখী ক্বচিৎ সেখানে গায়।

জাগতিক সুখ স্বেচ্ছায় পরিহরি',
সোনায় স্বপন রূপান্তরিত করি',
শিল্পী সোনার গহনা তুলিছে গড়ি'।

গড়িছে রাজার বালার হাতের বালা,
গড়িছে সোনায় গলার মোহন মালা,
শিল্প-সুধায় ভুলি' উপবাস-জ্বালা।

দেখে যেন, রূপ অপরূপ কিবা তাঁ'র !
পরায় গলায় যেন সে সোনার হার ;
কী অসহ সুখ ! সিদ্ধি কী সাধনার !

গভীর তৃপ্তি ফুটিছে গোলাপী ঠোঁটে,
শিল্প-সাধনা সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
জীর্ণ-গলিতে পারিজাত যেন ফোটে।

হায়রে স্বপন ! বিফল স্বপন বোনা !
বস্তু-জগতে ওজনে বিকায় সোনা,
টাকার ওজনে সব কিছু হয় গোনা।

স্বভাব-শিল্পী, স্বপনের কারিগর,
আধা-উপবাসী থেকেও জীবন ভর
বুঝিলে না হেথা স্বপনের কী যে দর !

রাজার দুলালী আসিবে না কভু হায়,
স্বপনে তবুও জীবন বহিয়া যায় ;—
যদি আসে বালা, রাজবালা ফিরে যায় !

অন্ধ-গলির রন্ধ্র-বিহীন ঘরে,
স্বপন-লোকের সোনার মেয়ের তরে
স্বর্ণ-শিল্পী সোনার গহনা গড়ে।

মনোজিৎ বসু

রূপতৃষ্ণা

রূপ শুধু নেই
প্রভাত-গোধূলি-গগনে,
সুনীল-আকাশে, ফেনিল-সাগরে ছড়ানো।
রূপ শুধু নেই
প্রজাপতি-রঙ্-ছটাতে,
চাঁদের আলোকে, গোলাপে, চাঁপায় জড়ানো
রূপ শুধু নেই
শরতের মধু-অধরে,
অনুরাগে রাঙা সুচারু তন্বী-তনুতে।
রূপ শুধু নেই
ভরাযৌবন-জীবনে,
সাতরঙে আঁকা উজল ইন্দ্রধনুতে॥

রূপ, সে তো আছে—
গভীর রজনী-আঁধারে,
ধূসর আকাশে, উষর মরুতে ছড়ানো।
রূপ, সে তো আছে—
সজল-কাজল-নয়নে,
বিজলীর বুকে, বাদল-মেঘেতে জড়ানো
রূপ, সে তো আছে—
কালবৈশাখী-হাসিতে,
কুয়াশায়-ঢাকা শীতের শীতল চরণে।

রূপ, সে তো আছে—
জোনাকীর ক্ষীণ কিরণে,
ধ্যানগম্ভীর নিথর মৌন মরণে॥

সুনীলকুমার লাহিড়ী

দীঘার চিঠি

সুরমা, এখানে এসো যদি তুমি সাগরতীরে,
এই নির্জন দীঘার-বেলায়—তোমাকে ফিরে
পাই যদি পাশে তাহলে দেখাই—
মুক্তি পাবার কোন বাধা নাই—
আকাশে সাগরে দূর-দিগন্তে ছড়ানো নীল,
ইটের খাঁচার পোষা প্রাণটারও খুলবে খিল।

বালুতীরে ব'সে দু'চোখ অবাধ সামনে ছোটে—
ফেন-বালুমাখা ঢেউগুলি ওঠে—আবার লোটে।
বনরাজি-নীল-দিগন্তরেখা—
আকাশ সাগর সঙ্গমে লেখা—
নীলের প্লাবন নীল-নির্জনে দু'চোখে মেখে ;
গেরুয়া রঙেরই ছাপ ধরে মনে আপনা থেকে।

সুরমা, এখানে সাগর-বেলার অন্ধকার,
কী যে নাচ নাচে—হরেক রকম ছন্দ তা'র।
নিশিডাকে পাওয়া মনটাকে টানে,
ধূ—ধূ বালুহাওয়া সমুদ্র-গানে,
উর্ধ্বে ছড়ানো মুক্তোগুলিও ঢেউ তুলে নাচে আকাশ-গায়!
গৃহস্থালীর গাঁটছড়া ছিঁড়ে অসীমে ডুবতে মনটা চায়।

অসিতকুমার চক্রবর্তী

স্বপ্নের পসরা

স্বপ্নের পসরা নিয়ে
ঘুমের জাহাজ আসে ভেসে,
হৃদয়ে নোঙর ফেলে,
মনের নরম কিনারায়
সুদূরের ছায়ালোকে
সাদা তার পাল দেখা যায়,
হাওয়ায় হাওয়ায় সে যে
কেঁপে যায় ভীরু ভালবেসে,
স্বপ্নের পসরা নিয়ে
ঘুমের জাহাজ আসে ভেসে।

কল্যাণী প্রামাণিক

হিমঝুরি

উঁচু নীচু রুক্ষ লাল মাটি,
ছড়ানো পাথরের রুদ্রাক্ষে গাঁথা মালা।
বিশাল শালশীর্ষে মৌনস্তিমিত দৃষ্টি,
ধূসর প্রান্তরে কেঁদে ফিরছে বৈরাগী হাওয়া।

সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙে হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে,
যখন স্বচ্ছ নীল আকাশে
খেলা করে প্রাণের গলানো সোনা,
হিমঝুরির শাখায় শাখায়
বন্য উচ্ছ্বাসের শ্বেত সুরভির অজস্রতা
যখন আশ্চর্যের লগ্ন আনে
সাঁওতাল তরুণীর মদির কবরীতে।

পরিতৃপ্ত ছাগলের ছানা
হিমঝুরি-তলা হতে
ফেরে অনিচ্ছুক পায়ে।

কন্‌কনে আকাশে
ধীরে নেমে আসে রাত।
কত আশ্চর্য হিম রঙিন রাত,
টুপ্‌টাপ্‌ ফুল ঝরে পড়ে—
কত আশ্চর্য উষ্ণ রঙিন রাত,
সাঁওতাল তরুণের হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি
হিমঝুরি
ডালে ডালে জোনাকির ফুলঝুরি জ্বেলে
সারারাত
সাক্ষী থাকে
নীল পাহাড়ের তপোভঙ্গের,
অতনুর পুনরুজ্জীবনের ॥

—শিশুতরু

সুশান্ত বসু

ডাক

জ্বলে নীল জল নীল আগুনের মত
শতধা স্রোতের বাঁকে
কে যেন আর্ত কণ্ঠে ইতস্তত:
বিস্মৃত নামে ডাকে!

তরণী আমার বিলীন দিগন্তরে
সব ডাক ফেরে তীরে

পুরানো দিনের বহু পরিচিত ঘরে
মনে পড়ে সেই হারানো রাত্রিটিরে

জ্বলে নীল জল নীল আগুনের মত
জ্বলে নীল চাঁদ নীলিম জলের মত
কে যেন আর্ত কণ্ঠে ইতস্তত:
প্রিয় নাম ধরে ডাকে ॥

—বকুলতলা

বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়

অলিখিত

কলম যেখানে থামে, সে বিরলে মনের আকাশ ;
ছুটি পায় সে আকাশে হৃদয়ের অনুভূতিগুলো—
আমায় সেখানে রাখো, হে অন্তর, হে বচনাতীত,

সেখানে সার্থক আমি প্রিয় সেই আমার আবাস ;
সেখানে রঞ্জিত হবো দূরে ফেলে ধরণীর ধুলো,
আবর্জনা একরাশ, ঝরাপাতা পরিপাণ্ডু, পীত।

হৃদয়ের সেই লক্ষ্য লেখ্য থেকে আলেখ্যের দিকে—
সেখানে আমার যাত্রা কথার অতীত কোনো তীরে
সুষুপ্ত যেখানে দেহ, অনুভূতি শুধু জেগে ওঠে—

সেইখানে স্থান দাও, আর দিও দুটি পাখা মোটে
মাত্রাহীন কল্পনার ; দেখো আমি আসবো না ফিরে,
ঠেল্‌বো না এ কলম, কালো যার কালি হবে ফিকে।

মণীন্দ্র রায়

যদি একবার

তুমি আজ কাছে নেই, তবুও আমার
মনের জানালা খুলে অন্ধকারে দূরের হাওয়ায়
পাই স্নিগ্ধ তোমারই সুরভি।
একটি অস্তিত্ব তুমি, তবুও স্মৃতির চোখে চোখে
ঢেউয়ের জ্যোৎস্নার মতো হাজার হীরায়
কতো চেনা রূপেরূপে ভেসে ওঠো, মৌন চলচ্ছবি!

আমার সমস্ত স্বপ্নে তোমারই নামের
বৃষ্টি ঝরে। সব ধূলিকণা
মেলে ধরে অভীপ্সার ময়ূর কলাপ।
আর তুমি উদাসীন, এ দিগন্ত ছেড়ে
কোথায় চলেছ? কোন অরণ্যের টানে
বাষ্পনীল তোমার উত্তাপ!

আমাকে চাওনা, জানি। তবু একবার
যদি দেখে যেতে তুমি, পরিত্যক্ত তোমারই এ ঘরে
কতো ভাঙ্গাচোরা কথা, অশ্রু, হাসি, চোখের চাওয়ায়
কী তীব্র আবেগে বেঁধে গড়ে তুলি মূর্তি কবিতার।
একবার যদি তাকে বুকে নিতে, হয়তো তখনি
স্নায়ুর বিদ্যুতে, রক্তে, মেনে নিতে—কী তুমি আমার!

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ফ্রেমে আঁটা ছবি

চিত্রের প্রদর্শনীতে গিয়ে
দেখছিলাম মুগ্ধ হয়ে একটি শিল্পকাজ
হঠাৎ মনে হোলো
নড়ছে যে ছবিটা,
কি যেন সে বলতে চায় ঠোঁটে।

চশমা খুলে নিয়ে
কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছি বারবার
আবার তাকাই।

না।
স্থির চিত্র। ফ্রেমেতেই আঁটা।

মনে হয় এ যুগের এ জীবনও তাই
কখনো নড়েচড়ে, কখনো বা কথা কয়
অর্ধস্ফুট যন্ত্রণার কথা।
কিন্তু থাকে বেশির ভাগ সময়
বিবর্ণ নয়ন মেলে গোরুর মতন।

যেন ধ্যানী শিল্পীর কাছ থেকে নিয়ে
কোনো এক রসিক বুঝি বা
বাঁধিয়ে রেখেছে ফ্রেমে।
তলাতেই লেখা নেই শুধু—
জীবন যন্ত্রণা।

বৃথাই বড়াই করি বিংশ শতাব্দীর॥

অরুণকুমার সরকার

শ্রাবণে

যে আশা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও
মলিন দিনগুলি মলিনতর হোক।
শ্রাবণে সন্ধ্যায় অঝোর মায়ালোকে
চাইনে উজ্জ্বল তোমার মুখচোখ।

কোথায় ছিলে তুমি ভোরের সরোবর ?
দুপুর রি রি জ্বলে—তুমি তা দ্যাখো নাই।
বিকেলে হৃদয়ের বাতাস উতরোল,
আলোর হাহাকারে তুমি তো আসো নাই।

এখন পাহাড়ের বিলোল বনভূমি
কথার ঝরা পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যাও।
সুদূর রজনীর গোপন জুইফুলে
যে আশা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

দুষ্মন্ত

হায়রে নিদ্রিত স্মৃতি! হায়রে অংগুরী!
আমার অপূর্ণ ইচ্ছা, এসেছিল কাছে,
আমারই বিকল্প আত্মা আবেগে নির্বাক,
আমি যাকে বলেছি, 'চিনি না',
বলেছি, 'এ উপন্যাস, এ প্রেমকাহিনী এক অলীক কল্পনা।'
ফিরে গেছে নতমুখে নীরব ধিক্কারে, আমার বিকল্প আত্মা,
আমার বসন্ত আমি দিয়েছি ফিরায়ে।

প্রেম যদি পরিহাসবিজল্পিত, পরমার্থ তবে কাকে বলি ?
হে দ্বিধা-পৃথিবী বলো, শকুন্তলা—দুষ্মন্তের মৃত আত্মা—
কোথায় এখন ?
আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার আত্মাকে। সাড়া দাও !

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

আজ সারারাত

আজ সারারাত কাঁপবে পাতারা ভিজে হাওয়ায়,
বৃষ্টি পড়বে নগ্ন-কোমল পাতার গায় !
শিরায় শিরায় ধুয়ে ধুয়ে যাবে অন্ধকার—
মুগ্ধ মেঘেরা ঘুরবে অবাধ শূন্যতায়।

আজ সারারাত শিকড়ে শাখায় গাছের দল—
মাখবে বাতাস। পান করে নেবে বৃষ্টিজল।
নরম কাদায় ভাঙবে নীরব বীজের ঘুম।
মাটির গন্ধে জাগবে মাঠের মৃতকুসুম।

আজ সারারাত বৃষ্টি পড়বে—সারাটা রাত—
হৃদয়ে হৃদয়ে দোলা দিয়ে যাবে হাওয়ার হাত।
সূর্যবলয় পার হয়ে দূর তিমির লোক—
ঘিরবে তোমায়-আমায়। ভরবে অন্ধচোখ।

আজ সারারাত গূঢ় দুরাশার কাঁপবে প্রাণ,
মরে আসা ম্লান স্বপ্ন সোঁতায় আসবে বান,
হাওয়ায় ভাসবে সবুজ ধানের স্বপ্ন-স্বর—
আজ সারারাত আকাশ মাটির উঠবে গান।

কখন ক্লান্ত হৃদয় খুঁজেছে অন্ধকার।
পাইনি অন্ত, বন্দীজীবন যন্ত্রণার।
এখন হঠাৎ বিদ্যুৎ নীল উদ্ভাসন—
যুগান্তরের অজানা আশায় কাঁপায় মন।

এরাত কি দেবে একটি দিনের স্বর্ণ-স্বাদ?
জীবনে জড়াবে ধানশিশুদের আশীর্বাদ!
দেবে কি মৌন মায়াবী আকাশ, নম্রনীল—
সূর্যের বুকে ঘুরে ঘুরে ওড়া শঙ্খচিল?

কি জানি কে জানে! এখন কেবল সারাটা রাত-
অন্ধকারেতে দোলা দিয়ে যাক হাওয়ার হাত!
গাছেরা দুলুক ভিজুক পৃথিবী শুধু আকাশ—
এনে দিক মনে দূর মৃত্যুর কল্পাভাস।

অরবিন্দ গুহ

কথামৃত

মনে মনে যত কিছু ছিলো,
সব কথা বলিনি তোমাকে;
সব কথা বলা হ'লে তবে
সারারাত ভালবাসি কাকে।

সকালে রাতের চিঠি ছিঁড়ে
সব কথা কুচি কুচি করি;
তারায় আকাশ ভরে এলে
আবার কথায় ঘর ভরি।

কোনদিন তোমাকে পাবো না
আমার দু-হাত মেলে দিলে ;
তার চেয়ে এই তুমি ভালো
কথা দিয়ে ছুঁই তিলে তিলে।

কল্যাণী দত্ত

নায়িকার প্রতি

থেমেছে তোমাকে ঘিরে অকারণ উচ্ছ্বসিত চলা
ক্ষণিক মত্ততা যত, কানে কানে মিছে কথা বলা,
বেজেছে নেশার মত, অফুরান ভুলে ভরা গান
বন্ধুর যাত্রার শেষে শচীতীর্থে কর মুক্তিস্নান।

স্মৃতির পাখির দল উড়ে যাক আকাশের গায়
স্বপ্নের সোনালী ছবি আঁকা ছিল যাদের ডানায়,
নামুক আঁধার রাত্রি শঙ্কা সব করে দিক দূর
খুলে ফেল মুখরিত দিবসের বাজন নূপুর।

এ শুধু মিথ্যার মধু পায়ে পায়ে গেছে ছুঁয়ে ছুঁয়ে-
বুকের রক্তের মত গাঢ় লাল ? তবু ফেল ধুয়ে।
সত্যের বেদীতে বসে মুছে ফেল মনের মুকুর
আমি বর দিনু দেবী প্রতিবিম্ব হয়ে যাবে দূর।

নতুন স্বাক্ষর এসে জেলে দেবে দীপালী আবার
ফিরে দাও দিনরাত্রি বন্দী মোর কারায় তোমার

সুনীলকুমার নন্দী

চোখের বালি

মনে পড়ে সেই মায়াবী নদীতে কবরী-খসানো হাওয়ার রাত ?
কিশোর-স্বপ্নে একই বাসনার পাল মেলে দিয়ে দুরাশা-নাও
ভাসানো, ঢেউএর ছলছল সুরে সুর বেঁধে নিয়ে চপল ঝাউ-
বনে শিস তুলে লুকোচুরি খেলা—মুছে নিলো বুঝি বালির বাঁধ।

খরযৌবনে এসে দেখি, একি তোমার চোখেরও মায়াকাজল
রেখা নেই, কেন বলো বলো সখী : সারা মনে কাঁপে উতলা ভয়
অবুঝ হৃদয়, সময়ের হাত সব কেড়ে নেয়। এখন বয়
বালিওড়া হাওয়া, বালিপড়া চোখ। গলা ভেঙে মরে ফটিক জল !

চিত্তরঞ্জন মাইতি

আলপনা * জলের বলয়

তুমি আলপনা আঁক
আমি তাই দেখি বসে মুগ্ধ চোখ মেলে,
পাকে পাকে কত ফুল লতাপাতা
কত বৃত্ত এঁকে এঁকে চলে
তোমার আঙুলগুলি ; আমি কিন্তু জানি
ও শুধু আলপনা নয়
তোমার মনের এক বিচিত্র রাগিণী।

একটি পাহাড়ী নদী বুকে তার জলের বলয়
তরঙ্গের ঘূর্ণিবৃত্তে তৃণখণ্ড আবর্তিত হয়
তারপর সেই তৃণ ঠিকানা হারায়
ডুবে যায় আবর্ত ধারায়।

তোমার প্রেমের বৃত্তে
আমি সেই তৃণ চিরন্তন,
তোমার গতির মাঝে আমার এ মগ্ন সঞ্চরণ।

বটকৃষ্ণ দে

শ্রাবন্তী

শুনেছি, তোমার দেশে লালনীল পদ্মদীঘি জল
শাপলা-শালুক খুলে ভরে গেলে পর—
সমুদ্রের-মেঘহাওয়া ডানা নেড়ে ঈষৎ চঞ্চল
হলেই, বৃষ্টির রাত ; বৃষ্টি, বৃষ্টি নিরন্তর, বৃষ্টি ঝরোঝর।
ততো বৃষ্টি নাকি
কোনখানে, সমুদ্রের দুই চোখে, আকাশেরও হৃদয়েতে নেই।
সে এক আশ্চর্য স্নান, শ্রাবণেরই গান, শুধু শ্রাবন্তীর গান !
তোমাদের দেশে তাই ঘাসে ঘাসে নীল হওয়া ফুলেদের পাড়া
তোমাদের চোখে তাই সবুজ-জয়ন্তী রাগ, স্বর্ণিল ইশারা—
তোমাদের মনে আহা, কতো মোহ, মিহি আচ্ছাদন :
তোমাদেরই মন !

শুনেছো তো, এই দেশ শেষ হওয়া শ্রাবণী আকাশ,
জানো তো আমার মন মরে যাওয়া সমুদ্রের বালি,
রিক্ত ধূ-ধূ। বৃষ্টি নেই, দুই চোখে কান্নাঝরা জল নেই, নেই
শুধু খালি
দূরের বিধুর সুর—স্মৃতিঝরা মৃতস্বরা হাহাকারে বাজে করতালি
এখানে সবুজ মেয়ে কোনদিন পড়ে গেছে শূন্যতার পাঠ,
তারপর অবরুদ্ধ করে দিয়ে চলে গেছে তাদের কপাট !

এখানে আমার দেশে এসো না, এপথে এসে ঝরায়োনা দিন
কী করে শুধবো বলো তোমার অপরিশোধ্য ঋণ !

শঙ্খ ঘোষ

এই প্রকৃতি

ঘুরে ঘুরে এই প্রকৃতি কী কথা কয় ?
সে বলে যায় প্রেমের মতন আর কিছু নয় !

এই যে ভালবাসছি আমি সাতসাগরা ধরিত্রীকে,
এই যে স্নেহের সুধা, সুধায় ছড়িয়ে দিলুম শরীরটিকে—
স্নিগ্ধ সবুজ ললাট মেলে সেই যেখানে দিগন্তে সে
আপন মনে তাকিয়ে থেকে একটুখানি স্বপ্নে মেশে—
তার বুকে যে শ্রান্তিবিহীন তৃপ্তিবিহীন জলছে প্রণয়
কেউ জানো তা ! সে শুধু কয়, প্রেমের মতো আর কিছু নয়।

এখন তখন যখন যাকে দেখছি মনে হচ্ছে চেনা,
হাত বাড়িয়ে ডাকছে তারা 'দে না রে ভাই হৃদয় দে না'।
দুচোখ ভরা স্নেহের প্লাবন শূন্যে নাচে প্রাণের মুঠো,
বাঁধনহারা কাঁপন তোলে উদাসী দিনরাত্রি দুটো—
সবাই মিলে তারা আমায় গুণগুনিয়ে কেবল শোনায়,
তোমরা শোনো প্রেমের মতো আর কিছু নয় আর কিছু নয়

সে তো কেবল এই কথাটাই গুনগুনিয়ে নৃত্যে ফেরে,
'দে তোরা দে, আমার বুকে স্নেহের আগুন জ্বালিয়ে দে রে।'
আকাশ ভরা নীল টলেছে মাটির ভরা-বুকের টানে,
একুল ওকুল দুকুল ভেঙ্গে জল ছুটে যায় কী সন্ধানে,
গাছ কেঁপে যায় ফুল তোলে মুখ, সন্ধ্যা ভোরের আলোর বিনয়—
সবাই মিলে গান তুলেছে, প্রেমের মতো আর কিছু নয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অবিশ্বাস

যদিও জীবনে অনেক মাধুরী করেছি হরণ
কৃপণ আঙুলে খুঁজেছি বাঁচার অনেক অর্থ
বারেবারে তবু অবুঝের মত বলে ওঠে মন
ব্যর্থ, ব্যর্থ।

কঠিন সময় তুচ্ছ করেছি হারিয়ে ছড়িয়ে
অহংকারকে অবহেলাভরে করেছি চূর্ণ
অন্ধ বাসনা, ভয় ফিরিয়েছি দুইহাত দিয়ে
খুশির খেয়ালে স্মৃতির মৌন করেছি পূর্ণ।

হরিণের ভীরু চোখের মতন স্নিগ্ধ সকাল
কখন আমার হৃদয়ে আঁকেনি কোন প্রতিভাস
কখন দেখিনি ঘুচিয়ে চোখের আলোর আড়াল
দুঃখজয়ীর ললাটের মত অসীম আকাশ।

কত শতবার স্মরণ করেছি এই যৌবন
ভেদাভেদ নেই জলের রেখায় নারীর চিত্তে
তবু কেন আজ অবুঝের মত বলে ওঠে মন
মিথ্যে, মিথ্যে ?

আনন্দ বাগচী

সীমান্তের চিঠি

সামনে ডানা ঝাপটায় আঁধার।
কয়লার গুঁড়োর মত কালো রাত ঝরে ঝরে পড়ে
মৃত্যুর মতন শান্ত এই পূর্ব সীমান্ত এখন।

ট্রেঞ্চের মাটির গর্তে নৈশ ইঁদুরের মত একা
চোখ দুটো সামনে রেখে বসে আছি, বসে আছি।
ঝিঁঝিঁ ডাকছে, মনে হচ্ছে রক্তের স্রোতের মধ্যে বুঝি
মৃত্যুকীট ঢুকেছে সহসা।

ঠাণ্ডা মেশিনগানে হাত রেখে
প্রেতাত্মার মত ভাবি উজ্জ্বল আলোর কলকাতা
কতদূরে, জনাকীর্ণ রাজপথে আশ্বিন এসেছে।
চাঁপাফুল ফুটেছে রোদ্দুরে,
ঝলমলে কলেজ স্ট্রীট রঙের মিছিলে
ভেসে গেছে।

এখন কুমারটুলি রূপদক্ষ পটুয়ার মত,
তুলির ডগায় ফুটছে দেবোপম চালচিত্র আর
আশ্চর্য মায়ের মুখ : তীক্ষ্ণ নীলাকাশে
যেন শুভ্র মেঘ নয় নিঃশব্দ ঢাকের গুরুগুরু।
দর্পণে হয়ত দুলছে প্রসাধনরত একটি মুখ,
নিয়ন আলোয় ভাসবে ক্ষণ পরে
হয়ত কোথাও।
তোমাকে এভাবে ভাবতে কষ্ট হয়
কিন্তু বলো এছাড়া কি করি।

নীল যবনিকা কম্পমান।
একটি দাঁড়ির সামনে আমি আজ এসে থেমে গেছি;
মাটির গর্তের মধ্যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
প্রহর কাটছে একে একে।
মৃত্যু ওৎ পেতে আছে সামনে কোন্‌খানে কে তা জানে।
ইস্পাতের বজ্র হাতে নিয়ে বসে আছি
তবু ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এক মুহূর্ত পরে কি যে হবে,
কেউ তা জানে না।
মুহূর্তের স্বপ্নভঙ্গ যদি নাই হয়, আপাতত
তোমাকে বিষণ্ণ মনে ভাবি,
আশ্বিনের কলকাতা তোমার বিস্তৃত পটভূমি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সোনার বাংলা

মা তোমার চোখে বিদ্যুৎ যদি ঝলে,
সেই আভা নিয়ে আকীর্ণ হবো তমিস্র নদীজলে।
আমি তো দেখেছি সেই আভা নিয়ে বেহুলার খেয়া ভাসে,
ভেঙ্গে চুরে যায় মৃত্যুর পিঞ্জর,
কালের কুটিল জলের বাসরে আমিও লখিন্দর—
বেহুলা আমায় নিয়ে চলে আজো প্রদীপ্ত বিশ্বাসে।

মরণের পথে চলি জীবনের দিকে ;
আমার ললাটে মৃত্যুঞ্জয়ী লাবণ্য দাও লিখে,
আমার বসনে বাসন্তী নয়, শুভ্র শরৎ আনো,
বৃষ্টির পরে ভাঙ্গা ছাউনির নিচে
দুয়ারে দাঁড়াও, আনত দুচোখ আমার আশায় ভিজে,
শূন্য দুহাতে শেষরাতে বুকে টানো—

রাতের শিয়রে সেই প্রহরেই পূর্ণিমা হবে আঁকা :
স্বপ্নে দেখেছি সে যেন আমার মায়ের হাতের শাঁখা ॥

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিণ

যতদূর দৃষ্টি চলে : হাওয়া শুধু হাওয়া
এদিক ওদিক মাঠে দ্রুত ব্যস্ত করে আসাযাওয়া।
কখনও কিশোর তৃণে ঠেলা দিয়ে সহজ উল্লাসে
হা-হা করে হাসে!

আকাশের দক্ষিণ দুয়ার
আচমকা কখন খুলে দলে-দলে ছিটকে এলো ওরা ;
প্রবল জোয়ার।
আঁকাবাঁকা শিঙে শিঙে জঙ্গলের সরল পসরা
ছড়িয়ে মাঠের পরে মাঠ
ছুটছে ওরা পার হয়ে সোনালী সূর্যের মত দিন।
সামনে দিঘি পেরুলেই নীল চাঁদ ম্লান রাজ্যপাট
নিয়ে বসবে। থামবে ওরা অশরীরী অজস্র হরিণ!

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘুম

তাহলে ক্লান্তিরই দ্বীপে হৃদয়ের সফেন ঢেউয়েরা
হারাক হাওয়ার মতো নম্রনীল গানের অক্ষরে,
তাহলে আকাশে যতো মেঘের বর্ণালী আঁকা এরা,
এরাও হারাক কোনো সায়ন্তন রৌদ্রম্লান স্বরে!

তাহলে শ্রাবণ এসে মুছে নিক বৈশাখী আকাশ,
রৌদ্রে ঝড়ে হাহাকারে সমুদ্রের তৃষ্ণা গাঢ় হোক।

বৃষ্টিক্ষীণ শুভ্রমেঘে হিমভেজা নিবিড় আশ্বাস,
তাহলে শীতের গায়ে স্নিগ্ধতার ঝরুক পালক !

তাহলে বালির ব্যথা সাগরের অনেক নিবিড়ে
আলিঙ্গনে ঘন হোক, তাহলে রাতের কুমকুম
ফাল্গুনের স্বপ্ন দিক ; দেহে, মনে, প্রাণের গভীরে
মহুয়া নেশার মতো নামুক মায়াবী ছায়া ঃ ঘুম !!